কোয়ান্টাম মেথড্

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঃ একটি পর্যালোচনা

মুফতী শরীফুল আজম

মুরাকাবা ইলমে তাসাওউফের একটি প্রসিদ্ধ অধ্যায়। যুগ যুগ ধরে ওলি আউলিয়াদের মাঝে এর চর্চা হয়ে আসছে। মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার ভালবাসা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করাই এর উদ্দেশ্য। সদা এক আল্লাহর স্মরণ অন্তরে থাকলে মানুষের পক্ষে তাঁর নাফরমানী সম্ভব নয়। মুরাকাবার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন এবং আমার সাথে আছেন এই বোধ জাগ্রত করে তোলারই চেষ্টা করা হয়। প্রসিদ্ধ হাদীসে জিব্রাঈলে যাকে 'ইহসান' বলে সঙ্গায়ীত করা হয়েছে। ''তুমি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ, আর তুমি তাকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন''। মুরাকাবার মাঝে মনকে সকল ধরনের চিন্তা মুক্ত করে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুধু মাত্র একটি বিষয়ে ভাবা হয়। এবং লাগাতার দীর্ঘ সময় ধরে অনবরত কল্পনা করা হয়।

ইসলামের এই মুরাকাবার ন্যায় অন্যান্য ধর্মের সাধকদের মাঝেও আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য মন নিয়ন্ত্রনের সাধনা করতে দেখা যায়। হিন্দু যোগীদের যোগ্যধ্যান এবং বৌদ্ধদের বিপাসন ধ্যান এর অন্যতম। তবে মুসলমান সূফী-ওলীদের মুরাকাবা আর অমুসলিমদের ধ্যান বা যোগ সাধনার মাঝে তফাত সাত সমুদ্রের। কারণ প্রত্যেকেই এর রিয়াযত মুজাহাদা বা সাধনা করে থাকে নিজ নিজ ধর্মের আক্বিদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতির অনুসরণে। ইসলাম একমাত্র একত্ববাদের ধর্ম, আর বাকী সব বহু ইশ্বরবাদে বিশ্বাসী নাস্তিক যেমন বৌদ্ধ সমাজ। কাজেই ধ্যানের ক্ষেত্রেও এসকল বিশ্বাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ধ্যান- মুরাকাবার মৌলিক উৎসের মাঝে গবেষণা করে পশ্চিমা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করেছেন মন নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি, যার নামকরণ করা হয়েছে 'মেডিটেশন'। তাদের গবেষণায় বের হয়ে এসেছে মন-মস্তিস্কের মাঝে ধ্যানের প্রভাব। তারা দেখতে পেয়েছে যে ধ্যানের মাধ্যমে মানুষের মনে যে বিষয় গেথে দেয়া হয় সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে অনুসারে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ মনের বিশ্বাস অন্য অঙ্গকে প্রভাবিত করে। রোগ মুক্তি ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে এই ধ্যানের ফরমুলা অনুসরণ করে এক জন রোগীর মনের অবস্থা পরিবর্তন করা গেলে অনেকটা সফলতা পাওয়া যাবে। ৬০/৭০ দশকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের মাঝে এনিয়ে চলে ব্যাপক গবেষনা। এবং তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মানষিক ও শারীরিক উভয় ধরনের রোগ সারাতে মেডিটেশন কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারে। এসকল গবেষণার মাঝে অনেকটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষক ডা: হার্বার্ট বেনসন। দীর্ঘ গবেষণার পর ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত তার 'রিলাক্সেশন রেসপন্স' গ্রন্থে তিনি লেখেন যে, একাগ্র বিশ্বাস নিয়ে মেডিটেশন বা প্রার্থনা করে কিভাবে অনিদ্রা, সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা এবং ব্যাথা-বেদনায় আক্রান্ত রোগীরা আরোগ্য লাভ করতে পারে। তিনি বলেন, উদ্বেগ উৎকন্ঠার কারণে যে রোগ-বালাই হয় প্রচলিত চিকিৎসায় তাতে খুব একটা কাজ হয় না। বরং ৬০– ৯০% নিরাময় হয় রোগীর বিশ্বাসের কারণে। 'আমি সুস্থ হবো' এ বিশ্বাসের ফলে রোগীর দেহের নিউরো-ইমিউনোলজিকেল সিস্টেম নতুন উদ্যমে সক্রিয় হয়ে উঠে, বদলে যায় রোগের কোষগত নেতিবাচক স্মৃতি। এ বিশ্বাসকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'প্লাসিবো ইফেক্ট'। তদ্রূপ ক্যালিফোর্নিয়ার কার্ডিওলজিষ্ট ডা: ডীন অরনিশের গবেষণায় বেরিয়ে আসে হৃদরোগ নিরাময়ে মেডিটেশনের কার্যকারিতা। বাইপাস সার্জারি বা এনজিও প্লাস্টি ছাড়াও হৃদরোগের চিকিৎসা সম্ভব

তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯৭৮ সালে ৪০ জন গুরুতর হৃদরোগীকে এক বছর ধরে মেডিটেশন যোগব্যায়াম ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার গ্রহণ করানোর মাধ্যমে হৃদরোগ থেকে মুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। এভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মেডিটেশন নামক বৈজ্ঞানিক ধ্যান পশ্চিমা সমাজে। টাইম ম্যাগাজিনের আগষ্ট ২০০৩ সংখ্যার 'দি সায়েন্স অফ মেডিটেশন' প্রচ্ছদ নিবন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ১ কোটি মানুষ এখন নিয়মিতভাবে মেডিটেশন করছে।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিরাময়ের জন্যে এই মেডিটেশন চর্চার ব্যাপক প্রচলন ঘটছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো বাংলাদেশে প্রচলিত কোয়ান্টামের মেডিটেশন। এখানে নিরাময়ের গন্ডি থেকে বেরিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে। নিরাময়ের বিশ্বাসের স্থলে প্রবর্তন করা হয়েছে 'মুক্ত বিশ্বাস'। দ্বীন ইসলাম যেভাবে আক্বায়েদ (বিশ্বাস) আ'মাল, মুয়ামালা, মুয়াশারা, ও আখলাক এই পাঁচ ভাগে মানুষকে জীবন বিধান দিয়েছে তদ্রুপ কোয়ান্টাম মেথডের মাধ্যমে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্ট করা হয়েছে। 'সফলতার পঞ্চসূত্র' নামে পাঁচটি মনগড়া বিষয় ঠিক করা হয়েছে সঠিক জীবনদৃষ্টি অর্জনের জন্যে। এই জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে যে কোন ধর্মের লোক নিজ ধর্মে অবিচল থেকেও সে হতে পারে এক 'অনন্য মানুষ' ইনসানে কামেল। সুখ-শান্তি, সফলতা ও সুস্বাস্থ্য সবই অর্জন সম্ভব এই সূত্র অবলম্বনে।

গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক (আসল নাম জানা নেই) বাংলাদেশের এক জন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী। তিনিই উদ্ভাবন করেছেন 'কোয়ান্টাম মেথড' নামক এই বৈজ্ঞানিক ধ্যান পদ্ধতি। যদিও তিনি ডাঃ বেনসন বা ডাঃ ডীন অরনিশের মত চিকিৎসাবিদ নন। কিন্তু তাদেরই বাতলানো বৈজ্ঞানিক ফর্মূলা থেকে সূত্র সংগ্রহ করে নিজের গবেষণালব্ধ জোতির্বিদ্যার বিভিন্ন দর্শন যোগকরে আবিস্কার করেছেন এক আলাদিনের চেরাগ মার্কা ধ্যান 'মেডিটেশন'। এতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মের লোকদের আকৃষ্ট করতে সকল ধর্মের কিছু কিছু আদর্শ বিশ্বাস ও রীতিনীতির মিশ্রণ করা হয়েছে। তাই কোয়ানটাম মেথড পশ্চিমাদেশে প্রচলিত নিরাময়ের মেডিটেশন পদ্ধতি নয় বরং একটি জীবন ব্যবস্থা ও মতবাদ। যেখানে ধ্যান চর্চার নামে বিজ্ঞান ও সকল ধর্ম-মতবাদের সমন্বয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঠিক অনেকটা বাদশাহ আকবরের ভ্রান্ত দ্বীনে এলাহীর মত।

শহীদ আল-বোখারীর এ প্রচেষ্টার সূচনা হয় প্রায় ৩ যুগ আগে ১৯৭৩ সালে তদানীন্তন মাসিক ঢাকা ডাইজেস্টে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে লেখালেখির মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালে তার এবিষয়ক অনেক লেখা প্রকাশিত হয় সপ্তাহিক বিচিত্রায়। বাংলাদেশের অকাল্ট অনুরাগীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৭৬ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ এস্ট্রলজার্স। ১৯৮০ সালে এই যোগধ্যান চর্চা এক নতুন মাত্রা লাভ করে ঢাকার শান্তিনগরে অফিস স্থাপনের মাধ্যমে। এর পর ১৯৮৩ সালে মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে 'যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা হয়। যা ১৯৮৬ সালে যোগ ফাউন্ডেশন নামে রূপান্তরিত হয়। ধ্যানের স্তরে পৌঁছার প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্যে চলে গবেষনা। এভাবে কোয়ান্টামের প্রতিটি টেকনিক নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিক্ষা নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়। ৯০ দশকের শুরুতে এটি একটি পরীক্ষিত পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করে। এরপর সাধারণ লোকের মাঝে এর পরিচিতি তুলে ধরার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। শহীদ মহাজাতক ১৯৯২ সাল থেকে দৈনিক ইত্তেফাক ও মাসিক উপমা সহ বিভিন্ন পত্রিকায় শিথিলায়ন ও মেডিটেশন সম্পর্কে লেখা শুরু করেন। ১৯৯৩ সাল থেকে মাসিক রহস্য পত্রিকায় দীর্ঘদিন নিয়মিত আত্মনির্মাণ বিভাগে লেখেন। সর্ব সাধারণের জন্য ৪ দিনের মেডিটেশন কোর্স চালু করা হয় সর্ব প্রথম ১৯৯৩ এর ৭ জানুয়ারী হোটেল সোনারগাঁওএ। এর পর দীর্ঘ ১৭ বছরে বর্তমান ৩০০ এর অধিক কোর্স পরিচালনা করেন তিনি নিজেই।

আমাদের দেশের লাখ লাখ লোক এ যাবত তার কাছে কোর্স গ্রহণ করেছে। মূলত বিভিন্ন শারীরিক ও মানষিক সমস্যায় জর্জরীতরাই তার কাছে যায় নিরাময়ের আশায়। কিন্তু নিরাময়ের নামে তাদেরকে দিক্ষা দেয়া হয় নতুন এই মতবাদের। অনেকের কাছে তার কর্মকান্ড ইসলাম বিরোধী মনে হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের এই সন্দেহ দূর করার জন্য সেখানে রয়েছে জ্ঞানপাপী

দরবারী আলেম। যিনি কোয়ান্টামের সকল কুফরী মতবাদকে শরীয়ত সম্মত বলে চালিয়ে দেন। বাদশাহ আকবরের দরবারে যেমনটি করতেন মাও: আবুল ফজল। তবে একোর্সে আগত লোকেরা সবচেয়ে বিব্রতবোধ করেন সব ধর্মের লোককে এক সাথে বাইয়াত করে মুরিদ বানানোর মুহুর্তে। কিন্তু তবুও তাদের মোহ ভাঙ্গেনা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায়। আজ মুসলমানদের সব চেয়ে বিপদের কারণ হচ্ছে এই ধর্মীয় অজ্ঞতা। বৈষয়িক জ্ঞানে পান্ডিত্য অর্জনে কমতি নেই, কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিষয়ে তারা জ্ঞান রাখেনা বা প্রয়োজন মনে করে না।

ইসলাম আর কুফরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে কিছু অক্বিদা-বিশ্বাস ও আমল বা আচার আচরন। আক্বিদা বিশ্বাসে গড়মিল হলেই মানুষ ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। কোয়ান্টাম সকল ধর্মের প্রতি উদারতা বা সমন্বয় করতে গিয়ে ইসলামের মৌলিক আক্বিদা বিশ্বাস কে বিসর্জন দিয়েছে অতি কৌশলে, যা সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় না। কোয়ান্টামের জীবনদৃষ্টি অনুসরণ করে ধ্যান চর্চার মাধ্যমে অনেকের উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার যে কথা শুনা যায় তা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু মনে করতে হবে, কোন জিনিস উপকারী হলেই তা বৈধ বা শরীয়ত সম্মত হয় না বরং বৈধতার বিষয়টি কোরআন-হাদীসের বিধি বিধানের উপর নির্ভর করে। জুয়া ও মদের কথাই ধরুন, কোরআন করীমেই এতদুভয়ের উপকারিতার কথা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে হালাল করা হয়নি। (বাকারা ২৯৯) বুঝা গেল উপকারী হলেই হালাল হয় না। কোয়ান্টামের কার্যক্রম ও মতাদর্শ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এর অসংখ্য বক্তব্য সরাসরি কোরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এখানে সংক্ষেপে তার কয়েকটি আলোচনা পেশ করা হল।

(ক) কোয়ান্টাম কোর্স করতে প্রথমে একটি প্রত্যয়ন পাঠ করানো হয়। এই প্রত্যয়নই হলো কোয়ান্টামের মূল চালিকা শক্তি। যেখানে বলা হয় "অসীম শক্তির অধিকারী আমার মন, যা চাই তাই পাবো, যা খুশি তাই নেব"। অর্থাৎ কোয়ান্টামের বিশ্বাস হল সকল শক্তির উৎস মানুষের মন। (নাউযুবিল্লাহ) পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ঘোষণা অনুযায়ী সকল ক্ষমতা ও শক্তির উৎস মহান রাব্বুল আলামীন। তিনি চাইলে হয়, নতুবা হয় না। মানুষ কোন কিছু আল্লাহর দান ছাড়া অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ পাক ছাড়া সব কিছু সসীম, একমাত্র তিনিই অসীম। মনের শক্তিকে অসীম বলা স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে "সবকিছু আল্লাহর মুষ্ঠি বলয়ে"। (সূরা নিসা-১২৬) "তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না। (সূরা আত তাকভীর-২৯) "মানুষ যা চায় তাই কি পায়? অতএব পরবর্তী ও পূর্ববতী সব মঙ্গলই আল্লাহর হাতে। (সূরা আন নজম ২৪-২৫)

(খ) ইসলামের মাঝে একটি ভ্রান্তদল অতিবাহিত হয়েছে যাদের কে ক্বাদরিয়া বলা হতো। এরা তাক্বদীরকে অস্বীকার করত এবং মানুষকে ক্বাদেরে মুতলক্ তথা স্বাধীন ও সর্বশক্তির অধিকারী মনে করত। মানুষের সকল কাজের স্রষ্টা মানুষ নিজেই বলে বিশ্বাস করত। কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেও তাক্বদীর তথা ভাগ্যের লিখনিকে অস্বীকার করা হয়েছে। এবং মানুষকে ভাগ্য বিধাতা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোয়ান্টামের প্রসিদ্ধ উদাহরণ সার্কাসের হাতির কথাই ধরা যাক। ''জঙ্গল থেকে হস্তি শিশুকে ধরে এনে লোহার ৬ ফুট শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে রাখতে সে বড় হয়েও ৬ ফুট বৃত্তকে তার নিয়তি মনে করে। অথচ এখন সে বড়, তার দেহের প্রচন্ড শক্তি দিয়ে এক ঝটকায় শিকল ভেঙ্গে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু মনোজাগতিক নিয়তির শৃংখল তাকে পরিনত করে অসহায় প্রাণীতে। এমনকি সার্কাসে আগুন লাগলে হাতি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কিন্তু মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেনা''।

কোয়ান্টামের এই উদাহরণ দ্বারা নিয়তির শৃঙ্খল ভেঙ্গে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এবং তাক্বদীরকে ভ্রান্তবিশ্বাস ও মনোজাগতিক শৃঙ্খল আখ্যা দেয়া হয়েছে। যা সরাসরি কোরআন হাদীস অস্বীকারের শামীল। ইসলাম বলে তাক্বদীরের ভাল মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। হাদীসে জীবরাঈলে যে সকল বিষয়ে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে তাক্বদীর বা ভাগ্যের লেখন। তবে

এর অর্থ এই নয় যে হাত গুটিয়ে বসে থাকা বরং অল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলতে থাকতে হবে এবং সৎপথে থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। আর বিশ্বাস রাখতে হবে ভাগ্যের লেখনের উপর। ছাহাবায়ে কেরাম নবীজী (সা) কে এব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তবে আমল করে কি হবে? উত্তরে নবীজী (সা:) বলেন, كل ميسر لما خلق له ''প্রত্যেকের জন্য তাই সহজ হয় যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে''। হযরত আলী (রা:)কে কেউ তাক্বদীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেন, এক পা উঠাও, লোকটি উঠালো। এর পর বললেন, অপর পা উঠাও, তখন সে অপারগতা প্রকাশ করল। এটাই হলো তাক্বদীর, মানুষ এক কদম বাড়াতে পারে কিন্তু চুড়ান্ত কিছু করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। সার্কাসের হাতির মত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কথাও ইসলাম বলে না, আবার কোয়ান্টামের মত নিয়তির শিকল ভেঙ্গে ফেলার কথাও বলে না। ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষ চেষ্টার মালিক আল্লাহ দেবার মালিক। তিনি মঞ্জুর করলে বান্দার চেষ্টা সফল হবে, অন্যথায় হবে না।

কোয়ান্টাম বলে "মানুষ নিজেই পারে নিজের সব কিছু বদলে দিতে। রোগকে সুস্থতায়, অভাবকে প্রাচুর্যে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যেই রয়েছে।'' পক্ষান্তরে ইসলাম বলে হায়াত-মউত, সুস্থতা-অসুস্থতা, রিযিক, দৌলত বা মান সম্মান সব কিছুরই মালিক আল্লাহ। এসব বিষয় আল্লাহর ইচ্ছাধীন, মানুষ এতে কোন রদ বদল করার ক্ষমতা রাখেনা। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ''যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। (সূরা শুআ'রা- ৮০-৮১) ''তারা কি দেখেনা যে আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা রূম- ৩৭) ''তুমি বল আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সূরা ইউনুস ৪৯) কাজেই মানুষ নিজেই পারে সব কিছু বদলে দিতে, কোয়ান্টামের এমন বিশ্বাস কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থী।

(গ) কোয়ান্টামের মতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক। কাজেই যে কোন ধর্ম পালনই যথেষ্ট। কোয়ান্টামের দৃষ্টিতে সকল ধর্মই গ্রহণযোগ্য। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস পৃ:৯) পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ঘোষণা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম। বাকী সব ধর্ম কুফরী মতবাদ ও ভ্রান্ত। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : ''নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন এক মাত্র ইসলাম''। (সূরা আলেইমরান-১৯) ''যে লোক ইসলাম ছাড়া কোন ধর্ম তালাশ করে কস্মিন কালেও তা গ্রহণ করা হবে না। এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (আলেইমরান- ৮৫) তাছাড়া স্রষ্টার সত্ত্বা ও গুনাবলীর সংজ্ঞা প্রত্যেক ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন। খৃষ্টানরা তৃত্ববাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে পিতা, পুত্র ও মেরী এই তিন প্রভু মিলে হয় গড। হিন্দুরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের সমষ্টি ওঁম এর পূজারী। তাছাড়াও তাদের রয়েছে ৩৩ কোটি দেব-দেবী, এবং তারা ভগবানের জন্ম-মৃত্যু ও জয়-পরাজয়ে বিশ্বাসী। বৌদ্ধ ধর্মে স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই, সব কিছু প্রকৃতিগত ভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। আর ইসলাম বলে আল্লাহ এক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। অর্থাৎ ইসলাম একমাত্র একত্ববাদের ধর্ম, বাকী সব বহু ইশ্বরবাদ অথবা নাস্তিক্যবাদ। স্রষ্টাকে নিয়েই যেখানে এত মতভেদ সেখানে ধর্মের মূল শিক্ষা বলতে আর কি বাকী থাকে?! তাই কোয়ান্টাম সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক বলে যে মতবাদ প্রকাশ করেছে তা একটি অবাস্তব ও কুফুরী মতবাদ।

(ঘ) ''কোয়ান্টাম প্রত্যেককে উৎসাহিত করে আন্তরিক ভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনে''। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ: ১৪৩) কোয়ান্টামের এই ঘোষণা বা উৎসাহ প্রদান খোদাদ্রোহীতার শামিল। কেননা আল্লাহ পাক সকল আহলে কিতাব, মুশরিক ও পৌত্তলিকদের কোরআনের মাধ্যমে বার বার ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং নিজেদের কুফুরী ধর্মে অটল থাকার ভয়াবহ পরিনতির কথা বুঝিয়েছেন। এর বিপরীত কোয়ান্টাম প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্ম পালনে উৎসাহ প্রদান

করে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: '' আর আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনতো তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো।" (আলেইমরান -১১০) ''আর যদি আহলে কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যান সমূহে প্রবিষ্ট করতাম''। (মায়েদা-৬৫) আর ইসলাম গ্রহণ ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে পরিনতি কি হবে তাও বলা হয়েছে: ''যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহয্যকারী নেই।" (আলেইমরাম-৯১)

পবিত্র কোরআনের এধরনের স্পষ্ট বক্তব্যের পরে কেউ যদি মানুষকে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম পালনে উৎসাহ প্রদান করে তাহলে তা কিছুতেই মানুষের মঙ্গল কামনা হতে পারে না, বরং তা হবে প্রবৃত্তি পূঁজা ও ধোঁকাবাজী। সব ধর্মের লোককে খুশি করার মাঝে কোয়ান্টামে কি স্বার্থ রয়েছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। এধরনের মতাদর্শের অনুসরণ করে মানুষ দুনিয়াতে কিছু পেলে পেতে পারে তবে পরকালে রিক্তহস্ত হওয়া নিশ্চিত। এখন যদি কেউ পরকালেই বিশ্বাসী না হয় তবে তাকে বুঝানোই বেকার।

(ঙ) কোয়ান্টাম যেহেতু সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শনের প্রবক্তা তাই সে সব ধর্মের কিছু কিছু ধর্ম বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে। যেমন বৌদ্ধ ধর্মে স্রষ্টা নেই তাই মানুষকে কেউ সৃষ্টিও করে নাই, বরং মানুষের জন্ম-মৃত্যু একটি প্রাকৃতিক প্রবাহের মত অনবরত প্রবাহিত হয়ে চলছে। এখানে কেউ কাউকে সৃষ্টি করেনি। বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের আদিও নেই অন্তও নেই। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্তমতবাদ পৃ: ৬৬০) কোয়ান্টাম বৌদ্ধ ধর্মের এই মতকে গ্রহণ করে নিজেও হুবহু একই মত পোষণ করেছে। কোয়ান্টাম কনিকার ১৫ নং পৃষ্টায় বলা হয়েছে ''আপনি কসমিক ট্রাভেলার-মহাজাগতিক মুসাফির। আপনার জন্ম নেই মৃত্যু নেই।" জন্ম যদি না থাকে তাহলে জন্মদাতা ছাড়াই মানুষ অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার মানে প্রাকৃতিক ভাবেই সব হচ্ছে স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই। (নাউযুবিল্লাহ) একই পুস্তকে ২১ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি হয়"। এখানেও প্রকৃতিকে স্রষ্টা মানা হয়েছে, যা বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস। অথচ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে '' আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অত:পর রিযিক দিয়েছেন, এর পর তোমাদের মৃত্যু দিবেন, এর পর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারে? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।'' (সূরা রূম -৪০) ''কল্যাণময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন। এবং এতে রেখেছেন সূর্যও দীপ্তিময় চন্দ্র"। (ফোরকান -৬১)

কথা অনেক লম্বা হয়ে গেল তাই আর দীর্ঘ না করে যারা কোয়ান্টাম কোর্স করতে যাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে দু'একটি কথা বলেই শেষ করছি। শহীদ আল বোখারী এক জন জ্যোতিষী ও স্বঘোষিত সর্বদ্রষ্টা। (নাউযুবিল্লাহ) ইসলামে এধরনের জ্যোতিষ বিদ্যা ও অতীন্দ্রিয় বিদ্যার চর্চা সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। কোয়ান্টামের কমান্ড সেন্টার অধ্যায়ে যা কিছু শেখানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ঈমান বিধ্বংসী। আপনারা হয়ত জানেন না যে, এধরনের জ্যোতিষীদের কাছে গমন হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী ঈমান বিনাশী। নবীজী (সা:) বলেন ''যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে গমন করল এবং তার কথাকে সত্যায়ন করল সে যেন মোহাম্মদের উপর অবতীর্ণ দ্বীনকে অস্বীকার করল।" অপর হাদীসে বলা হয়েছে, ''যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে কোন বিষয় জানতে চাইল তার ৪০ দিনের নামায কবুল করা হবে না"। (সুনানুল কুবরা- ৮/১৩৮)

অতএব কোয়ান্টামের এসকল ঈমান বিধ্বংসী কর্মকান্ড ও কুফরী মতবাদ থেকে বেঁচে থাকা সকলের কর্তব্য।

লেখক: উস্তাদ, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।

কোয়ান্টাম মেথডঃ-২
মুক্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত বিশ্বাস

-মুফতী শরীফুল আজম

ঈমান ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে কিছু আক্বীদা-বিশ্বাস। মুমিন হতে হলে ঐ সকল আক্বীদা-বিশ্বাসকে মনে প্রাণে মেনে নিতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে মুমিন হিসেবে গণ্য করা হয় না। বিশুদ্ধ আক্বীদা বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়াই ছিল, যুগে যুগে প্রেরিত নবী রাসূলগণের অন্যতম মহান দায়িত্ব। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- সেই ধারাবাহিকতায় জাহেলিয়্যাতের সকল ভ্রান্তবিশ্বাসের মূলোৎপাঠন করে গোড়াপত্তন করেছিলেন শুদ্ধ বিশ্বাসের। নবীজী -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কর্তৃক প্রচারিত ঐ সকল আক্বীদা বিশ্বাসের কোন একটি অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। ইসলামের সকল আক্বীদা বিশ্বাসের খুটিনাটি বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা জরুরী নয়, শুধু সামগ্রিকভাবে সকল বিষয়ে ঈমান রাখাই যথেষ্ট। তবে ছয়টি মৌলিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর প্রতি স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন মুমিন হওয়ার জন্য আবশ্যক। এই ছয়টি বিষয়ের অন্যতম হচ্ছে 'তাকদীর' তথা ভাগ্যলিপি।

তাকদীরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, ফায়সালা করা, নির্ধারণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় তাকদীর বলা হয় "সৃষ্টি জগতের ব্যাপারে অনাদিকালে নেয়া আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনা ও ফায়সালাকে।" তাকদীরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা মনযুর নু'মানী (রহ.) বলেনঃ "তাকদীর মানে এই কথাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, পৃথিবীতে ভাল-মন্দ যাই ঘটছে সবই মহান আল্লাহর নির্দেশে ও ইচ্ছায় সংঘটিত হচ্ছে। যা তিনি অনাদিকাল থেকেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন। এমন হতে পারে না যে, তিনি যেমন চান পৃথিবীর এই কারখানা তার বিপরীত চলবে। এরূপ হলেতো আল্লাহ তাআলার দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রতীয়মান হবে।" (মাআরেফুল হাদীস ১/৬৬)

কুরআন হাদীসের বহু স্থানে তাকদীরের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ "বস্তুত তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে। বলে দাও এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।" (সূরা নিসা-৭৮)

হাদীসে জিব্রাঈলের ঘটনা তো প্রসিদ্ধ। এই হাদীসে পুরো দ্বীনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। এই তিনের সমষ্টিকে দ্বীন বলা হয়েছে। ঈমানের মধ্যে তাক্বদীর তথা ভাগ্যলিপির ভাল-মন্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (মুসলিম শরীফঃ হাদীস নং-১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ইরশাদ করেনঃ "আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সকল মাখলূকাতের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তখন আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল"। (মুসলিম শরীফঃ হাদীস নং-২৬৫৩) এখানে ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা থেকে উদ্দেশ্য হল ভাগ্য নির্ধারণ করা। পঞ্চাশ হাজার বছর বলে বহুকাল পূর্বে বুঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল হাদীসঃ খণ্ডঃ-১, পৃঃ-১৭৭)

তাকদীরের মধ্যে দু'টি বিষয়ের বিশ্বাস জরুরী। ১। তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস। ২। তাকদীরের ভালো মন্দ উভয়টির প্রতি বিশ্বাস। তাকদীর ভাল-মন্দ হওয়ার অর্থ সম্পর্কে আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) বলেন, "ভাগ্য ভাল-মন্দ হওয়ার বিষয়টি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভাগ্যলিপি মানুষের জন্য উপকারী হোক বা ক্ষতিকর, মিষ্ট হোক বা তিক্ত, মানুষের কাছে ভাল লাগুক বা না লাগুক সর্বাবস্থায় সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। যেমন ভাগ্যলিপি অনুযায়ী ঘি স্বাস্থ্যকর আর বিষ ক্ষতিকর। নেক আমল জান্নাতে নিয়ে যায় আর বদ আমল জাহান্নামের কারণ হয়। অর্থাৎ নেক আমল উপকারী ও বদ আমল অপকারী। শিশুর মৃত্যু অপছন্দনীয় আর বেচে থাকা পছন্দনীয়। মোট কথা পছন্দ ও অপছন্দ সব কিছুর প্রতি বিশ্বাস জরুরী। (রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসি'আ ১/৬৬১)

আক্বীদার পরিধি এতই ব্যাপক যে, আসমান-জমিনের সকল মাখলূকাতের খুটিনাটি সকল বিষয় এর আওতাভুক্ত। কর্ম, কর্মকারণ ও কর্মফল সবই রয়েছে ভাগ্যলিপিতে। মানুষ কোন মাধ্যমটি অবলম্বন করে কোন বস্তু অর্জন করবে তার সবই উল্লেখ রয়েছে এতে।

এক সাহাবী নবীজী -সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে সকল ঝাড়-ফুঁক ব্যবহার করি বা নিরাময়ের জন্য যে ঔষধ ব্যবহার করি এবং যে সকল ক্ষতিকর জিনিষ আমরা পরিহার করে চলি এগুলো কি তাক্বদীরকে বদলে দিতে পারে? নবী (সা) উত্তর দিলেন যে, এসব বস্তুও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।" (তিরমিযী শরীফ হাদীছ নং- ২১৪৮)

অর্থাৎ মানুষ কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে সকল তদবীর করে থাকে, এর জন্য যে মাধ্যম অবলম্বন করা হয় তার সবই ভাগ্যলিপিতে নির্ধারিত আছে। কোন ব্যক্তির রোগ কোন বস্তুর ব্যবহারে উপশম হবে সেগুলোও পূর্ব থেকেই ঐ ভাগ্যলিপিতে বিদ্যমান আছে। কাজেই তাকদীর অনুসারেই সে সুস্থ হচ্ছে। ঔষধের ক্ষমতায় নয়। এটাই হচ্ছে তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস।

মানুষের মধ্যে কেউ বোকা হয় আবার কেউ বুদ্ধিমান হয়, কেউ দূরদর্শী হয় আবার কেউ অপরিণামদর্শী, এসকল বিষয়ও তাক্বদীরে ধার্য করা আছে। হাদীসে আছে: "প্রত্যেক বস্তু তাকদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে, এমন কি অজ্ঞ ও বিজ্ঞ হওয়াটাও তাক্বদীরের প্রতিফলন"। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং২৬৫৫)

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া বান্দার দান খয়রাত, ইবাদত বন্দেগী কিছুই কবুল হবে না। হাদীস শরীফে আছে: "যদি তুমি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর তা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না যদি তুমি তাকদীরে বিশ্বাসী না হও এবং একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস না কর যে, যা কিছু তোমার উপর বর্তাবার রয়েছে তা থেকে কখনও তুমি রেহাই পাবে না আর যা কিছু তোমার হাত ছাড়া হওয়ার তা কখনও তুমি পাবে না। এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে যদি তুমি মৃত্যু বরণ কর তবে জাহান্নামে নিপতিত হবে।" (আবু দাউদ: হাদীস নং-৪৬৯৯, ইবনে মাজাহ: হাদীস নং-৭৭)

মানুষের কাজ হচ্ছে তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রেখে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মানুষ চেষ্টার মালিক, আল্লাহ দেওয়ার মালিক। ভাগ্যে থাকলে পাবে, অন্যথায় শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবে। এভাবে চেষ্টা করার এখতিয়ার আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে রেখেছেন। কিন্তু এই এখতিয়ার স্বাধীন নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কারণ মানুষের সকল চেষ্টার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে মনের আগ্রহ। মনে আগ্রহ তৈরী হওয়ার পরই মানুষ কাজের জন্য চেষ্টা শুরু করে। আর মনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। হাদীস শরীফে এসেছে: "সকল মানুষের মন আল্লাহর কুদরতী দুই আঙ্গুলের মাঝে একাত্মার মত রয়েছে। তিনি যে দিক ইচ্ছা মনকে ঘুরিয়ে দেন।"। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং-২৬৫৪) কাজেই মন আল্লাহর ইচ্ছা ও তাকদীরের বাইরে কোন কাজ করতে পারে না। যা করে সব ভাগ্যলিপি অনুসারে করে। ভাগ্যকে বদলাতে পারে না, বা ভাগ্য রচনা করতে পারে না।

উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকে মুসলমানদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত দলের বহি:প্রকাশ হয়ে ছিল। যারা ঈমানের অন্যতম শাখা তাক্বদীরকে অস্বীকার করত। তারা বিশ্বাস করত যে, মানুষের কাজ কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা নন। বরং সবই মানুষের ব্যক্তিগত অর্জন। সমগ্র প্রাণী জগতের কর্মে আল্লাহর কোন পরিকল্পনা নেই। মানুষ নিজেই নিজের সব কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম। ভ্রান্ত এই দলটি তৎকালীন যুগে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে ছিল। তাদের বলা হতো 'কাদরিয়া'। ইসলামী আক্বীদা ও দর্শনের কিতাবাদীতে এই ফেরকার বহু আলোচনা ও তাদের ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন বিদ্যমান রয়েছে। এক সময় এ দলটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ এই মতবাদের প্রচার বন্ধ ছিল। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে কোয়ান্টাম মেথড এর নামে নবরূপে 'কাদরিয়া' ফেরকার মতবাদ পূনরায় প্রচার শুরু হয়েছে। মুক্ত বিশ্বাসের নামে কৌশলে তাকদীরকে অস্বীকার করে চলছে। নিরাময়ের ছদ্মবেশে মেডিটেশনকে হাতিয়ার বানিয়ে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করার পথ বেছে নিয়েছে এরা। মুক্ত বিশ্বাস নামে নতুন এক জীবনদৃষ্টির প্রচারণা শুরু করেছে তারা।

কোয়ান্টামের 'মুক্ত বিশ্বাস'র বক্তব্য হল, মানুষ নিজেই পারে নিজের অবস্থাকে বদলে দিতে। অর্থাৎ নিজেই নিজের ভাগ্য রচনা করতে পারে এবং দুর্ভাগ্যকেও বদলে দিতে পারে। সকল কর্মের উৎস মানুষের মন ও মস্তিস্ক। কোয়ান্টামের ৩০০তম কোর্সপূর্তি স্মারক "কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস" এর একদম শুরুতে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। যার শিরোনাম হলো "মুক্তবিশ্বাস বদলে দেয় জীবন।" উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো। তবে এর পূর্বে লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিশ্বাস কখনও মুক্ত হতে পারে না। কারণ বিশ্বাস মানেই হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিধির ধ্যান-ধারণা মনে প্রাণে বদ্ধমূল করে নেয়া। মুক্ত মানে উন্মুক্ত, যার কোন পরিধি বা গণ্ডি থাকে না। তাই বিশ্বাস শব্দের বিশেষণ হিসেবে মুক্ত শব্দটি বেমানান। বিশ্বাস হয় শুদ্ধ হবে নয় ভ্রান্ত হবে। বিশ্বাস মুক্ত হতে পারে না। সে যাই হোক কোয়ান্টামের মুক্ত

বিশ্বাস হচ্ছে একটি ছোট বাক্য "আমি পারি আমি পারবো"। অর্থাৎ সকল কাজ কর্ম, চাওয়া-পাওয়ার ভিত্তি এই একটি বিশ্বাসই। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ নিজের ভাগ্য গড়তে পারে। অর্জন করতে পারে সকল লক্ষ্য। বদলে দিতে পারে জীবন। এই মুক্ত বিশ্বাসের প্রথম প্রভাব পড়ে মনে। মন প্রোগ্রাম পাঠায় মস্তিস্কে। আর মস্তিষ্ক মানুষের পারার ইচ্ছাটা বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে"। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস পৃ: ৬)

ইসলামের দৃষ্টিতে "আমি পারবো" বলে শত ভাগ নিজের উপর ভরসা করা এবং মন মস্তিস্কের ক্ষমতা বলে সকল লক্ষ্য অর্জন করার বিশ্বাস শরীয়ত পরিপন্থী। মানুষকে 'ক্বাদেরে মুতলাক' তথা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা একটি ভ্রান্ত ও কুফরী বিশ্বাস। বস্তুত আল্লাহর হুকুম ছাড়া মানুষের পারার ইচ্ছা পূরণ তো দূরের কথা স্বয়ং ইচ্ছাটাও সৃষ্টি হতে পারে না। তাই কোয়ান্টামের এই মুক্ত বিশ্বাস পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আত-তাকভীরের ২৯ নং আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না"।

কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি থিউরী। তা হলো "মন প্রোগ্রাম পাঠায় মস্তিষ্কে আর মস্তিষ্ক ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করে"। তাই আমরা বলতে পারি মন এক বিশাল স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা পরিচালিত করে মস্তিষ্ককে। আর মস্তিষ্ক পরিচালিত করে আপনার সকল শরীরবৃত্তীয় কার্যক্রমকে"। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ:৬) বিজ্ঞানের এই দর্শন অনুযায়ী মানুষের সকল কর্মের স্রষ্টা ও উৎস হচ্ছে মস্তিষ্ক। আর ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে মানুষ ও তাদের সকল কর্মের স্রষ্টা হচেছন আল্লাহ তা'আলা। বিজ্ঞানের দর্শন হলো শরীর পরিচালিত হয় মস্তিষ্কের সাহায্যে আর মস্তিষ্ক পরিচালিত হয় মনের সাহায্যে। কিন্তু মন পরিচালিত হয় কার মাধ্যমে একথা বলতে নাস্তিক বিজ্ঞানীরা নারাজ।

আসলে আল্লাহ তা'আলার কুদরতকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ইচ্ছাকৃতভাবে খামোশ হয়ে যায়। তাই মনের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে একথা স্বীকার না করে মনকে "স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া" বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। যা নাস্তিক্যবাদের পরিচয় বহন করে। অথচ হাদীস শরীফে বলা হয়েছে: "সকল মানুষের মন আল্লাহর দু'অঙ্গুলির মাঝে একাত্মার মত। তিনি মনকে যে দিকে ইচ্ছা ঘুরান।" (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ২৬৫৪) তাই মনকে স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া বলা উক্ত হাদীসের পরিপন্থী। এই হাদীসের সাথে বিজ্ঞানকে মিলাতে গেলে বলতে হবে, আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করে। আবার আল্লাহ তা'আলা এমন নিয়ম চালু করেছেন যে, মন মস্তিষ্ককে পরিচালিত করবে এবং মস্তিষ্কের মাধ্যমে শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালিত হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই হলেন মানুষের সকল কর্মের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। মন ও মস্তিস্কের ক্ষমতা মূলত আল্লাহর ইচ্ছাধীন পরিচালিত হয়। অতএব মনের স্বতন্ত্র ক্ষমতার ভিত্তিতে "আমি পারি আমি পারব" এ ধরনের মুক্ত বিশ্বাস কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস বলে গন্য হবে।

কোয়ান্টামের উক্ত প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে, "তাহলে রোগ, সুখ, অভাব, ব্যর্থতা ও হতাশাকে কেন প্রশ্রয় দেবেন? যেখানে আপনি নিজেই পারেন নিজের সব কিছু বদলে দিতে।.... প্রয়োজন শুধু মুক্ত বিশ্বাসের। মুক্ত বিশ্বাসই বদলে দিতে পারে আপনার জীবনের সব কিছু।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ:৬)

এই বাক্যগুলো থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জীবনের সকল প্রতিকুল অবস্থাকে বদলে দেয়ার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। মুক্ত বিশ্বাসের ক্ষমতা বলে মানুষ ভাগ্যের এসকল লিখনীকে বদলে দিতে পারে।(নাউযু বিল্লাহ) আর মুক্ত বিশ্বাস না থাকলে কি ক্ষতি তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উক্ত নিবন্ধে লেখা হয়েছে: "বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরও এদের সকল স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ:৭) অর্থাৎ যা পাওয়ার ছিল তাও হারায়। অথচ হাদীস শরীফের ভাষ্যানুযায়ী মানুষের যা প্রাপ্ত রয়েছে তা কেউ ফেরাতে পারবে না। আর যা হাতছাড়া হওয়ার তা কখনো পাবে না। এর বিপরীত ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নাম অবধারিত। বিস্তারিত হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই সবকিছু বদলে দেয়ার মুক্তবিশ্বাস এই হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। সুতরাং এমন মুক্ত বিশ্বাস একটি ভ্রান্ত ও কুফরী বিশ্বাস।

উক্ত প্রবন্ধে সরাসরি তাক্বদীর ও এর ভাল-মন্দের বিশ্বাসকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, "মুক্তবিশ্বাস যদি সবকিছু এত সহজে বদলে দেয় তাহলে দুর্দশাগ্রস্তরা, অভাবগ্রস্তরা, রোগ-শোকে ভারাক্রান্তরা কেন এই সহজপথকে সহজে গ্রহণ করে না? কারণ খুব সহজ। তারা বিশ্বাস করে নেতিবাচকতায়, বিশ্বাস করে দুর্ভাগ্যে, বিশ্বাস করে অলীকে।" (ঐ -পৃ:৭)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ভাগ্য ও ভাগ্যের ভালো মন্দ উভয় বিষয়ের বিশ্বাস ঈমানের অংশ।

বাকি অংশ পৃ: ২৮ ক: ৩

কোয়ান্টাম মেথড-৩

চাইলেই পাওয়া যায়!!?

-মুফতী শরীফুল আজম

আল্লাহ পাকের কাছে নশ্বর এই দুনিয়া যদি মশার ডানা তুল্য হতো, তবে কোনো কাফেরকে সেখান থেকে সামান্য এক ঢোক পানিও পান করাতেন না। দুনিয়া যেমন মূল্যহীন, দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়া তেমনই মূল্যহীন। ইহকালের প্রাপ্তি তেমন কোনো অর্জন নয়। তদ্রুপ এ জগতের বঞ্চনা তেমন হতাশার কারণ নয়। আসল ও স্থায়ী জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন, তাই আখেরাতের চাওয়া-পাওয়াই মুখ্য ও গুরুত্ববহ। এবং আখেরাতের স্বার্থ রক্ষার্থেই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। আখেরাতের সকল অর্জনের চাবিকাঠি হচ্ছে ঈমান। পার্থিব সকল চাওয়াগুলো যদি কারো ক্ষেত্রে পাওয়ায় রূপান্তরিত হয় অথচ সে ঈমান ছাড়া দুনিয়া ত্যাগ করে তবে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে সে হবে রিক্তহস্ত। কোয়ান্টামের "যা চাই তাই পাবো" সাধনা করতে গিয়ে নিজের অজান্তে ঈমানের মতো মহামূল্যবান দৌলত বিসর্জন দেয়া হচ্ছে কি না, তা ভেবে দেখা দরকার। কোনো গুপ্তঘাতক সংগোপনে মুমিনকে মুরতাদ বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত কি না চিন্তা করা প্রয়োজন।

কোয়ান্টাম মেথড মানুষের জাগতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্যে উদ্ভাবন করেছে কতক জীবনদৃষ্টি বা নযরিয়া। তার অন্যতম হচ্ছে **"মনে মনে সব সময় বলুন- আমি এক অনন্য মানুষ। আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম। যা চাই তাই পাব।"** (কোয়ান্টাম কণিকা-১৫) এরই আলোকে কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাসের "আমার বিশ্বাস" প্রবন্ধে লেখা হয়েছে যে, **"চাইলেই পাওয়া যায়। আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই তাতে।"** (কো.উ. ১০)

অর্থাৎ মনের যে অসীম ক্ষমতা রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ) সেই ক্ষমতা বলেই সব কিছু অর্জন করা সম্ভব। অথচ মন-মস্তিষ্কের ক্ষমতার ওপর শতভাগ আস্থাশীল হয়ে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো কিছু পাওয়ার আশা করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী।

তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর ভরসা করা ইসলামের অন্যতম ফরয একটি বিধান। সকল চাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে এক আল্লাহর ওপর আস্থা রাখাই হচ্ছে তাওয়াক্কুলের শিক্ষা। যা অনেকটা উকিল নিযুক্তির মতো ব্যাপার। যেভাবে কোনো কাজ নিজে সম্পাদন করা সম্ভব না হলে তা অন্য কারো হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয় এবং তার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী, তার ওপর আস্থাশীল হয়ে সম্পন্ন করা হয়। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর হাতে সকল কার্যাদি সোপর্দ করে শরীয়তের বিধান মতে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই হচ্ছে তাওয়াক্কুল। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে মূল নিয়ন্তা বিশ্বাস করে নিজের সকল চেষ্টাকে তার অনুগত করে দেয়া। বস্তুবাদীদের মতো বস্তুকে স্বতন্ত্র ক্ষমতার মালিক মনে করা হারাম ও ভ্রান্ত মত। তবে বস্তুর মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা রয়েছে এ কথা মানতে হবে। (শরীয়ত ও তরীকত-হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) পৃ. ১২২)

অর্থাৎ দাতা আল্লাহ তা'আলা/গড/ ভগবান/প্রকৃতি যেই হোক না কেন, সেটা মুখ্য বিষয় নয়। বরং 'চাইলেই পাওয়া যায়' এ বিশ্বাসের বলে লক্ষ্য অর্জিত হওয়া একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। কোয়ান্টামের মতে, আল্লাহ/গড/ ভগবান/প্রকৃতি যে কেউ দাতা হতে পারে। তাই কোয়ান্টাম সদা শোকরগোজারের শিক্ষা দেয় এভাবে "দিনে বারবার বলব শোকর আল হামদুলিল্লাহ/থ্যাংকস গড/হরি ওম/প্রভুকে ধন্যবাদ।" (কোয়ান্টাম কণিকা-২৩৯)

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে মুমিনদের প্রতি তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

"অতপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন তখন আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করুন। আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন। যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের ওপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর ওপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত।"(সূরা আলে-ইমরান-১৫৯-৬০)

"আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন, তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।"
(সূরা আত-তাওবাহ-৫১)

"আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহর ওপর ভরসা করুক।"
(সূরা আত- তাগাবুন-১৩)

"নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের।"
(সূরা ইউসুফ-৬৭)

"আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালুর ওপর।"
(সূরা আশশো'আরা-২১৭)

"আপনি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই।"
(সূরা আল-ফুরকান-৫৮)

"আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করুন কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।"
(সূরা আল-আহযাব-৩)

এ সকল আয়াতের শিক্ষা হলো বস্তুর ওপর আস্থাশীল হওয়ার পরিবর্তে এক আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। বস্তু হলো পার্থিব উপকরণ, যা এক যবনিকা বিশেষ। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে তা আল্লাহরই। তাঁর ইশারা ছাড়া বস্তুজগতে কিছু সংঘটিত হতে পারে না। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুমিনের জন্য আবশ্যক হলো সর্বক্ষেত্রে তাঁর ওপর আস্থা ও ভরসা রাখা। পার্থিব উপায়-উপকরণকে নিছক মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করা। আর এ কথা বিশ্বাস করা যে, এগুলোর ওপর ভালো-মন্দ নির্ভরশীল নয়। বরং সকল চেষ্টা ও তদবিরের ফলাফল দানের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ।

কোয়ান্টামের 'চাইলেই পাওয়া যায়' অথবা 'যা চাই তাই পাব' এ ধরনের বিশ্বাসের মাঝে তাওয়াক্কুলের মহান শিক্ষা চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলার ওপর আস্থা ও ভরসার পরিবর্তে মন-মস্তিষ্কের ক্ষমতার ওপর আস্থাশীল হয়ে চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করার কথা বলা হয়েছে। আর এ বিষয়টির সম্ভাব্যতাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ***"বিশ্বাসের প্রথম প্রভাব পড়ে মনে। মন প্রোগ্রাম পাঠায় মস্তিষ্কে। আর মস্তিষ্ক আপনার পারার ইচ্ছাটা বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে।"***
(কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-৬)

"আসলে মন-দেহের অফুরন্ত পুনরুজ্জীবনী ক্ষমতা ও বিশ্বাসের শক্তিই সকল মানবীয় সম্ভাবনাকে বাস্তবরূপ দেয়।" (ঐ-৮) অর্থাৎ মানুষের যে কোনো ইচ্ছা বা চাওয়া বাস্তবরূপ লাভ করে মন-মস্তিষ্কের বলে। তাহলে মন-মস্তিষ্কই হলো এর বাস্তবরূপদাতা ও প্রকৃত কার্যনির্বাহক। এখানে আল্লাহর ওপর ভরসার কোনো প্রশ্ন নেই।

এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'আমার বিশ্বাস' শিরোনামের প্রবন্ধে। বলা হয়েছে, **"কে কোন ধর্মে বিশ্বাসী", সেটা কোনো ব্যাপার নয়। যে যেভাবেই করুন, মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে অন্যায় স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর সবই পাওয়া সম্ভব; তা আপনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যা-ই হোন কিংবা না হোন। এটা পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য।"** (ঐ পৃঃ-১০) অর্থাৎ মেডিটেশন তথা ধ্যান চর্চার মাধ্যমে যে কোনো লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত, এখানে আল্লাহর ওপর ভরসা করা না করার কোনো আলোচনা নেই। আল্লাহর ওপর ঈমান আছে কি না তাও দেখার বিষয় নয়। বরং চাইলেই পাওয়া যায় এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য। কোয়ান্টামের এ সকল জীবনদৃষ্টি কখনো মুমিন-মুসলমানের বিশ্বাস হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বারবার যেখানে আল্লাহর ওপর ভরসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহই সকল ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে মন-মস্তিষ্কের ওপর আস্থাশীল হওয়ার শিক্ষা বস্তু পূজার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুবাদীরা আদতেই তকদীর ও

তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী নয়। তারা পার্থিব উপায়-উপকরণকেই আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো সকল উপকরণ অবলম্বন করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ফলাফল বস্তুর অধীন নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মন-মস্তিষ্কের অধীন নয়; বরং আল্লাহর হুকুমের অধীন। মুমিন হতে হলে এমন বিশ্বাস পোষণ করতে হবে, কোয়ান্টামের 'বৈজ্ঞানিক সত্য' বিশ্বাস নয়।

আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা না করে মন-মস্তিষ্কের ক্ষমতাবলে লক্ষ্য অর্জন করতে চাইলে কিরূপ বিপর্যয় আসতে পারে তার একটি নমুনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি ইসলামপূর্ব যুগের। হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে ঘটেছিল। ইয়ামেনের রাজধানী সান-আ থেকে ছয় মাইল দূরে একটি উদ্যান ছিল। যার মালিক ছিল আহলে কিতাব। উদ্যানে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ সর্বদা-মিসকিনদের দান করা ছিল তার অভ্যাস। সে লোকের মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যানের উত্তরাধিকারী হলো। তারা ফকিরদের অংশ দেয়ার প্রথাটি বাতিল করার হঠকারী সিদ্ধান্ত নিল এবং খুব ভোরে সকলের অগোচরে ফসল তুলে আনার জন্য রওনা করল। এই পরিকল্পনায় তাদের নিজেদের ওপর এত আস্থা ছিল যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে ইনশাআল্লাহ বলারও প্রয়োজন মনে করল না। অথচ ইনশাআল্লাহ বলে কোনো কাজের ইচ্ছা করা হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। তাওয়াক্কুলের এ নির্দেশ উপেক্ষা করার ফলে তাদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে– "আমি তাদের পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যান ওয়ালাদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, ইনশাআল্লাহ না বলে। অতপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল। ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণসম।" (সূরা আল-কলম ১৭-২০)

অতএব ইনশাআল্লাহ বলে আল্লাহর ওপর ভরসা স্থাপন ছাড়া মন-মস্তিষ্কের ক্ষমতাবলে "যেখানে দরকার সেখানে যাব। যা প্রয়োজন তাই নেব। "যা চাই তাই পাব।" এ ধরনের জীবনদৃষ্টি বিজ্ঞানসম্মত হলে হতে পারে কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে এটা ঈমানবিনাশী হিসেবে গণ্য হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, কোয়ান্টামের মতে চাইলেই পাওয়া যায় কথাটি যদি ঠিক হয়, তাহলে দেয় কে? কোয়ান্টামের ভাষায় এর উত্তর দেয়া হয়েছে "আমার বিশ্বাস" নামক প্রবন্ধে। চাইলেই পাওয়া যায়। তবে চট করে না। ধৈর্যের সাথে সঠিক নিয়মে ধ্যান চর্চা করলে লক্ষ্যবস্তু চলে আসবে হাতের মুঠোয়। কেন আসবে? "কেন আসবে, তার ব্যাখ্যা একেকজনের কাছে একেক রকম। বিশ্বাসী সেটাকে পরমেশ্বরের দান হিসেবে গ্রহণ করবে; আর যাঁরা মনে করেন প্রকৃতিই আমাদের নিয়ন্তা, তাঁরা অনুভব করবেন একান্তভাবে কিছু চাইলে সেটা পাওয়া যায়–এটাই প্রকৃতির নিয়ম।" (কো.উ.-১০) অর্থাৎ দাতা আল্লাহ তা'আলা/গড/ ভগবান/প্রকৃতি যেই হোক না কেন, সেটা মুখ্য বিষয় নয়। বরং 'চাইলেই পাওয়া যায়' এ বিশ্বাসের বলে লক্ষ্য অর্জিত হওয়া একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। কোয়ান্টামের মতে, আল্লাহ/গড/ ভগবান/প্রকৃতি যে কেউ দাতা হতে পারে। তাই কোয়ান্টাম সদা শোকরগোজারের শিক্ষা দেয় এভাবে "দিনে বারবার বলব শোকর আল হামদুলিল্লাহ/থ্যাংকস গড/হরি ওম/প্রভুকে ধন্যবাদ।" (কোয়ান্টাম কণিকা-২৩৯)

অথচ কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে দাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। দেবার অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। এটাই তাওহীদের শিক্ষা। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে হলে চার স্তরের তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে। এর কোনো এক স্তরকে বাদ দিলে একত্ববাদী হওয়া যাবে না।

(ক) توحيد ذات অর্থাৎ অনাদি-অনন্ত, চিরঞ্জীব একমাত্র আল্লাহ অন্য কেউ নয়।

(খ) توحيد خلق অর্থাৎ স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ অন্য কেউ নয়।

(গ) توحيد تدبير অর্থাৎ সমগ্র জগতের একমাত্র নিয়ন্তা আল্লাহ, অন্য কেউ নয়।

(ঘ) توحيد الوهيت অর্থাৎ একমাত্র উপাস্য আল্লাহ অন্য কেউ নয়। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ-১/১৭৬)

বিধায় বান্দার চাওয়া-পাওয়া নিয়ন্ত্রণ করেন একমাত্র আল্লাহ। বান্দার কোনো ইচ্ছা পূরণ হবে কোনটি পূরণ

হবে না এসবই তাঁর ইচ্ছাধীন। দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাতে নেই। এর বিপরীত গড/ওম/প্রকৃতির কার্যনির্বাহী ক্ষমতা মেনে নেয়া হলে তা হবে তাওহীদের তৃতীয় স্তর পরিপন্থী একটি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এমন ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের মাঝে কোয়ান্টামের কোনো সৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। মানুষের হিত কামনা যদি তাদের উদ্দেশ্য হতো তবে গড/ওম/প্রকৃতি পূজারিদের নিজ নিজ ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি আহ্বান করত। যা আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ও মুক্তির একমাত্র পথ। এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দিকে আহ্বান না করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ তথা সুন্নাতের দিকে আহ্বান করত।

এবার আসুন 'চাইলেই পাওয়া যায়' দাবিটি কতটুকু বাস্তব তা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাচাই করে দেখি। মানুষের সকল চাহিদা পূরণ হবার জায়গা দুনিয়া নয়। চাইলেই পাওয়া সম্ভব যদি হতো তাহলে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হতো। কারণ স্বর্গ তথা জান্নাতেই কেবল সকল চাহিদা পূরণ হওয়ার গ্যারান্টি রয়েছে। আর পার্থিব জীবনের চাহিদাগুলো পূরণ হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাকে যতটুকু দেবার সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাক করেন সে ততটুকুই পায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "যে শুধু দুনিয়ার আশু সুখসম্ভোগ কামনা করে আমি যতটুকু ইচ্ছা এবং যাকে ইচ্ছা এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি। পরে তার জন্য দোজখই ঠিক রেখেছি, সে তাতে প্রবেশ করবে, নিন্দিত ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত অবস্থায়।" (সূরা বনী ইসরাঈল-১৮) এই আয়াতে চাইলেই পাওয়া যাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। বরং এর জন্য দুইটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এক ما نشاء আমি যা ইচ্ছা দেব। দুই لمن نريد যাকে ইচ্ছা দেব। বোঝা গেল, এখানে সকল চাওয়া পূর্ণ হবে না এবং সকলের চাওয়া পূর্ণ হবে না। এখানে আল্লাহ পাক যাকে যতটুকু ইচ্ছা দিয়ে দেবেন। অতএব মানুষের সকল প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার সুযোগ পার্থিব এ জগতে রাখা হয়নি। এমন সুযোগ থাকবে শুধুমাত্র জান্নাতে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না। চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোনো। ইহকাল ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবি কর। (সূরা হামীম-সেজদা ৩০-৩১)

তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআনে পাকের এ সকল স্পষ্ট ঘোষণার বিপরীত কোয়ান্টামের মনগড়া বৈজ্ঞানিক জীবনদৃষ্টি ঈমান ধ্বংসের চোরাবালি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে চাইলে পাওয়া যাওয়ার স্থান দুনিয়া নয়, আখেরাত। এটাই মুমিনের বিশ্বাস।

'চাইলে পাওয়া যায়' কোয়ান্টামের এমন দাবিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনে। এবং দৃঢ়তার সাথে মানবজাতিকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইহকাল ও পরকালের সকল কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি মঞ্জুর না করলে মানুষের কোনো চাহিদাই পূরণ হবে না। আরবের কাফের মুশরিকগণ লাত/উয্যা/মানাত-দেবতার সুপারিশ লাভের প্রত্যাশী ছিল। পরকালে বিশ্বাসী না হয়েও তারা পরকালের কল্যাণ লাভের আশাবাদী ছিল। মক্কা ও তায়েফের বড় বড় নেতাদের কাছে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করত। তাদের এ সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনোই পূরণ হবে না। বরং সব সিদ্ধান্ত আল্লাহর ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে–

ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى

"মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহর হাতে।" (সূরা আন নাজ্ম ২৪-২৫) যদিও আয়াতটি আরবের কাফের-মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখানে কেয়ামত অবদি সকল মানুষের জন্য এ কথার শিক্ষা রয়েছে যে মানুষ যা চায় তা পায় না বরং আল্লাহ পাক যা চান তাই হয়। তিনি দান করলে বান্দারা পায়, অন্যথায় তাদের চাওয়া অধরা থেকে যায়। মুমিন হতে হলে এমন বিশ্বাসই পোষণ করতে হবে এবং বলতে হবে চাইলে পাওয়া যায় না বরং দিলে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা দান করলে পাব, অন্যথায় পাব না। এর বিপরীত মন-মস্তিষ্কের বলে "যা চাই তাই পাব" অথবা "চাইলেই পাওয়া যায়" এমন বিশ্বাস বস্তুপূজার অন্তর্ভুক্ত এবং তাওয়াক্কুলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

কোয়ান্টাম মেথড-৪

পবিত্র কুরআন বিকৃতির অভিনব কৌশল

মুফতী শরীফুল আ'জম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানি কিতাবের মাঝে রদবদলের ঘটনা মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। যার সূচনা ইহুদী-খৃষ্টান কর্তৃক তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে হয়েছে। ইসলাম ধর্ম আগমনের বহুপূর্বে এই আসমানি কিতাবদ্বয় সংযোজন-বিয়োজনের শিকার হয়ে তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলে। এক দল অর্থলিপ্সু রাহেব ও পাদ্রীদের অন্যায় হস্তক্ষেপের দরুনই এই করুণ পরিণতির শিকার হয় আসমানি এই কিতাবদ্বয়।

পবিত্র কুরআনে তাদের এই অপকর্মের স্বাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে এবং ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

"অতএব তাদের জন্য আফসোস যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্য।" (সূরা আল-বাকারা ৭৯)

ইহুদী খৃষ্টান পণ্ডিতগণ আসমানি কিতাবের মাঝে যে বিকৃতি সাধন করে তা মৌলিকভাবে চার ধরনের। ক. শব্দ সংযোজন। খ. শব্দ বিয়োজন। গ. শব্দ পরিবর্তন। ঘ. অর্থ পরিবর্তন। (বাইবেল সে কুরআন তক ২/১৩)

পবিত্র কুরআন যা সর্বশেষ আসমানি কিতাব তা এ-যাবৎ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয়েছে। অন্য সব কিতাবের মতো এখানেও বিকৃতি সাধনের নানা অপচেষ্টা যুগে যুগে হয়ে আসছে। কিন্তু একটি অক্ষর বা যের যবর পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন করতে পারেনি। আজ চৌদ্দশত বছর যাবৎ পবিত্র এই কিতাব আদ্যোপান্ত হুবহু সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কারো সাধ্য নেই যে, এর এক অক্ষর ভুল তেলাওয়াত করবে। তৎক্ষণাৎ বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

বাদশাহ মামূনুর রশীদের যুগে এক ইহুদী পণ্ডিত ছিল। হস্তলিপিতে তার প্রসিদ্ধি ছিল। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে চড়া মূল্যে বিক্রি করত। একবার সে বিভিন্ন ধর্ম যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন প্রতিটির তিনটি করে কপি লিপিবদ্ধ করল এবং এগুলোর মাঝে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বেশকম করে দিল। এরপর তাওরাত ও ইঞ্জিলের কপিগুলো বিক্রির উদ্দেশ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে নিয়ে গেলে তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে কিনে নিল। আর মুসলমানদের কাছে কুরআনের কপিগুলো নিয়ে গেলে তারা এতে বেশকম লক্ষ্য করে ফেরত দিল। এই ঘটনা দেখে সে নিশ্চিত হলো যে, একমাত্র কুরআনই সংরক্ষিত আছে। অতঃপর সে মুসলমান হয়ে গেল। এই পার্থক্যের একমাত্র কারণ হচ্ছে কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গ্রহণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

"আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" (সূরা হিজর ৯)

পক্ষান্তরে তাওরাত ও ইঞ্জিল হেফাজতের দায়িত্ব ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তারা এতে খেয়ানত করেছে বিধায় আজ ওই সকল গ্রন্থ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (সূরা মায়েদা ৪৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

আজ বিশ্বের কোথাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত মূল হিব্রু ও সুরিয়ানী ভাষার তাওরাত ও ইঞ্জিলের একটি কপিও বিদ্যমান নেই। মূল পাঠ বাদ দিয়ে ভাষান্তর ও মর্মবাণী প্রচার-প্রসারের কারণে এই ভয়াবহ বিকৃতি সাধিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বেলায়ও বিভিন্ন যুগে ইসলাম দুশমনদের পক্ষ থেকে এমন আচরণ করা হয়েছে। কুরআন বিকৃতির অপচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে শিয়া সম্প্রদায়। কুরআনের মাঝে তারা বিভিন্ন আয়াত ও সূরা সংযোজন করেছে। আবার অনেক আয়াত বাদ দিয়েছে। বিভিন্ন আয়াতের অর্থ পরিবর্তন করে দিয়েছে। যার বিশদ বিবরণ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) রচিত 'তুহফায়ে ইছনা আশারিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে তাদের সকল চক্রান্ত আল্লাহর হুকুমে ভেস্তে গেছে। যুগে যুগে উলামায়ে হক্ব তার দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে উম্মতের ঈমান আমল হেফাজত করে এসেছেন।

এ ছাড়া যুগে যুগে বহু নামধারী ইসলামী চিন্তাবিদগণ কুরআনের তাফসীর ও অনুবাদের বিকৃতি সাধনের চেষ্টা করেছে। আধুনিক যুগেও তাফহীমুল কুরআন নামে বিকৃত তাফসীর কোনো কোনো মহলে প্রচলিত আছে। উক্ত তাফসীরের বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যাসমূহ চিহ্নিত করে লেখা 'মওদূদী কী তাফসীর ওয়া নজরিয়াত পর ইলমী ওয়া তাহকীকী জায়েযাহ' 'মওদূদীর তাফসীর ও চিন্তাধারা' নামে গ্রন্থটি পড়ে বিস্তারিত জানা যেতে পারে।

অতীতের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলাম দুশমনেরা বর্তমানেও কুরআন বিকৃতির

অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করে চলছে। বিভিন্ন ছদ্মরূপ ধারণ করে মানবতার হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে ইসলামকে ধ্বংস করার নিত্যনতুন ফন্দি করে যাচ্ছে। জীবন বদলে দেওয়ার শ্লোগান নিয়ে প্রায় দুই যুগ ধরে কোয়ান্টাম মেথড এ দেশে নীরবে-নির্বিঘ্নে বিভিন্ন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। অশান্ত মনে প্রশান্তি আনতে মেডিটেশন (বৈজ্ঞানিক ধ্যান) চর্চার নামে বিভিন্ন মনগড়া মতাদর্শ শিক্ষা দিয়ে চলছে। তাদের নানামুখী তৎপরতা দেখে জনমনে সন্দেহ না জেগে পারে না। নিরাময়ের সাথে ধর্ম তত্ত্বের কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা বোধগম্য নয়। একযোগে সকল ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী প্রচারের উদ্দেশ্য কী, তাও অস্পষ্ট।

কোয়ান্টাম প্রথম দিকে বেদ কণিকা, বাইবেল কণিকা, ধম্মপথ কণিকা, কুরআন কণিকা ও হাদীস কণিকা নামে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক রচনা করে। এ সকল পুস্তিকায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের কিছু মর্মবাণী প্রচার করা হয়। কিছুদিন এভাবে চলার পর বিষয়টি গা-সওয়া হয়ে গেলে সব কয়টি পুস্তিকা একত্র করে কণিকাসমগ্র/ কোয়ান্টাম কণিকা নামে প্রকাশ করা হয়। এভাবে সহজে মুসলমানদের ঘরে ঘরে বেদ-বাইবেলের মর্মবাণী পৌঁছে যেতে থাকে। ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন মুসলমানগণ কোনো বাছ-বিচার ছাড়া তা পাঠ করে মোহিত হয়ে যায়। ফলে ইসলামের সাথে সাথে অন্য সব ধর্মকেও সত্য ও পালনীয় বলে বিশ্বাস করতে চায়। অপরদিকে কুরআন কণিকা ও হাদীস কণিকায় মর্মবাণী রচনার নামে আয়াতও হাদীসের মূল আরবী পাঠ বাদ দিয়ে বিকৃত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনুবাদ করে দেওয়া হয়। অনেকটা এক গুলিতে দুই শিকারের মতো ব্যাপার। একদিকে সকল ধর্মের স্বীকৃতি, অপরদিকে কুরআন হাদীসের বিকৃতি।

আজকের আলোচনায় শুধু কুরআন বিকৃতির কিছু নমুনা কোয়ান্টাম কণিকা থেকে তুলে ধরা হলো।

কোয়ান্টাম কণিকা গ্রন্থের একেবারে শেষের দিকে স্থান পেয়েছে কুরআন কণিকা। যার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আল-ফাতেহার অনুবাদ। এখানে প্রথমে সূরায়ে ফাতিহা ও তার সঠিক অনুবাদ উল্লেখ করা হলো এর পর কোয়ান্টাম কণিকার সূরা ফাতেহার অনুবাদ হুবহু উল্লেখ করা হবে এবং বিকৃতির ধরণ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ☆ الرحمن الرحيم ☆ مالك يوم الدين ☆ اياك نعبد وايا ك نستعين ☆ اهدنا الصراط المستقيم ☆ صراط الذين انعمت عليهم ☆ غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔

"১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচারদিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদের সরল পথ দেখাও। (৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।" (মাআরিফুল কুরআন পৃষ্ঠা ১)

কোয়ান্টামের অনুবাদ–

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক হে আল্লাহ তোমারই জন্য। তুমি দয়াময়! মেহেরবান! প্রতিদান দিবসের মালিক! আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য চাই। প্রভু হে! বিভ্রান্ত ও অভিশপ্তদের অন্ধকার গহ্বর থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো। প্রভু হে! তোমার প্রিয়জনদের সহজ-সরল আলোকিত পথে আমাদের পরিচালিত করো। আমীন। (সূরা ফাতেহা)

সূরা ফাতেহার এই অনুবাদে বিকৃতির ধরনসমূহের বিবরণ :

এক. "বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক"

رب العالمين এর এই অনুবাদ করা হলে মহান আল্লাহর কর্তৃত্বকে খাটো করা হয়। কেননা عالم শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যাতে সকল মাখলূকাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে 'বিশ্বজাহান' বলতে শুধু পৃথিবীর এই জগতকে বোঝায়। নির্ভরযোগ্য আরবী অভিধান "মিসবাহুল্লুগাত"এ عالم শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে سارى مخلوق। সে হিসেবে বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "মাআরিফুল কুরআনে"-এর অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে।

"যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।" ইমাম রাজী (রহ.) তাফসীরে কবীরে লিখেছেন যে, এই সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগৎ রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত ও এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সকল বস্তুই আল্লাহর ক্ষমতার অধীনে। (মাআরিফুল কুরআন ১/৭১)

তাই শুধুমাত্র "বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক" অনুবাদটি যে, ভুল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাতে সন্দেহ নেই।

দুই. "হে আল্লাহ" বাক্যটি আহ্বান সূচক। যাকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় ندا (নেদা) বলা হয়। الحمد لله এর অনুবাদে এভাবে আহ্বান করে "হে আল্লাহ" বলার অবকাশ নেই। যেহেতু তা আহ্বান সূচক বাক্য নয় বরং তা جمله خبريه (উদ্দেশ্য ও বিধেয়)। যার সঠিক তরজমা হচ্ছে– "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার।" (মাআরিফুল কুরআন পৃ:২)

অতএব "হে আল্লাহ" অনুবাদটি ভুল।

তিন. "তোমারই জন্য" বাক্যটি সম্বোধন সূচক। যা মূলত حاضر তথা মধ্যমপুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। অথচ لله বাক্যে কোনো রূপ সম্বোধন নেই। বরং এখানে غائب তথা নামপুরুষ

ব্যবহার করা হয়েছে। যার সঠিক অনুবাদ হচ্ছে– "আল্লাহ তা'আলার জন্য।" অতএব "তোমার জন্য" অনুবাদটি ভুল।

চার. "তুমি দয়াময়! মেহেরবান! প্রতিদান দিবসের মালিক!" এখানে সূরায়ে ফাতেহার দুই ও তিন নম্বর আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে। এতে 'তুমি' বলে حــاضــر তথা মধ্যমপুরুষ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে উক্ত আয়াতদ্বয়ের মাঝে غــائــب তথা নামপুরষের ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে– "যিনি নিতান্ত মেহরবান ও দয়ালু, যিনি বিচার দিনের মালিক।" তাই এখানে حــاضــر তথা মধ্যমপুরুষ ব্যবহার করে অনুবাদ করা ভুল।

পাঁচ. পবিত্র কুরআনের অন্যতম অলৌকিকতার নির্দশন হচ্ছে নিপুণভাবে বালাগাত তথা অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োগ। এরই ধারাবাহিকতায় সূরা ফাতেহার প্রথম তিন আয়াতে غــائــب তথা নামপুরুষ ব্যবহার করে পরবর্তী আয়াতসমূহে خطاب তথা সম্বোধনসূচক বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। ইলমে বালাগাত তথা আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে–

الالتفات من الغيبة الى الخطاب বলা হয়। (আল ইতকান ২/১৮৬)

যা উচ্চমানের সাহিত্যিকতার পরিচায়ক ও ভাষার সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। কোয়ান্টামের অনুবাদে পবিত্র কুরআনের এই সাহিত্যপূর্ণভাব, অলৌকিক শব্দশৈলী ও অনন্য গাঁথুনিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। যা কুরআন বিকৃতির একটি ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত। সঠিক অনুবাদ হবে এভাবে–

"সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক।"

এই তিন আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে غــائــب তথা নামপুরুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরের আয়াতের অর্থ: "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি....." এখান থেকে কথার ধরন পরিবর্তন হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলাকে এখন সরাসরি সম্বোধন করে حــاضــر তথা মধ্যমপুরুষ ব্যবহার শুরু হয়েছে। গুণকীর্তনের পর মাওলার সাথে বান্দার যেন সাক্ষাৎ হয়ে গেছে। আর সরাসরি কথোপকথন আরম্ভ হয়ে গেছে। তাই কুরআনের এই বিশেষ বচনভঙ্গি অনুসরণ করে অনুবাদ না করা হলে তা বিকৃত অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ছয়. "প্রভু হে!" শব্দটি দু'আয়াতের শুরুতে দু'বার আনা হয়েছে। অথচ মূল আয়াতে এমন আহ্বান সূচক কোনো শব্দ নেই যার অর্থ "প্রভু হে!" দ্বারা করা যেতে পারে। অতএব এই শব্দটি কুরআনের মাঝে সংযোজনের অন্তর্ভুক্ত। আসমানি কিতাব বিকৃতির যে চারটি পন্থা শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে এ ধরনের শব্দ সংযোজন তার অন্যতম।

সাত. "অন্ধকার গহ্বর থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর" অনুবাদের এ অংশটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। মূল আয়াতে এমন কোনো শব্দ নেই যার অর্থ 'অন্ধকার গহ্বর' ও 'রক্ষা কর' হতে পারে। মনগড়া একটি বাক্য কোয়ান্টামের পক্ষ থেকে সূরায়ে ফাতেহায় সংযোজন করা হয়েছে। যা চরম ধৃষ্টতার শামিল।

আট. "আলোকিত" শব্দটি الــمــســتــقــيــم শব্দের অনুবাদ হতে পারে না। কারণ الــمــســتــقــيــم অর্থ সরল। তাই আলোকিত শব্দটি এখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আনা হয়েছে। এবং এর দ্বারা কোন্টামের বাতলানো পথ ও মতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোয়ান্টাম কণিকা গ্রন্থের শুরুতেই লেখা আছে 'আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র।' আর সূরায়ে ফাতেহার অনুবাদে এসে সেই আলোকিত শব্দটি প্রয়োগ করে কী বোঝানো হয়েছে তা কারো কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

নয়. কোয়ান্টামের কুরআন কণিকায় সূরায়ে ফাতেহার শেষ তিন আয়াতের অনুবাদ আগে-পরে করে লিখা হয়েছে। সপ্তম আয়াত- غير المغضوب عليهم ولا الــضــالــين এর অনুবাদ আগে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াত اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم এর অনুবাদ পরে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ যে ধারাবাহিকতায় সাজানো রয়েছে তা হুবহু যথাক্রমে রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। আয়াতকে আগপিছ করা মারাত্মক গোনাহ। হাফেজ সুয়ূতী (রহ.) বর্ণনা করেন–

وقــال الــقــاضــى ابو بكر فى الانتصاف: تــرتــيــب الآيات امر واجب وحكم لازم فــقد كان جبرئيل يقول : ضعوا آية كذا فى موضع كذا

"আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক। কেননা জিবরাঈল (আ.) স্বয়ং বলে দিতেন যে, অমুক আয়াত অমুক স্থানে রাখুন।" (আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন ১/১৩৫) সূরায়ে ফাতেহার শেষ তিন আয়াতের ধারাবাহিক ও বিশুদ্ধ অনুবাদ হচ্ছে

اهــدنــا الــصــراط المستقيم "আমাদের সরল পথ দেখাও।"

صــراط الذين انعمت عليهم "সে সমস্ত লোকের পথ যাদের তুমি নেয়ামত দান করেছ।"

غيــر الــمــغــضــوب عــليهم ولا الضالين "তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে।"

এখানে الــصــــراط الــمستقيم এর দু'টি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। ক. صراط الذين انعمت عليهم খ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين-

তাই বিশুদ্ধভাবে এর অনুবাদ করতে হলে উভয় বিশেষণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ কোয়ান্টামের অনুবাদে এর কোনো তোয়াক্কা করা হয়নি।

দশ. পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব বিকৃত হওয়ার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে যে বিষয়টি তা হচ্ছে, যে ভাষায় কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার عبارت তথা মূল পাঠ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ ভাবার্থ বা সারমর্ম প্রকাশ করা। এরপর আবার সে ভাবার্থ ও সারমর্মকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এভাবে মূল কিতাব একসময় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে মনগড়া কাটছাঁটের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এ কারণে পবিত্র কুরআনের মূল আরবী আয়াত বাদ দিয়ে শুধু তার অনুবাদ প্রকাশ নাজায়েয। কোয়ান্টাম এ নীতিমালা ভঙ্গ করে কোয়ান্টাম কণিকায় সূরা ফাতেহাসহ বিভিন্ন সূরা হতে অসংখ্য আয়াতের শুধু অনুবাদ প্রকাশ করেছে। সেখানে মূল আয়াত উল্লেখ না থাকায় অনুবাদে ব্যাপক বিকৃতি সাধন সহজ হয়েছে। ভবিষ্যতে তাদের এই কুরআন কণিকা ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হলে কী ভয়াবহ বিকৃতি সাধিত হবে, তা সহজে অনুমেয়। তাওরাত ইঞ্জিলের মাঝে বিকৃতি সাধন এ পথেই করা হয়েছে। অতএব সময় থাকতে সাধু সাবধান। কোয়ান্টাম কণিকা হতে আরো কিছু আয়াতের অর্থ বিকৃতির নমুনা পেশ করা হলো।

মূল আয়াত	বিশুদ্ধ অনুবাদ	কোয়ান্টামের বিকৃত অনুবাদ
الله لا اله الا هو الحى القيوم (ال عمران ٢)	আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব সব কিছুর ধারক।	আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য (হুকুমদাতা) নেই, তিনি শাশ্বত ও চিরঞ্জীব।(আলে ইমরান-২)
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا ☆ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا☆ (الجن ٢٦-٢٧)	তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোণীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।	গায়েব ও ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র তিনিই জানেন, যদি না তিনি কাউকে জানান, যেমন তিনি রসূলদের জানিয়েছেন। (জ্বিন ২৬-২৭)
والله خير الرازقين (جمعه ١١)	আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।	আল্লাহই একমাত্র রিযিকদাতা। (জুমআ ১১)
قد افلح المؤمنون (مؤمنون/١)	মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে।	বিশ্বাসীরা অন্তরে পবিত্র। (মুমিনুন : ১)
يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة (بقره ٢٠٨)	হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পুরোপুরি সমর্পিত হও। (বাকারা ২০৮)
ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه (حجرات ١٢)	তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?	তোমরা গীবত বা পরনিন্দা করো না। গীবত করা মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার সমান অপরাধ। (হুজরাত ১২)
لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى (بقره ٢٥٦)	দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে।	ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, আলোর পথ এখন সুস্পষ্ট। (বাকারা ২৫৬)
ومن احسن قولا ممن دعاالى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين (حم ٣٣)	যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?	সে ব্যক্তিই উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং ঘোষণা করে যে, আমি আল্লাতে সমর্পিতদের একজন। (হামীম : ৩৩)
ان مع العسر يسرا ☆ فاذا فرغت فانصب☆ والى ربك فارغب (انشراح ٦-٨)	নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অতএব যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।	নিশ্চয়ই কষ্টের পরে রয়েছে স্বস্তি ও সাফল্য। অতএব নিশ্চিন্ত মনে পরিশ্রম করুন। আপনার প্রতিপালকের মহিমা স্মরণ করুন। (ইনশিরাহ ৬-৮)
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون (انبياء ٩٤)	অতপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি।	বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্মে নিয়োজিত হলে তার প্রতিটি প্রয়াস আমি লিখে রাখি এবং সে তার প্রয়াসের প্রতিদান পাবে। (আম্বিয়া : ৯৪)

কোয়ান্টাম মেথড-৫

পবিত্র হাদীস বিকৃতির অভিনব কৌশল

মুফতী শরীফুল আ'জম

পবিত্র কুরআন যেমন ঐশীবাণী পবিত্র হাদীসও তেমনি ঐশী বাণীর একটি প্রকার। তফাত শুধু এটুকু যে, কুরআনের শব্দ ও মর্ম উভয়টি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ আর হাদীসের মর্ম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আর শব্দসমূহ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জবান থেকে নিঃসৃত। তাই কুরআনের মাঝে বিকৃতি সাধন যেমন জঘণ্য, হাদীসের বেলায়ও বিকৃতি বা বানোয়াটের আশ্রয় নেয়া হলে তার পরিণতি খুব ভয়াবহ। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (مشكوة ٢٣) "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন নিজের অবস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" (মেশকাত ২৩)

সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে যুগে যুগে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বদা এই ভীতিই কাজ করত। ফলে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা যারপরনাই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) পাঁচ শত হাদীসের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁকে সারা রাত বিছানায় ছটফট করতে দেখলেন। সকাল বেলা তিনি বললেন যে, হাদীসের যে পাণ্ডুলিপিটি তোমার কাছে রেখেছিলাম তা নিয়ে আসো। পিতার কথা মতো পাণ্ডুলিপি সামনে উপস্থিত করলে তিনি সেটিকে পুড়িয়ে ফেললেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হাদীসগুলো পুড়িয়ে ফেলার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমার ভয় হয় যে, আমার মৃত্যুর পর এ পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছে রয়ে যাবে। যাতে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে শোনা বর্ণনা ও স্থান পেয়েছে। যেগুলোকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করেছিলাম, অথচ বাস্তবে হয়ত তা গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে সেখানে কোনো ধরনের গড়বড় রয়েছে। যার দায়দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে। কাজেই এই গোনাহের ভাগিদার হওয়ার ভয়ে তা জ্বালিয়ে ফেললাম। ....

হযরত আলী (রা.) বলেন, اذا حدثتكم عن رسول الله ﷺ حديثا فوالله لان اخر من السماء احب الى من ان اكذب عليه "আল্লাহর কসম আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সূত্রে কোনো হাদীস তোমাদের কাছে বর্ণনা করি তখন তার ওপর মিথ্যারোপ করার চেয়ে আসমান থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ আমার কাছে প্রিয় মনে হয়।" (বুখারী ২/১০২৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যিনি নবীজি (সা.)-এর বিশিষ্ট খাদেম ছিলেন এবং ঐ সকল সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ফতাওয়া প্রদান করতেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর সতর্কতা ছিল উল্লেখযোগ্য। হযরত আমর ইবনে মাইমুন (রা.) বলেন, আমি এক বছর পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার রাতে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মজলিসে হাজির হতাম। আমি কখনো তাকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি নিসবত করে কথা বলতে শুনিনি। একদা হাদীস বলতে গিয়ে তাঁর যবান থেকে "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন" এ বাক্য বেরিয়ে আসার সাথে সাথে তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যায়। নয়ন অশ্রুশিক্ত হয়ে ওঠে। কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যায় এবং রগগুলো ফুলে যায় আর সাথে সাথে তিনি বলে ওঠেন ইনশাআল্লাহ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনই ইরশাদ করেছেন, বা এর কাছাকাছি বা কিছু কম বেশি হতে পারে। (মুসনাদে আহমদ) এই হলো হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সতর্কতার নমুনা।

হাদীসের প্রতিটি শব্দ কী ধরনের সতর্কতার সাথে হেফাজত করা হয়েছে তার প্রমাণ হাদীস গ্রন্থের পাতায় পাতায় বিদ্যমান। বিশুদ্ধ রূপে হাদীস ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করার জন্য উম্মতের বিশাল এক কাফেলা নিজেদের জীবনের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র একটি হাদীসের জন্য শতশত মাইল পথ পাড়ি দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাঁরা। সব কষ্ট ক্লেশ বরদাশত করেছেন কিন্তু হাদীসের মাঝে একটি শব্দ পরিবর্তনকে মেনে নেননি। বরং সতর্কতা অবলম্বনের বিরল দৃষ্টান্ত কায়েম করে দেখিয়েছেন। এখানে উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীস তুলে ধরা হলো।

عن ابن عمرؓ قال قال رسول الله ﷺ ان الله لا يجمع امتى او قال امة محمد على ضلالة ---(مشكوة : ٣٠)

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতকে অথবা বলেছেন উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে ভ্রষ্টতার ওপর একমত করবেন না...।" (মিশকাত পৃষ্ঠা ৩০) এখানে বর্ণনাকারীর সতর্কতা লক্ষণীয়। যদিও "আমার উম্মত" আর

"উম্মতে মুহাম্মদিয়া" একই কথা কিন্তু রাসূলের শব্দ কোনটি তা নিশ্চিত না হওয়ায় সতর্কতামূলক উভয়টি উল্লেখ করেছেন।

এটা ইসলামের একটি গৌরব যে, দেড় হাজার বছর পার হওয়া সত্ত্বেও নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীসমূহ হুবহু শব্দে শব্দে সংরক্ষিত হয়ে আছে। যেখানে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু কি তাই? হাদীসের বর্ণনাকারীদের জীবনী পর্যন্ত সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। এবং তাদের সভাব চরিত্র ও গ্রহণযোগ্যতাসহ যাবতীয় তথ্য এমনভাবে সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, এর ওপর বিশাল কিতাব ভাণ্ডার রচিত হয়েছে। সব মিলিয়ে এমন দৃঢ় ও মজবুত অবস্থান তৈরি হয়েছে যে, শত চেষ্টা করেও কেউ হাদীসের মাঝে কোনো রদবদল, শব্দ পরিবর্তন বা অর্থ পরিবর্তনে সক্ষম হয়নি এবং হবে না। যা বর্তমান যুগে ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম হওয়ার একটি অলৌকিক প্রমাণ।

নব্বই ভাগ মুসলমানের এই সোনার বাংলাদেশে সর্বস্তরের মানুষের মাঝেই রয়েছে ইসলামের প্রতি গভীর আকর্ষণ, মহব্বত ও ভালোবাসা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রতি রয়েছে তাদের বিপুল ভক্তি-শ্রদ্ধা। কুরআন-হাদীসের ভাষা আরবী ভাষায় লেখা কোনো কাগজ ও কেউ অজু ছাড়া স্পর্শ করতে চায় না। কুরআন-হাদীসের কথা শোনালে যে কারো মন না গলে পারে না। কুরআন-হাদীসের প্রতি মুসলমানদের এই মহব্বত ও দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে এ দেশে কালের আবর্তনের সাথে সাথে বহু বাতেল ফেরকা সমাজে তাদের অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কুরআন-হাদীসের প্রলেপ লাগিয়ে সব ধরনের তেতো সফলভাবে এ দেশের সরলমনা ইসলামপ্রিয় জনগণকে গলাধঃকরণ করাতে পেরেছে। অতএব, ইতিহাস স্বাক্ষী ইসলামের দুশমনেরা সর্বযুগে কুরআন-হাদীসকে গলায় বেঁধেই মুসলমানদের গোমরাহ করার পথ নিষ্কণ্টক করেছে।

কোয়ান্টামের মেধাবী কর্ণধারগণ এ দেশের মুসলমানদের ধর্মীয় মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চয়ই ওয়াকিফহাল রয়েছেন। মানুষের ব্রেন ও মাইন্ড নিয়ে তাদের গবেষণা একটু বেশিই বলা চলে। তাই এ সুযোগকে তারা হাতছাড়া করবেনই বা কেন? কুরআন কণিকা ও হাদীস কণিকা নামে পুস্তিকা রচনা করে কোয়ান্টাম ধর্মপ্রাণ জনগণকে নতুন একটি মতাদর্শের দিকে আকৃষ্ট করছে। কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী প্রচারের নামে এর মূল শিক্ষাকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে ঘষামাজা করে কিছু আয়াত ও হাদীসের অনুবাদ পেশ করা হয়েছে। ইসলামকে সকল ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল রূপে তুলে ধরা হয়েছে। সকল ধর্মই যেন ইসলামে স্বীকৃত এমন একটি মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চিন্তাধারাটি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন শব্দের অর্থ পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে তাদের একটুও হাত কাপেনি। উল্টো বীরত্বের সাথে এগুলো বাধাহীনভাবে প্রচার করে যাচ্ছে তারা। বিশেষ করে شهادت শাহাদাত, علم ইলম, مسلم মুসলিম, مومن মুমিন, دين দ্বীন, احسان ইহসান ইত্যাদি শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাকে পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্মকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। আবার কোনো কোনো হাদীসকে আংশিকভাবে উল্লেখ করেছে। কখনো এমন ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হাদীস এনেছে, যার ব্যাখ্যা ছাড়া মর্ম অনুধাবন অসম্ভব। যুগ যুগ ধরে বিশুদ্ধ রূপে সংরক্ষিত হাদীস ভাণ্ডার যেন তাদের কাছে ছেলেখেলা। হাদীস বিকৃতির ব্যাপারে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধমক তাদের অন্তরে সামান্য রেখাপাত করেছে বলেও মনে হয় না। আসুন এবার দেখা যাক কী তেতো মেশানো হয়েছে কোয়ান্টাম কণিকায়। এ পর্যায়ে হাদীস কণিকা অধ্যায় থেকে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হবে। প্রথমে ওই সকল হাদীসের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা উল্লেখ করে কোয়ান্টামের বিকৃত মর্মবাণী তুলে ধরা হবে।

এক.

عن ابن عمر رضـ قال قال رسول الله ﷺ بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (متفق عليه)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল..."

উক্ত হাদীসের মাঝে ইসলামের পঞ্চভিত্তির প্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান। আর কারো ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি মুখের সাথে সম্পর্ক রাখে অন্তরের সাথে নয়। মুসলমান হতে হলে এ ব্যাপারে অন্তরের বিশ্বাসের পাশাপাশি মুখেও স্বীকার করতে হবে এবং সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। যদি অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস থাকে আর মুখে এর সাক্ষ্য প্রদান করা না হয় তবে

সে দুনিয়াতে মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। বরং এ ধরনের বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীসে এসেছে–

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল" মানুষেরা এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের আগ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম) অতএব মুসলমান হতে হলে এ কথার মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান আবশ্যক। শুধু অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

এবার দেখা যাক কোয়ান্টামের ছলচাতুরীর কয়েকটি নমুনা।

এক. কোয়ান্টাম কণিকায় উক্ত হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। "ইসলামের মূল ভিত্তি ৫টি। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল বলে বিশ্বাস করা....।" (কোয়ান্টাম কণিকা পৃষ্ঠা ৩১৫)

এখানে হাদীসের শব্দ شهادة এর অর্থ সাক্ষ্য প্রদান এর স্থলে 'বিশ্বাস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস বিকৃতির এটি একটি জঘণ্যতম দৃষ্টান্ত। বিষয়টি ইসলামের মূল ভিত্তি-সংক্রান্ত হওয়ায় এর গভীরতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কোয়ান্টামের অনুবাদ অনুযায়ী আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান ছাড়াও মুসলমান হতে পারে। ইসলামের ভিত রচিত হতে পারে বিধায় অন্তরের বিশ্বাস ঠিক রেখে সকল ধর্মের লোককে খুশি রাখার জন্য শাহাদাতকে গোপন রেখে সকলের সাথে তাল মেলানোর পথ সুগম হয়ে গেল। অথচ সাক্ষ্য প্রদান আর বিশ্বাস স্থাপন এ দুটি কখনোই সমার্থবোধক হতে পারে না।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর প্রাণপ্রিয় চাচাজান আবু তালিবের নবীজির ওপর আন্তরিক বিশ্বাসের কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু শুধু মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানে অপারগ হওয়ায় তিনি ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারেননি। এ সাক্ষ্য আদায়ের জন্য মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। এর মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব সহজে অনুধাবন করা যায়। তাই কোয়ান্টামের মর্মবাণী নামে এই অনুবাদ হাদীসের মর্মার্থ বিকৃতির একটি অপকৌশল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুই.

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

طلب العلم فريضة على كل مسلم

"দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।"(মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৪)

এখানে দ্বীনি ইলম শিক্ষাকে ফরজ বা বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থিব জ্ঞান অর্জন ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, তবে তা প্রত্যেকের জন্য ফরজ করা হয়নি। দুনিয়াবী শিক্ষা যে যতটুকু লাভ করুক বা না করুক তবে দ্বীনি ইলম অবশ্যই প্রত্যেক মুসলমানকে প্রয়োজন পরিমাণ শিখতে হবে। এই ইলমের মাঝে ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস, নামায ও রোযা ইত্যাদি ইবাদত বন্দেগী সংক্রান্ত ইলম অন্তর্ভুক্ত।

কোয়ান্টাম কণিকায় এই হাদীসকে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে– "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক বিশ্বাসী নর-নারীর জন্য ফরজ।" (কোয়ান্টাম কণিকা-পৃষ্ঠা ৩১৮)

হাদীসে উল্লেখিত (علم) ইলম শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'জ্ঞান'। অথচ ইলম ও জ্ঞানের অর্থের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। (মাসিক আল-আবরারের জুলাই ২০১২ সংখ্যায় এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে তা দেখা যেতে পারে।)

এই হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনি ইলম শিক্ষাকে ফরজ তথা বাধ্যতামূলক করা। পক্ষান্তরে কোয়ান্টামের অনুবাদ দ্বারা সর্বপ্রকার পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা হাদীসের মাঝে বিকৃতি সাধনের একটি রূপ।

দ্বিতীয়ত : হাদীসে বলা হয়েছে (على كل مسلم) "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ"। এখানে বিশ্বাসী বা নর-নারী অনুবাদ করার মাঝে কোয়ান্টামের মতলব কী? বিশ্বাস বা বিশ্বাসী শব্দের যে অর্থ কোয়ান্টামের নিজস্ব পরিভাষায় ব্যবহার হয়ে থাকে তাতে মুমিন -মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যে কোনো ধর্মের লোকই এই বিশেষ অর্থে বিশ্বাসী বলে পরিচিত হতে পারে। বিশ্বাস বলতে তারা 'মুক্ত বিশ্বাস'কে বোঝায়। "আমি পারি আমি পারব" এ কথাটিই মূলত কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাসের বক্তব্য বা শিক্ষা। এমন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা মুসলিম যে কেউ হতে পারে। মুক্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত বিশ্বাস শিরোনামে ইতিপূর্বে মাসিক আল-আবরারে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। প্রয়োজনে তা দেখা যেতে পারে।

কোয়ান্টামের এই বিকৃত অনুবাদে হাদীসে বর্ণিত মুসলিম শব্দের আর কোনো বৈশিষ্ট্য বাকি থাকেনি। বরং মুসলিম ও অমুসলিমের ভেদাভেদটিই

দূর হয়ে গেছে। আসলে কোয়ান্টামের মূল টার্গেটও তাই। ইসলামকে অন্য ধর্মের সাথে গুলিয়ে ফেলাই মনে হচ্ছে তাদের একমাত্র লক্ষ্য। অথচ ইসলামকে অন্যসব ধর্মের ওপর বিজিত করতে আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে প্রেরণ করেছেন বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

"তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের ওপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরা সাফ- আয়াত ৯)

তাই সকল ধর্মের লোককে খুশি করতেই কোয়ান্টাম হাদীসে বর্ণিত মুসলিম শব্দের অর্থ মুসলমান না করে বিশ্বাসী করেছে কি না তা ভেবে দেখা দরকার।

তিন.

عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ﷺ تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك- (متفق عليه)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "কোনো রমণীকে চার কারণে বিবাহ করা হয়ে থাকে। মাল, বংশ, রূপ ও দ্বীন। অতএব দ্বীনের বিষয়টি প্রাধান্য দাও, তুমি সফলকাম হবে।" (বুখারী মুসলিম)

উক্ত হাদীসে দ্বীনদার মেয়েকে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। দ্বীনদারী বলতে ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম পালন করাকে বোঝায়। আর নারীদের বেলায় বিশেষ করে শরয়ী পর্দা পালনের বিষয়টি সর্বাগ্রে আলোচনায় আসে। তাই দ্বীনদার রমণী বলতে পর্দানশীন, মুমিন, মুত্তাকি রমণী উদ্দেশ্য।

এবার আসা যাক কোয়ান্টাম কণিকায়। উক্ত হাদীসটিকে সেখানে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– "কোনো নারীকে চারটি যোগ্যতার জন্য বিয়ে করা যায়। ১. সম্পদ ২. বংশমর্যাদা ৩. রূপ ৪. গুণ। এমন নারী খোঁজ করো, যার গুণ আছে। অন্য বিবেচনায় বিয়ে করলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (কোয়ান্টাম কণিকা পৃষ্ঠা ৩১৮) হাদীসে উল্লেখিত (دين) দ্বীন শব্দের অনুবাদ কৌশলগত কারণে পরিবর্তন করে 'গুণ' বলা হয়েছে। নারীর গুণ বলতে কী বোঝায়? বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষী, মিশুক, সদাচারী ও সংসারী ইত্যাদি বিভিন্ন মানবীয় গুণ, যা প্রত্যেকের যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু এ সকল গুণের জন্য মুসলমান হওয়া বা পর্দানশীন হওয়া জরুরি নয়। একজন অমুসলিম রমণীও এ সকল গুণের অধিকারীনী হতে পারেন। কোয়ান্টামের অনুবাদ অনুযায়ী মুসলিম/অমুসলিম নারীকে বিবাহ করার মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই, শুধু গুণবতী হলেই চলবে। অথচ উক্ত হাদীসের মূল শিক্ষাই হলো বিবাহের ক্ষেত্রে মুমিন, মুত্তাকি ও দ্বীনদার রমণীকে প্রাধান্য দেওয়া। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা دين দ্বীন শব্দের অর্থ বিকৃতির মাধ্যমে কোয়ান্টাম ইসলামের একটি মৌলিক বিধানকেই শিথিল করে দিয়েছে। সকল ধর্মকে সমন্বয়ের বিকৃত মানসিকতা চরিতার্থ করতেই তারা এমন অপব্যাখ্যা দিয়ে চলছে। আবার হাদীসের মর্মার্থ পরিবর্তনের নাম দিয়েছে মর্মবাণী, যা চরম হাস্যকরও বটে।

চার.

প্রসিদ্ধ হাদীসে জিব্রাঈলের শেষ অংশে احسان ইহসানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك "এমনভাবে তুমি আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে নাও পাও তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন.....।" (বুখারী)

এখানে সদাসর্বদা সকল ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহকে হাজির-নাজির মনে করার কথা বলা হয়েছে। (মিরকাত ১/১২০)

অন্তরের মাঝে এমন অবস্থা ও ভাব সৃষ্টি হওয়াই প্রকৃত 'ইহসান'। যা বিশেষ কোনো ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

কোয়ান্টাম কণিকায় এই হাদীসের অনুবাদ পরিবর্তন করে বলা হয়েছে "এমনভাবে নামায পড়ো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো...।" (কোয়ান্টাম কণিকা ৩১৫)

অথচ হাদীসটিতে নামায শব্দের কোনো উল্লেখ নেই। বরং হাদীসটি ব্যাপক, প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একে নামায, রোযা বা অন্য কোনো বিশেষ ইবাদতের সাথে নির্দিষ্ট করা ভুল।

পাঁচ.

মহিলাদের মসজিদে গমনের বিষয়টি নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুগে কিছুটা শিথিল ছিল। সে সময় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নতুন নতুন বিধিবিধান জারি হতো, যা মসজিদে বসে তা'লীম দেওয়া হতো। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই মজলিসে মহিলা সাহাবীগণও আগ্রহের সাথে শরীক থাকতেন। এ হিসেবে মহিলাদের মসজিদে নববীতে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও বারবার তাদেরকে নিজ গৃহে নামায আদায়ের তাকিদ দেওয়া হতো। শুধু তা-ই নয়, নিজ গৃহের নামায মসজিদে নববীতে

হাজির হয়ে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইমামতিতে নামায আদায় অপেক্ষা শ্রেয় ও সওয়াবের কাজ বলেও ঘোষণা করা হতো। অসংখ্য হাদীস যার প্রমাণ বহন করে। উল্লেখ থাকে যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মদীনা শরীফে একাধিক মসজিদ থাকা সত্ত্বেও মহিলারা উল্লিখিত বিশেষ কারণে শুধু মসজিদে নববীতে যাওয়ারই প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য কোনো মসজিদে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মহিলাদের মসজিদে গমন-সংক্রান্ত হাদীসসমূহকে প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ আবু দাউদ শরীফে দুটি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ১. باب ماجاء فى خروج النساء الى المسجد মহিলাদের মসজিদে গমন বৈধ কি না? ২. باب التشديد فى ذلك মহিলাদের মসজিদে গমনে কঠোরতা। (বযলুল মজহুদ ৪/১৬৪) এই দুই অধ্যায়ের প্রতি লক্ষ্য করলে মনে হয় যেন প্রথমটিতে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে দ্বিতীয় অধ্যায়টি লেখা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, لا تمنعوا اماء الله مساجد الله "আল্লাহর বান্দিগণকে আল্লাহর মসজিদসমূহে আসতে নিষেধ করো না।" সেই একই সূত্রে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে لاتمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن "তোমাদের মহিলাগণকে মসজিদে যেতে বারণ করো না। তবে তাদের ঘর তাদের জন্য শ্রেয়।" অর্থাৎ তাদের নিজ গৃহে নামায আদায় মসজিদে নামায আদায় অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু তাতে পর্দার পূর্ণতা রয়েছে। উক্ত হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এখানে প্রথম বাক্যে মহিলাদের মসজিদে গমনে বাধা দিতে পুরুষদের নিষেধ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে ঘরে নামায আদায় করতে মহিলাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এটা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর আদর্শ শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি উদাহরণ। যাতে মহিলাদের স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদও না হয় আবার মহিলাদের মসজিদে গমনও যেন বন্ধ হয়। দুই পক্ষকে দুই ধরনের নির্দেশ প্রদানের নজির আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। হাদীস ভাণ্ডারে নজর দিলে যার সন্ধান মেলে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) মহিলাদের মসজিদ গমনে কঠোরতা-সংক্রান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, "যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদের এ সকল কর্মকাণ্ড দেখতেন তাহলে অবশ্যই তাদের মসজিদে গমণ করতে নিষেধ করতেন। যেভাবে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছিল।" এর পরের হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, মহিলাদের জন্য বারান্দায় নামায আদায় করার চেয়ে ঘরের ভেতর নামায আদায় করা উত্তম। আর ঘরের চেয়ে অন্দরমহলের ছোট্ট কুঠুরিতে নামায আদায় করা উত্তম। (আবু দাউদ)

উভয় ধরনের হাদীস দ্বারা যে শিক্ষা উম্মতকে দেওয়া হয়েছে তার সারকথা আবু দাউদ শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ বজলুল মজহুদে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। والفتوى اليوم على الكراهة فى الصلوات كلها لظهور الفساد "ফেতনা-ফাসাদের সয়লাবের কারণে সকল নামাযে মহিলাদের মসজিদে গমন মাকরূহ তথা নিষেধ।" (বজলুল মজহুদ ৪/১৬৫)

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) কর্তৃক এভাবে দুই ধরনের অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন করে মহিলাদের মসজিদে গমন-সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে কোয়ান্টাম কণিকায় শুধুমাত্র আবু দাউদ শরীফের প্রথম অধ্যায়ের ইবনে উমর (রা.)-এর প্রথম হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে। "তোমরা মহিলাদের মসজিদে যেতে বাধা দিও না।" (কোয়ান্টাম কণিকা পৃষ্ঠা ৩২০)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটিকে বর্জন করা হয়েছে, যাতে উল্লেখ আছে যে, وبيوتهن خير لهن "তবে তাদের ঘর তাদের জন্য শ্রেয়।" আর আবু দাউদ শরীফের দ্বিতীয় অধ্যায়ের হাদীসের প্রতিতো ভ্রুক্ষেপই করা হয়নি। যার ভিত্তিতে মহিলাদের মসজিদে গমন নিষেধ করা হয়। এভাবে একটি বিষয়ের শুধু অংশ বিশেষ উল্লেখ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর মহিলাদের ঘর থেকে বের করার পথ মসৃণ করা হয়েছে। কোয়ান্টাম এভাবে মহিলাদের ঘর থেকে বের করে তাদের বিভিন্ন কোর্সে নিয়ে যাচ্ছে, মঞ্চে উপস্থিত করছে এবং দূর-দুরান্তের মহিলাদেরকে বান্দরবানের লামায় জমায়েত করে চলেছে।

হাদীসের এমন অপব্যাখ্যা করে, শরীয়তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর পরিভাষা পরিবর্তন করে, ইসলামকে এক নতুন লেবাসে উপস্থাপন করার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হাশরের ময়দানে দ্বীনের মাঝে এমন বিকৃতিকারীদেরকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুহকান, সুহকান তথা দূর হও, দূর হও বলে তাড়িয়ে দেবেন। আর তারা কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে। অতএব এই পথে হেঁটে সফলতার চাবিকাঠি আদৌ কোয়ান্টিয়ার ভাইদের হস্তগত হবে কি না ভেবে দেখা উচিত।

কোয়ান্টাম মেথড-৬

বেদ-বাইবেলের প্রচার ?

মুফতী শরীফুল আ'জম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত সকল নবী রাসূল ও সকল আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করা ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিশ্বাসের অন্যতম। নিজ নিজ যামানায় তাঁরা সকলেই অনুসরণীয় ছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরা যে সকল বিধিবিধান প্রচার করেছেন, তা পালন ওই যুগে আবশ্যক ছিল। সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন এসে পূর্বের সকল কিতাবসমূহকে রহিত করে দিয়েছে। সর্ব শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ হয় এই কুরআনুল কারীম। কেয়ামত অবদি তাঁর শরীয়ত পালন গোটা মানব জাতির সুখ-শান্তি ও সফলতার জন্য আবশ্যক। প্রতিটি নবজাতক তাঁরই উম্মত ও কুরআনের অনুসারী হিসেবে ভূমিষ্ট হয়। যদিও মাতা পিতা পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খল ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে সে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান বা ইহুদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

একজন মুসলমান পূর্বের সকল নবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থসমূহের স্বীকৃতি প্রদানকে নিজের ঈমানের অংশ মনে করে থাকে। মুসলমানদের এই ধর্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে কুরআন পাকের এই নির্দেশনা। "তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে তৎসমুদয়ের প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। (সূরা আল-বাকারা- ১৩৬)

পক্ষান্তরে ইহুদী-খ্রীস্টানগণ নিজেদের ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করতে চায় না। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) ও সর্বশেষ ঐশী কিতাব পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে চায় না। যা তাদের হঠকারীতা ও হীনমন্যতার পরিচায়ক।

অথচ শেষ নবীর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদী-খ্রীস্টানগণ অধির আগ্রহের সাথে তাঁর পথপানে তাকিয়ে ছিল। শেষ নবীর আগমণ সংক্রান্ত তাওরাত- ইঞ্জীলের ভাবিষ্যদ্বাণী পড়েই মূলত তাদের মধ্যে এই ব্যকুলতা সৃষ্টি হয়েছিল। ইহুদীরা কাফের পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে এই প্রার্থনা করতো "হে আল্লাহ শেষ জামানার নবী ও তার উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হবে তার উসিলায় কাফেরদের উপর আমাদের বিজিত করো।" আর যখন শেষ জামানার নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) এর আগমণ ঘটল এবং তারা সকল লক্ষণ দেখে তাঁকে চিনতে পারল তখন শুধু মাত্র স্বগোত্রীয় না হওয়ায় তাদের মনপূত হলো না এবং অস্বীকার করে বসল। ফলে তারা অভিশপ্ত হলো।

পবিত্র কুরআনে তাদের এমন অপেক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

"এবং যখন তাদের নিকট আল্লাহর তরফ হতে তাদের ধর্মগ্রন্থ (তাওরাত) এর সমর্থনকারী কিতাব (কুরআন) পৌছল অথচ ইতঃপূর্বে তারা কাফেরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করত। কিন্তু যখন তাদের চেনা জানা বস্তু অর্থাৎ কুরআন তাদের নিকট পৌছল তখন তা অমান্য করে বসল। সুতরাং অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।" (সূরা আল-বাকারা ৮৯)

তারা শুধু ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং সত্য ধর্ম ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদীলবি ও খ্রীস্টান মিশনারী বিভিন্ন ছলে-বলে, কলাকৌশলে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজের এলিট শ্রেণী থেকে একেবারে মঙ্গাপীড়িত মানুষ পর্যন্ত তাদের টার্গেটে পরিণত হচ্ছে। মুসলমানদের খ্রীস্টান ধর্মে দিক্ষিত করাই যেন তাদের কাছে মহা পূণ্যের কাজ। পবিত্র কুরআনে তাদের এই মনোভাবকে এভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে-

"ইহুদী ও খ্রীস্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।" (সূরা আল-বাকারা ১২০)

তাদের এই অপকর্মে নতুন সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড। খ্রীস্টান মিশনারীদের যে কাজ করতে অনেক বেগ পেতে হতো, কোয়ান্টাম তা অনায়াশেই করে যাচ্ছে। মুসলমানদের হাতে হাতে বাইবেলের বাণী পৌঁছানো সহজ হয়েছে কোয়ান্টামের আশির্বাদে। কোয়ান্টাম

কনিকা গ্রন্থের ২৮৫-২৯২পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে বাইবেলের মর্মবাণী। কোয়ান্টামের দাবী হলো তাদের কর্মকাণ্ডে ইসলাম বিরোধী কোনো বিষয় নেই। অথচ খোদ বাইবেলের প্রচার একটি ইসলাম বিরোধী কাজ। ইসলামের দৃষ্টিতে বাইবেল চর্চা এর প্রচার প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তাওরাত ইঞ্জিল প্রকৃত পক্ষে বর্তমানের এই বাইবেল নয়। এ মহাসত্যকে অনুধাবনের জন্য ইতিহাস ও কুরআন হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

☆ বাইবেল (Bible) শব্দটি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষা হতে নেওয়া হয়েছে। যা মূলত গ্রীক ভাষা থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ গ্রন্থসমূহের সংকলন। ল্যাটিন ভাষার শব্দটি একবচন স্ত্রী লিঙ্গ। এভাবে শব্দটি ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে গ্রীকভাষা হতে ইংরেজী ভাষায় প্রবেশ করেছে। এটা ঐশী বাণী সমূহের সংকলন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৩ আগস্ট ১৯৮৭)

বাইবেলের গ্রন্থসমূহ প্রথমত: দুভাগে বিভক্ত। (ক) ওই সমস্ত গ্রন্থ যা খ্রীস্টানদের মতে হযরত ঈসা আ. এর পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তাদের কাছে এসেছে। (খ) ওই সমস্ত গ্রন্থ যা হযরত ঈসা (আ.) এর পর এলহাম তথা ঐশী অনুপ্রেরণার মাধ্যমে লেখা হয়েছে। প্রথম প্রকারকে পুরাতন নিয়ম (old testament) বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারকে নব বিধান (New testament) বলা হয়। উভয়ের সমন্বয় হচেছ বাইবেল। old testament পুরতান নিয়মের মাঝে ৪৭টি গ্রন্থ রয়েছে। যার প্রথম পাঁচটির সমষ্টির (পঞ্চগ্রন্থ) নাম হচেছ 'তাওরাত'। New testament নব বিধানের মাঝে স্থান পেয়েছে ২৭টি গ্রন্থ। তন্মধ্যে প্রধান চারটি গ্রন্থ হযরত ঈসা আ. এর চার জন শিষ্য মথি, মার্ক, লুক ও যোহন কর্তৃক রচিত। এই চারটি গ্রন্থকে ইঞ্জিল চতুষ্টয় বলা হয়। খ্রীস্টানদের নিকট ইঞ্জিল শব্দটি এই গ্রন্থ চারটিতে সীমাবদ্ধ। আবার কখনও রূপক অর্থে নিউ টেস্টামেন্টের সকল গ্রন্থকে ইঞ্জিল বলা হয়। (বাইবেল সে কুরআন তক ১/৩০৫-৩১৮)

হযরত ঈসা আ. এবং তাঁর সহচরদের বাইবেল ছিল আদী পুস্তক ওল্ড টেস্টামেন্ট। যতদূর জানা যায় হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর সহচরগণ তাদের জীবদ্দশায় আদী পুস্তককে নিজেদের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। এ জন্য হযরত ঈসা আ. এর পর ২০ বছর পর্যন্ত কেউ নতুন গ্রন্থ সংকলনের প্রয়োজন অনুভব করেননি। (ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৩)

তাওরাত ও ইঞ্জিলের মাঝে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাওরাতের সম্পূরক হিসেবে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

"স্মরণ কর যখন মরিয়ম তনয় ঈসা আ. বলল হে বনি ইসরাঈল আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী।" (সূরা আসসাফ ৬)

এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা আ. এর শরীয়ত যদিও স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু তার অধিকাংশ বিধিবিধান মূসা আ. এর শরীয়ত ও তাওরাতের অনুরূপ। স্বল্প সংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র। (মা'আরেফুল কুরআন)

তাওরাতের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন :

তাওরাত ও ইহুদীদের অন্যান্য পবিত্র পদার্থসমূহ বাইতুল মুকাদ্দাসে রক্ষিত ছিল। খ্রীস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে বাবেলিয়ান রাজ বুখতে নসর কর্তৃক ইহুদী রাজ্য আক্রমণ হওয়ার ফলে তাওরাত ইত্যাদিসহ বাইতুল মুকাদ্দাস অগ্নিতে ভস্মীভূত হয় এবং সমস্ত ইহুদী নরনারী নিহত ও বন্দি হয়। এই ধ্বংসলীলার ফলে তাওরাত ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর খ্রীস্টপূর্ব ৫৩২ অব্দে পারস্য রাজের সাহায্যে বাইতুল মুকাদ্দাস পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে ইসরা আজরা নামক এক ব্যক্তি কতগুলো কাগজ পত্র ইহুদীদের সামনে হাজির করে বলে এগুলোই হযরত মূসা আ. এর তাওরাত। এভাবে প্রথম পঞ্চগ্রন্থ সংকলিত হয়। নাহিমিয়া নামক এক ব্যক্তি আরোকতগুলো পুস্তক সংকলন করে তার সাথে সংযোজন করে দেয়।

খ্রীস্টপূর্ব ১৬৮ অব্দে ইন্তাকিয়ার রাজ এন্টিনিউস পূনরায় ইহুদীদের পরাভূত করে তাদের সকল ধর্মগ্রন্থগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলে এবং কঠোর আদেশ জারি করে যে, ইহুদী ধর্মগ্রন্থ কেউ মুখে মুখেও পাঠ করতে পারবে না। এর বহুদিন পর মাকাবী নামক দেশহিতৈষী এক ব্যক্তি এন্টিনিউসকে পরাজিত করে কতগুলো পুস্তিকা ইহুদীগণের সামনে উপস্থিত করে বলে এগুলোই ইসরা ও নাহিমিয়ার তাওরাত। সাথে আরো কিছু অংশ যোগ করে দেয়। ৭০ খ্রীস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর রোমান রাজ টাইটিউস জেরুজালেম অধিকার করে বাইতুল মুকাদ্দাস ধবংস করে ফেলে এবং বিজয় চিহ্ন স্বরূপ ইহুদীদের সকল ধর্মগ্রন্থ রোমীয় রাজধানীতে নিয়ে যায়। এভাবে ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থগুলো পুন: পুন: বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হওয়ার ফলে সে যুগের ইহুদী পণ্ডিতগণ নিজেদের খেয়াল ও আবশ্যকতা অনুযায়ী পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে সেগুলোকে ধর্মগ্রন্থ বলে প্রচার করতে থাকে। আর প্রকৃত তাওরাত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বাইবেলের প্রথম অংশ ওল্ড টেস্টামেন্ট এ স্থান পাওয়া তাওরাতের এটাই প্রকৃত অবস্থা।

ইঞ্জীলের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন :

নিউ টেস্টামেন্ট বা ইঞ্জীলের অবস্থা এর চেয়ে আরো শোচনীয়। সদুদ্দেশ্যে যত ইচ্ছা ধর্মশাস্ত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা খ্রীস্টানদের মতে বৈধ। খ্রীস্টান ধর্মের নেতা বিশব ইসোবিয়স বলেন "যাহা কিছু দ্বারা আমার ধর্মের গৌরব বাড়িতে পারে আমি তাহা সবই বাইবেলে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছি। আর যাহা দ্বারা আমার ধর্মের ক্ষতি হইতে পারে আমি সেসকল গোপন করিয়া ফেলিয়াছি।" তার একথা দ্বারা সহজে অনুমান করা যায় যে, বাইবেলে কি পরিমাণ রদবদল করা হয়েছে।

খ্রীস্টীয় প্রথম যুগে ইঞ্জিলের সংখ্যা ছিল ৩৬টি এবং পত্র ছিল ১১৩টি। ৩২৫ খ্রীস্টাব্দে রোম সম্রাট কনস্টানটাইন কর্তৃক আহূত ঐতিহাসিক নিসিও বা নিকিও কাউন্সিলে খ্রীস্টান পুরোহিতগণ বাইবেলের মধ্য হতে যাচাই বাছাই করে সন্দেহজনক পুস্তিকাসমূহ চিহ্নিত করেন। এবং সেগুলোকে বাইবেল থেকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা দেন। এই পরিত্যক্ত অংশকে ইংরেজী ভাষায় Apocryphal অর্থাৎ অপ্রামাণ্য অংশ হিসেবে অবিহিত করা হয়। উক্ত সভায় যে সকল ধর্ম বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হয়েছিল সেগুলো ভোটাধিক্য দ্বারা মিমাংশিত হয়েছিল। ঐশীগ্রন্থের যাচাই ভোটের মাধ্যমে করাটা কতবড় বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ হতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

৩৬৪ খ্রীস্টাব্দে এজাতীয় আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যা 'লোডেশিয়া' কাউন্সিল নামে প্রসিদ্ধ। এবার খ্রীস্টান পুরোহিতগণের সিদ্ধান্ত মতে পূর্বের বাইবেলের সাথে আরো ৭খানা পুস্তিকা সংযোগ করে দেওয়া হয়। তাদের যাচাই বাছাইয়ে এসকল পুস্তিকা ঐশীগ্রন্থ হিসেবে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। তবে মজার ব্যাপার হলো বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ Revelation যা মূলত কিছু ভবিষ্যতবাণীর সমষ্টি, দ্বিতীয়বারের বাছাইতেও সন্দেহজনক ও অপ্রামাণ্য হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় বাদ পড়ে যায়।

৩৯৭ খ্রীস্টাব্দে এর চেয়ে আরো বড় ধরনের একটি কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। যা 'কর্থিজ' কাউন্সিল নামে প্রসিদ্ধ। এতে খ্রীস্টজগতের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা অগেস্টাইনসহ ১২৬জন খ্রীস্টান পুরোহিত অংশগ্রহণ করেন। এতে পূর্বের বাইবেলের সাথে আরো ৭টি পুস্তিকা যোগ করা হয়। বাইবেলের মাঝে এসকল রদবদল যেহেতু ইসলাম আগমনের বহু পূর্ব থেকেই হতে থাকে তাই নবীজী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে যে বাইবেল ছিল তাও বিকৃত ও পরিবর্তিত ছিল।

১২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত বাইবেল প্রচলিত ছিল। এরপর খ্রীস্টানদের মধ্যে প্রোটেস্টান নামে নতুন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। যারা পূর্ববর্তী পুরোহিতদের সিদ্ধান্ত ভুল বলে দাবী করে বাইবেল থেকে অনেকগুলো গ্রন্থ বাদ দিয়ে দেয়। এভাবে প্রোটেস্টানদের বাইবেলের অধ্যায়ের সংখ্যা দাঁড়ালো ৬৬টিতে আর ক্যথলিক খ্রীস্টানদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা হলো ৭২টি। (বাইবেল সে কুরআন তক ১/৩১৯, ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৪)

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ক্যান্টরবরি নগরে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খ্রীস্টান পণ্ডিতগণ এ সিদ্ধান্তে উপণীত হন যে, যে যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে সেই যুগে এই শেকেলে বাইবেলের সংস্কার হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সবার পক্ষ হতে এই কাজের জন্য ২৭জন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১০ বছর পরিশ্রমের পর ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে যুগোপযোগী বাইবেলের একটি নতুন সংস্করণ বের করেন। যা Revised Version নামে পরিচিত। (সমকালীন পরিবেশ ও জীবন ১৪৪-১৪৯)

ইমাম কুরতুবী (রহ.) ইঞ্জিলের ইতিহাস আলোচনা করতঃ ঐতিহাসিক কালসমূহে এর পরিক্রমণের বর্ণনা দিয়ে উল্লেখ করেন, সেই অন্ধকার যুগে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ইঞ্জিল বিনষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্যে শুধু কিছু অংশ বাকী থাকে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল বিদ্যমান থাকারতো প্রশ্নই আসে না। কেননা তা এর শত শত বছর পূর্বেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ইঞ্জিলের বহু সংখ্যক সংকলন থেকে বাছাই করে চারটি ইঞ্জিলকে নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাজেই এই গ্রন্থগুলোকে আমরা সেই ইঞ্জিল বলতে পারি না, কুরআনের প্রতিটি স্থানে যাকে এক বচনে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং যা হযরত ঈসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। (ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৭-৪১৮)

বাইবেলের বিকৃতি ও সংযোজন বিয়োজনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে তুলে ধরা হলো। এছাড়াও যুগে যুগে আরো অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধনের ইতিহাস রয়েছে। বর্তমান বাইবেলের ভিত্তি যে, কত দূর্বল তা এসকল ইতিহাস থেকে সহজে অনুমান করা যায়। এধরনের বিকৃত গ্রন্থ কখনও ঐশীবাণী হতে পারে কি না কোয়ান্টামের ভাইয়েরা একটু চিন্তা করে দেখুন।

কুরআনের আলোকে বাইবেলের মূল্যায়ন :
অতীত উম্মতের কর্মকাণ্ড জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে পবিত্র কুরআন। ঐতিহাসিক রেফারেন্সে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও কুরআন হাদীসের রেফারেন্সে বাইবেলের বিকৃতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে –

"নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল এই কিতাবের পূর্বে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং অবতীর্ণ করেছেন মিমাংসা।" (সূরা আলে ইমরান ৩-৪)

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত তাওরাত ও ইঞ্জিল দ্বারা কি বর্তমানের বাইবেল উদ্দেশ্য? যে খানে রয়েছে বহু বিতর্কিত ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট নামে দু'টি অধ্যায়। যুগে যুগে যাতে করা হয়েছে বহু সংস্কার, বর্ধন-কর্তন। যার বিশুদ্ধতা নিয়ে খোদ খ্রীস্টজগত সন্দিহান। যার মূল ভাষা আজ বিলুপ্ত। খ্রীস্টানগণ যাকে মথি, মার্ক, লুক এবং জোহনের রচিত Gospel নামে অভিহিত করে থাকে?! কখনই তা হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে তাওরাত ইঞ্জিলের আলোচনা আছে, তবে তার উদ্দেশ্য এই ওল্ড/নিউ টেস্টামেন্ট নয়। বরং তাওরাত দ্বারা সেই মূল ঐশী গ্রন্থকে বুঝায় যা হযরত মূসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর ইঞ্জিল দ্বারা সেই মূল ঐশীগ্রন্থকে বুঝায় যা হযরত ঈসা (আ.) এর উপর অবতীর্ণ হয়ে ছিল। ইহুদী খ্রীস্টানরা তাতে মনগড়া সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে মারাত্মক বিকৃতি সাধন করে।

বাইবেলের এই বিকৃতির ঘটনা মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানব জাতিকে অবহিত করে দিয়েছেন। এখানে পবিত্র কুরআন থেকে লিখিত ও মৌখিক বিকৃতির একটি করে প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

ক. ইরশাদ হচ্ছে- "অতএব তাদের জন্য আফসোস যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে...।" (সূরা আল-বাকারা ৭৯)

খ. "আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে যাতে তোমরা মনে করো যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত, অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই উপর মিথ্যারোপ করে।" (সূরা আলে ইমরান ৭৮)

আহলে কিতাবদের পক্ষ থেকে বিকৃতি সাধনের এই ছিল চিরাচরিত অবস্থা। ঐশী গ্রন্থের মাঝে নিজেদের তরফ থেকে কিছু কম বেশ করে এমন ভঙ্গিমায় তা পাঠ করত যেন অনবগত সাধারণ শ্রোতারা ধোঁকায় পড়ে যায়। এবং এগুলোকে ঐশী গ্রন্থের অংশ মনে করে নেয়। শুধু তাই নয় বরং আরো একধাপ এগিয়ে মৌখিক দাবীও করতো যে, এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ বাস্তব হলো ওই বিষয়গুলো কিতাবেও নেই আল্লাহর তরফ থেকেও অবতীর্ণ হয়নি। এমন বিকৃত গ্রন্থকে সমষ্টিগতভাবে ঐশী গ্রন্থ নয় বলে আখ্যা দেওয়া যায়। আজ বিশ্বব্যাপী বাইবেলের যে সংকলনগুলো রয়েছে তা পরস্পরে ব্যাপক বিরোধপূর্ণ। আর তাতে এমনসব উক্তি রয়েছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছুতেই হতে পারে না। (শায়খুল হিন্দ, তরজমাতুল কুরআন পৃষ্ঠা ৭৭। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানভী (রহ.) রচিত ইযহারে হক্ব দেখা যেতে পারে)

হাদীসের আলোকে বাইবেলের মূল্যায়ন :
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলমানদের কাছে আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করতো। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবীদের উক্তিকে সত্য-কিংবা মিথ্যা বলো না। তবে তোমরা বল আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহকে এবং তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে।"

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় কিতাব বুখারী শরীফের তিন স্থানে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীস নং ৪৪৮৫, ৭৩৬২ ও ৭৫৪২।

যেহেতু আহলে কিতাবদের উক্তির মাঝে সত্য মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে তাই উক্ত হাদীসে তাওরাত ইঞ্জিল সম্পর্কে আহলে কিতাব তথা ইহুদী খ্রীস্টানদের কোনো উক্তির ব্যাপারে মন্তব্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেন কোনো বিষয় বাস্তব সত্য হয়ে থাকলে তা অস্বীকার করা না হয় আর মিথ্যাকেও স্বীকার করা না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "হে মুসলমানগণ তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ে) কোনো কিছু জানতে চাইলে আহলে কিতাবদের কাছে কিভাবে জিজ্ঞেস কর? অথচ তোমাদের ঐশীগ্রন্থ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আল্লাহর বিধান, যাতে কোনো মিশ্রন নেই। অপর দিকে আল্লাহ পাক

তোমাদের বলে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা (ইহুদী-খ্রীস্টান) আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং বিকৃত করে ফেলেছে। তারা সামান্য অর্থের জন্য নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করে বলছে যে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ। তোমাদের ধর্মীয় এলেম কি তাদের কাছে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করতে বাঁধা দেয় না? আল্লাহর কসম আমি তাদের কোনো লোককে তোমাদের কাছে অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি।" (বুখারী শরীফ ৭৫২৩, ৭৩৬৩)

এসকল হাদীস থেকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইহুদী-খ্রীস্টানদের কাছে ঐশী গ্রন্থ নামে যা কিছু রয়েছে তা নির্ভেজাল নয়। বরং ঐশী গ্রন্থের বিকৃত ও পরিবর্তিত রূপ মাত্র। যার সত্য মিথ্যা নিরুপণ করা দুষ্কর। তাই কুরআন সুন্নাহ থাকতে বাইবেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ আর বাইবেলের মর্মবাণী মুসলমানদের হাতে দিয়ে তা থেকে সফলতার সূত্র সন্ধানের আহবান কোয়ান্টামের জন্য বৈধ হচ্ছে না।

বাইবেল চর্চা :

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ বুখারী শরীফের একটি অনুচ্ছেদের শীর্ষে (তরজমাতুল বাব) একটি হাদীস অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন– "কিতাবীগণের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করো না।" (বুখারী শরীফ অধ্যায় ৯৬, অনুচ্ছেদ ২৫)

তবে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি এভাবে উল্লেখ রয়েছে।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবেত আনসারী (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আহলে কিতাবদের (ধর্মীয় বিষয়ে) প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক। কেননা যারা স্বয়ং নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করেছে তারা তোমাদের হেদায়াতের পথ দেখাতে পারবে না। অন্যথায় তোমরা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে ফেলবে।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে অপর বর্ণনায় রয়েছে– "তোমরা আহলে কিতাবের কাছে (ধর্মীয়) কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না। কেননা যারা স্বয়ং পথভ্রষ্ট তারা তোমাদের পথের দিশা দেখাতে পারবে না। অন্যথায় তোমরা কোনো সত্য বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ফেলবে বা ভ্রান্তকে সত্যায়ন করে ফেলবে।" (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক - ১৯২১২, অনুরূপ হাদীস মুসনাদে আহমদ ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ও মুসনাদে বাযযারে রয়েছে)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর কাছে এক ব্যক্তি কিছু উপঢৌকন পাঠালে তিনি বললেন, তার উপঢৌকন আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, সে নাকি পূর্ববর্তী কিতাবাদী নিয়ে গবেষণা করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "এটাকি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়।" (আল মওসূআতুল ফিকহিয়্যা কুয়েত- ৩৪/১৮৪)

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, বাইবেলের অনুসারী ইহুদী খ্রীস্টানদের কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান লাভের আশা করা বা বাইবেল চর্চা করা এবং এর মর্মবাণী অনুধাবনের চেষ্টা বৈধ হতে পারে না।

বাইবেল লেখা ও পড়া :

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর ঘর মদীনা শরীফ থেকে ২/৩ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হাজির হওয়ার পথে আহলে কিতাবদের কিছু বসতি ছিল। জ্ঞান পিপাসু হযরত উমর (রা.) কোনো কোনো সময় তাদের মজলিসে গিয়ে বসতেন। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথা জানতে পেরে যারপর নাই অসন্তুষ্ট হলেন। হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত এসংক্রান্ত একটি হাদীসে এসেছে– "একদা হযরত উমর (রা.) নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন আমরা ইহুদীদের কাছ থেকে তাদের (ধর্মীয়) অনেক কথা শুনি। যা আমদেরকে প্রীত করে। আপনি কি আমাদেরকে তা লিখে রাখার অনুমতি দেবেন? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা কি নিজেদের শরীয়তের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছো, যেমন ইহুদী-খ্রীস্টানরা করেছিলো? জেনে রাখ! আমি তোমাদের কাছে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছি। যদি মূসা (আ.) নিজেও জীবিত থাকতেন আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোনো উপায় থাকত না। (মেশকাত ১৭৭, মুসনাদে আহমদ ১৫১৫৬, বায়হাকী ১৭৭)

এখানে হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বাইবেলের মত গ্রন্থের মর্মবাণী লিখে সংরক্ষণের অনুমতি প্রার্থনার ফলে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধমকের সুরে বলে উঠলেন তোমরা অন্যদের ধর্মগ্রন্থ থেকে ইলম অর্জন করতে চাচ্ছ কেন? নিজের ধর্মের ব্যাপারে কি তোমরা সন্দিহান হয়ে পড়লে? যেভাবে ইহুদী-খ্রীস্টানরা ধর্মের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে ঐশী গ্রন্থ ছেড়ে, নবীর প্রকৃত শিক্ষা ত্যাগ করে, প্রবৃত্তি পূজারী অর্থলিপ্সু রাহেব ও পাদ্রীদের অনুসারী হয়ে পড়েছে। তোমরাও কি তাদের মত দ্বিধান্বিত হয়ে অন্য ধর্মের মোখাপেক্ষী হয়ে পড়েছ? অথচ আমার আনীত শরীয়ত এত স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ যে, আজ মূসা (আ.)ও যদি থাকতেন তবে তিনিও সকল কথা ও কাজে আমার

শরীয়তের অনুসারী হতেন। আর তোমরা কি না আমার উপস্থিতিতে তাঁর উম্মত তথা ইহুদীদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে চাও। এই কাজ তোমাদের জন্য কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। (মেরকাত ১/৪২৩, মাজাহেরে হক্ব ১/২১৮)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন কঠোর ভাষায় হযরত উমর (রা.)কে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে, অন্য ধর্মের গ্রন্থ লেখার অনুমতি চাওয়ার দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, তারা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনীত শরীয়তকে অপূর্ণাঙ্গ বলে বিশ্বাস করে। তাই এত কঠোরভাবে বারণ করেছেন। (আত্তালীকুস সবীহ ১/১৩১)

অপর হাদীসে এসেছে, "হযরত উমর (রা.) একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জনৈক আহলে কিতাবের কাছ থেকে পাওয়া একটি পুস্তিকা নিয়ে হাজির হলেন, এবং তা পাঠ করতে লাগলেন, এতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি তোমাদের কাছে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট শরীয়ত নিয়ে এসেছি। আহলে কিতাবদের কাছে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করো না। অন্যথায় তারা কোনো সত্য বিষয় তোমাদের কাছে পৌঁছালে তোমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ফেলবে অথবা ভ্রান্ত বিষয় পৌঁছালে সত্যায়ন করে ফেলবে। ওই সত্তার কসম যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ যদি মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন তবে তিনিও আমার অনুসরণে বাধ্য হতেন।" (মুসনাদে আহমদ ১৫১৬৪, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২৬৯৪৯)

বিশ্ব বিখ্যাত ফতাওয়া গ্রন্থ ফতাওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে, "তাওরাত ইঞ্জিল দেখতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। চাই আমাদের কাছে তা ইহুদী খ্রীস্টানগণ বর্ণনা করুক বা তাদের মধ্য হতে ইসলামগ্রহণকারী কেউ বর্ণনা করুক।" (ফতাওয়ায়ে শামী ১/১৭৫, এইচ এম সাঈদ)

সার কথা হলো বাইবেল নিয়ে পড়াশোনা করা এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষেধ। এ ধরনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোয়ান্টাম মেথড বেদ বাইবেলে সফলতার সূত্র সন্ধানে ব্রতী হয়ে এদেশের সরলমনা ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণকে বোকা বানাতে সচেষ্ট রয়েছে।

বাইবেল প্রচার :

যেভাবে বাইবেলের চর্চা বা শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে পড়াশোনা নিষিদ্ধ তদ্রুপ বাইবেলের প্রচার বা মর্মবাণী বর্ণনা করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবু নামলা আনসারী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাশ দিয়ে জনৈক ইহুদী একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করল : হে মুহাম্মদ! বলুন তো দেখি এই লাশ কি কথা বলতে পারে? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহই ভাল জানেন। ইহুদী বলল, হ্যাঁ সে কথা বলতে পারে। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আহলে কিতাবগণ তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করে তা সত্যায়নও করোনা এবং মিথ্যা প্রতিপণ্যও করো না। বরং তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর সকল রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছি। অতঃপর যদি তা ভ্রান্ত হয় তবে তার সত্যায়ন থেকে বেঁচে যাবে আর হক্ব হলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বেঁচে যাবে। (আবু দাউদ-৩৬৪৪)

এই হাদীস থেকে একথা প্রমাণ হলো যে, আহলে কিতাব তথা ইহুদী খ্রীস্টানদের ধর্মীয় বিষয় বর্ণনা করা বা প্রচার-প্রকাশ করা নিষেধ। যেহেতু তাদের সূত্রে বর্ণিত ধর্মবাণীর সত্যতা নিশ্চিতরূপে যাচাই সম্ভব নয়। উপরন্তু কুরআনে তাদের ধর্ম বিকৃতির স্বাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাই ঈমানদারের কর্তব্য। আর সকল নবী রাসূল ও তাঁদের উপর অবতীর্ণ ঐশী বাণীর উপর শুধু মাত্র সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল তা বর্তমানের এই বাইবেল নয়। বিকৃত এই বাইবেলকে অনুসরণীয় মনে করা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত শরীয়তকে অর্ধাঙ্গ মনে করার শামিল। তাই বাইবেলের প্রচার প্রসার কোনো কিছুই শরীয়ত সম্মত নয়। কোয়ান্টামের বাইবেল কনিকাসহ ভিন্ন ধর্মের সকল প্রচারণা অবৈধ ও হারাম। এমন গর্হিত কাজকে ধর্মসম্মত বলা অজ্ঞতা না হলে অজ্ঞতার সংজ্ঞা নতুন করে নির্ণয় করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, কোয়ান্টাম কনিকায় যদিও বাইবেলের সাথে সাথে হিন্দু ধর্মের বেদ, ও বৌদ্ধ ধর্মের ধম্মপদের মর্মবাণীও প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু তাওরাত ইঞ্জিলের মত ওই সকল গ্রন্থ ঐশী বাণী হওয়ার কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই বিধায় তার আলোচনা পরিহার করা হলো।

কোয়ান্টাম মেথড-৭

সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শন

মুফতী শরীফুল আ'জম

মানব জাতির সামগ্রিক সুখ-শান্তি ও উভয় জাহানের সফলতার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে দ্বীন, শরীয়ত বা ধর্ম। বান্দাদের প্রতি যা আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপার একটি নমুনা। ধর্মের দিকনির্দেশনা যদি না থাকতো তবে মানুষ উদ্ভ্রান্তের ন্যায় জীবন যাপন করতো। স্রষ্টার সন্তুষ্টির পথ কখনোই নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে আবিস্কার করতে পারত না। সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম (আ.)কে পৃথিবীতে প্রেরণের সাথে সাথেই আল্লাহ পাক এই শরীয়ত বা ধর্ম বিধান অবতীর্ণ করার ধারা চালু করে দেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াত অনুসারে চলবে তার উপর না কোনো ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত সন্তপ্ত হবে।" (সূরা আল বাকারা ৩৮) তাই সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট শংকা আর দুশ্চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবন পেতে হলে ওই সকল ধর্ম বিধান পালন আবশ্যকীয়। এর বিপরীত ধর্ম বা শরীয়তকে অবজ্ঞা করে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ভয়াবহ পরিণতির কথাও এর পরের আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– "আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে তারাই হবে জাহান্নামবাসী। অনন্তকাল সেখানে থাকবে।" (সূরা আল-বাকারা ৩৯)

ধর্মের এই বিধান যারা মেনে চলেছে, প্রত্যেক নবী রাসূলের যুগে তারাই মুমিন মুসলমান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আর যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা কাফের মুশরিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ ধর্মবিধান বা শরীয়তকে যারা কিয়ামত অবদি মেনে চলবে তারা আল্লাহ পাকের দফতরে মুমিন মুসলমান হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে পুরস্কৃত হবে। আর যারা তাঁর আনীত ধর্মকে অসত্য ও অচল বা অসম্পূর্ণ মনে করে ভিন্ন কোনো ধর্ম অবলম্বন করবে বা নতুন মেথড আবিষ্কারের পেছনে পড়বে তারা ধর্মদ্রোহীদের কাতারে শামিল হয়ে তিরষ্কৃত হবে।

ধোঁকা-প্রতারণা :

দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রে একই সাথে একাধিক সংবিধান বহাল থাকতে পারে না। এক রাষ্ট্রে একাধিক সংবিধান থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এই সাধারণ কথাটা বুঝতে খুব বেশি প্রজ্ঞার দরকার হয় না। সামান্য বিবেক দিয়েই তা অনুধাবন করা যায়। দুনিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষমতার গণ্ডিতে যদি এই নীতি হয় তবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার রাজত্বে এক সাথে একাধিক ধর্মবিধান বলবৎ থাকারতো প্রশ্নই ওঠে না। তাই সকল ধর্মগ্রন্থকে বহাল রেখে সকল ধর্মের একসাথে প্রচারণা বা পালনের কোয়ান্টাম মেথড গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মূলত কোয়ান্টাম মেথড অজ্ঞতাপ্রসূত এরূপ কর্মকাণ্ডকেই "দি সায়েন্স অব লিভিং" নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে মুসলমানগণ হবে পথভ্রষ্ট আর অমুসলিমরা হবে প্রতারিত। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে: "তিনিই তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আসসফ ৯)

ঈমান কুফরের মিশ্রন :

কোয়ান্টামের উদ্ভাবিত জীবন দৃষ্টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "কোয়ান্টাম হচ্ছে সেই সায়েন্স অব লিভিং যা বলে দেয় জীবনটাকে কিভাবে সুন্দর করা যায়, ভুল থেকে কিভাবে দূরে থাকা যায়, পাপ কত কম করা যায় আর ভাল বা কল্যাণ কত বেশি করা যায়। কোয়ান্টামের শিক্ষা এ ক্ষেত্রে নবী-রাসূলদের যে শিক্ষা, ওলী-বুযুর্গদের যে শিক্ষা, মুনি-ঋষিদের যে শিক্ষা তা থেকে আলাদা কিছু নয়। হাজার বছর ধরে তারা যে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, কোয়ান্টাম সে কথাগুলোই বলছে। শুধু ভাষাটা আধুনিক।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব-মহাজাতক ১/৩০১)

এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হলো যে, কোয়ান্টামের শিক্ষা হচ্ছে, নবী রাসূলদের তৌহীদী বাণী ও মুনি-ঋষিদের কুফরী মতবাদের সমন্বিত একটি রূপ।

মেডিটেশনের (বৈজ্ঞানিক ধ্যান) উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে- "ইতিহাসের দিকে তাকান, হযরত ইবরাহীম (আ.) আত্মনিমগ্ন হলেন... হযরত মূসা (আ.) সিনাই পাহাড়ে চলে গেলেন, আত্মনিমগ্ন হলেন... যীশুখ্রীষ্ট বা হযরত ঈসা (আ.) মাঝে মাঝে পাহাড়ে চলে যেতেন, আত্ম নিমগ্ন হতেন এবং স্রষ্টার বাণী এনে মানুষের মাঝে, অনুসারীদের মাঝে প্রচার করতেন। আমাদের মুনি-ঋষিরা তপোবনে চলে যেতেন, হিমালয়ে চলে যেতেন সাধনা করতেন, মাহমতি বুদ্ধ অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বছরের পর বছর ধ্যানমগ্ন থাকলেন। তারপর বোধি লাভ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হেরা গুহায়

বছরের পর বছর ধ্যানমগ্ন থাকলেন। তার পর তিনি নবুওয়াত লাভ করলেন।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৮০)

এখানেও সেই একই ধারায় নবী-রাসূল, মুনি-ঋষি ও বুদ্ধের মতানুসারীদের একসূত্রে গেঁথে নতুন এক জীবন দৃষ্টির পথ মসৃন করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সকলকে খুশি রাখাই যেন কোয়ান্টামের মূল দর্শন। অথচ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে– "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করোনা।" (সূরা আল বাকারা ১১২) সত্যমিথ্যার পরিচয় দিতে গিয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে– "এটা একারণে যে, আল্লাহই সত্য, আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে সব মিথ্যা এবং আল্লাহই সবার উচ্চে মহান।" (সূরা হজ্ব ৬২) এখানে একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আর তা হচ্ছে আমাদের মুনি-ঋষিরা বলতে কাদের মুনি-ঋষি বোঝানো হয়েছে? অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তো আমাদের শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। তাহলে কি ওই লেখক মুনি-ঋষিদের ধর্ম অনুসারী? তাছাড়া মুনি-ঋষি ও বুদ্ধের পরে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম উল্লেখ করা নবীজীর শানে চরম বেয়াদবী। এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি এদের চরম অবজ্ঞাই প্রতীয়মান হয়।

সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচেষ্টার আরো কিছু নমুনা কোয়ান্টামের বই পুস্তক থেকে তুলে ধরা হচ্ছে।

লা-শরীক বহুশরীক :

কোয়ান্টামের উদারতা প্রমাণ করতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে বলা হয়, "আমরা শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলি, হরি ওঁম বলি, থ্যাংকস গড বলি, প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ বলি, ভগবান তোমাকে ধন্যবাদ বলি, ইশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ বলি। কারণ আমাদের কাছে আল্লাহ যে রকম পবিত্র, ইশ্বর পবিত্র, ভগবান পবিত্র, গডও পবিত্র। কারণ একই প্রভুর অনেক নাম।" (হাজার প্রশ্নের জবাব ১/৫৫)

সাধারণ মানুষ তাদের এই গোছালো কথার মারপ্যাচ বুঝতে না পেরে এমন ভ্রান্ত কুফরী বক্তব্যকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ, ইশ্বর, ভগবান বা গড এর সংজ্ঞা ও পরিচয় কখনও এক হতে পারে না। মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা হলেন লা-শরীক আর বাকী সবার রয়েছে বহুশরীক। এতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নেই।

আলো-আঁধার কি এক?

একজন খ্রীষ্টান ধর্মীয় দিক দিয়ে কোয়ান্টাম থেকে কি উপকার লাভ করতে পারে? এমন এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে, "আসলে একজন খ্রীষ্টান যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন, মৌন সাধনা করেন তাহলে তিনি একজন ভাল খ্রীষ্টান হবেন, সন্তে রূপান্তরিত হবেন। একজন মুসলমান যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভাল মুসলমান হবেন, বুযুর্গে রূপান্তরিত হবেন। একজন হিন্দু যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভাল হিন্দু হবেন, ঋষিতে রূপান্তরিত হবেন। একজন বৌদ্ধ যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন, তাহলে তিনি একজন ভাল বৌদ্ধ হবেন, ভিক্ষুতে রূপান্তরিত হবেন।" (হাজার প্রশ্নের জবাব ১/২৩৯)

সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শন বাস্তবায়নের এটি একটি জঘণ্যতম কৌশল। কোয়ান্টাম মেনে চললেই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সকলে নিজ ধর্মের খাঁটি অনুসারী হতে পারবেন। কিন্তু সব ধর্মের লোক যদি খাঁটি হিসেবে স্বীকৃতি পায় তাহলে খাঁটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে পৃথিবী ভেজালে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। কোয়ান্টামের উচিৎ সাধুবার্তা শুনিয়ে আধুনিক মানুষকে বিভ্রান্ত করার পথ পরিহার করে আসল-নকল, খাঁটি-ভেজাল, ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার, অন্ধ-চক্ষুস্মান, ঈমান-কুফর ও হক-বাতিলের পার্থক্য তুলে ধরা। পবিত্র কুরআনে এই তফাৎ সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে –

"বলুন অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়?" (সূরা রা'আদ ১৬)

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– "দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। সমান নয় অন্ধকার ও আলো। সমান নয় ছায়া ও তপ্ত রোদ। আরো সমান নয় জীবিত ও মৃত।" (সূরা ফাতির ১৯-২২)

এসকল আয়াতে এমন সব বাস্তব উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে, যা অস্বীকার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই ঈমান কুফরের এই তফাৎকে মিটিয়ে দিয়ে সকল ধর্মের লোককে নিজ নিজ ধর্মের খাঁটি অনুসারী বানানোর অপকৌশল পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বিরোধিতা ও খোদাদ্রোহিতার শামিল। যেসকল মুসলমান ভায়েরা কোয়ান্টামে যোগ দিয়েছেন, তাদের ভেবে দেখতে হবে যে, আলোর পথ ছেড়ে অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছেন কি না? পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি স্মরণ করুন, যেখানে বলা হচ্ছে– "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অদিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (সূরা আল-বাকারা ২৫৭) বোঝা গেলো মুমিন আর কাফেরের অভিভাবক এক নয় এবং গন্তব্যও এক নয়। অতএব কোয়ান্টামে

গিয়ে ঈমান কুফরের মোহনায় নিজের ঈমান আমল বিসর্জন দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা সকলের কর্তব্য।

একত্ববাদী কারা?

বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত সকল ধর্মের মূল শিক্ষাই নাকি এক ও অভিন্ন। সকল ধর্মই একত্ববাদ তথা তাওহীদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন দাবীকে প্রমাণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "বেদ, ধম্মপদ, বাইবেল এবং কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণীর মূল সুরের ঐক্য আপনাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবে। ধর্মাচারে ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও আপনি অনুভব করবেন স্রষ্টার একত্বের সাথে মানবজাতির একত্বে।" (কোয়ান্টাম কনিকা- ৮)

উল্লেখ থাকে যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তাওরাত ইঞ্জিল আর বর্তমানের বাইবেল এক নয়। যার আলোচনা মাসিক আল-আবরের বিগত সংখ্যায় সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। কোয়ান্টামের বক্তব্য অনুযায়ী হিন্দু ধর্মের বেদ, বৌদ্ধদের ধম্মপদ ও ইহুদী খ্রীষ্টানদের বাইবেল আর ঐশী গ্রন্থ কুরআন হাদীসে স্রষ্টার যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা এক ও অভিন্ন। সব গ্রন্থেই তাওহীদের কথা বলা হয়েছে। সে হিসেবে মানবজাতিকেও এক জাতি বা এক উম্মত বলা যায়। সকলে একত্ববাদী বা তাওহীদে বিশ্বাসী। হিন্দু বৌদ্ধ, ইহুদী খ্রীষ্টান কেউ কাফের নয়। বরং সকলে একত্ববাদী তথা মুমিন। পার্থক্য শুধু ধর্মাচারের।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের এমন সাজানো গোছানো সুক্ষ দর্শন যে, কতবড় মারাত্মক ভ্রান্ত ও ঈমান বিনাশী তা পবিত্র কুরআনে দৃষ্টি দিলে সহজেই বোঝা যায়। ইরাশাদ হচ্ছে–

"নিশ্চয়ই তারা কাফের যারা বলে, আল্লাহ তিনের এক। অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয় তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি পতিত হবে।" (সূরা মায়েদা - ৭৩)

উক্ত আয়াতে বর্তমান খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মবিশ্বাস ত্রিত্ববাদ তথা Trinitarian Doctrine কে কুফরী মতবাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টানদের মতে গড হচ্ছেন তিন সত্তার সমষ্টি। অর্থাৎ পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এই তিনে মিলে এক খোদা হচ্ছেন 'গড'। (বাইবেল সে কুরআন তক ১/৪৩)

পবিত্র কুরআনে যে মতবাদকে কুফরী মতবাদ বলে আখ্যায়িত করা হলো, কোয়ান্টাম সে ত্রিত্ববাদকে একত্ববাদ বলে প্রচার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। আবার বড় গলায় বলছে কুরআন হাদীস আর বর্তমান বাইবেলের মূল সুর নাকি একই!

খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ যদি কুফরী হয় তবে হিন্দুদের বহু ইশ্বরবাদের স্থান কোথায় হবে একটু ভেবে দেখুন। হিন্দু ধর্মমতে ব্রহ্মা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা আর মহাদেব সংহার কর্তা। এই তিনের সমষ্টিকে বলা হয় 'ওঁম'। এর সাথে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতো আছেই। হিন্দুরা এই তেত্রিশ কোটি দেবদেবতা, লতাপাতা পূজা করা সত্বেও যদি কোয়ান্টামের মতে তারা একত্ববাদী বা একেশ্বরবাদী হয় তবে আর কত কোটি দেবতা যোগ করলে তারা বহু ইশ্বরবাদী মুশরিক বলে সাব্যস্ত হবে?

আর বৌদ্ধ ধর্মতো নাস্তিক্যবাদের এক মূর্তপ্রতীক। যেখানে স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। এই অনন্ত সৃষ্টি প্রবাহ প্রাকৃতিকভাবে আপনাআপনিই প্রবাহিত হয়ে চলছে। একে পরিচালনা করার জন্য কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন হয় না। (ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ- ৬৬০)

সুতরাং ত্রিত্ববাদ, বহু ইশ্বরবাদ ও নাস্তিক্যবাদ এবং ইসলামের একত্ববাদের মত চরম সাংঘর্ষিক ধর্মমতে স্রষ্টার সংজ্ঞা কখনও এবং কোনো সময় এক হতে পারে না। এ ধরনের ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে মুসলমানদের মিলিয়ে ফেলা এবং সকলকে এক জাতি অনুভব করা সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি কুট কৌশল মাত্র। যা মুসলমানদের ঈমান বিনাশী একটি পদক্ষেপ।

ওয়াফদে নাজরান :

কোয়ান্টামের এই অপকীর্তির বৈধতা দেওয়ার জন্য নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগের ঐতিহাসিক একটি ঘটনাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে কোয়ান্টাম। ঘটনাটি নাজরানের খ্রীষ্টান প্রতিনিধি দলের মসজিদে নববীতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ সংক্রান্ত। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক পত্র মারফত ইসলাম গ্রহণের আহবানে সাড়া দিতে ওই দলটি মদীনায় এসেছিল। ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে তারা কর আদায়ের শর্তে শান্তি চুক্তি করে ফিরে গিয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের আহবানে সাড়া দিতে আসা নাজরান খ্রীষ্টান দলের সাথে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষাতের ঘটনা দিয়ে কোয়ান্টাম সকল ধর্মের সত্যতা প্রমাণ ও সকল ধর্মের মঙ্গলের জন্য এক সাথে কাজ করার বৈধতা প্রমাণ করেছে। (হাজারো প্রশ্নের উত্তর - ১/৫১)

নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমণ সংক্রান্ত সঠিক ইতিহাস জানতে সূরা আলে এমরান ৬১-৬২ নং আয়াতের তাফসীর, বুখারী শরীফের হাদীস এবং ইবনে কাসীর (রহ.) রচিত আলবেদায়া ওয়াননেহায়া দেখা যেতে পারে। তাতে সর্বধর্ম সমন্বয়ে কোয়ান্টামের ইতিহাস বিকৃতির চিত্র পরিষ্কার বুঝে আসবে।

কোয়ান্টাম মেথড-৮
দ্বীনে এলাহীর নতুন সংস্করণ

মুফতী শরীফুল আ'জম

সকল ধর্মের মিশ্রণে একটা নতুন কিছু উদ্ভাবনের দর্শন বা মেথড আবিষ্কার কোয়ান্টামের একক কৃতিত্ব নয়। যুগে যুগে এমন বিকৃত মানষিকতার প্রকাশ বিভিন্ন মহল থেকে হয়েছে। কিন্তু তার বাস্তবায়ন বা স্থায়িত্ব কখনও দীর্ঘ হয়নি। এই ময়দানে ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে স্মরনীয় হচ্ছে বাদশাহ আকবরের দ্বীনে এলাহী। মোগল সম্রাট জালাল উদ্দীন আকবরের ঘাড়ে এই ভূত সওয়ার হয়েছিল। বিভিন্ন মহলের অপপ্রচারের কারণে সে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। অপর দিকে সে কিশোর বয়সে পাওয়া রাজ সিংহাসন দৃঢ় ও স্থায়ী করার লক্ষ্যে সংখ্যাগুরু হিন্দু জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করতে থাকে। এর সাথে যোগ হয় এক হাজার বছরের মাথায় ইসলামের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার অপপ্রচার। সব মিলিয়ে নিরক্ষর বাদশাহ আকবর সকল ধর্ম সমন্বয় করে নতুন কোনো মেথড আবিষ্কারের ফন্দি করে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাজ দরবারে সকল ধর্মের বিশেষজ্ঞদের আহবান করে ধর্মব্যাখ্যা শুনতে থাকে। এক পর্যায়ে সে নতুন ধর্ম দ্বীনে এলাহীর অবকাঠামো তৈরী করে ফেলে। যেখানে কিছু কিছু আক্বীদা বিশ্বাস ও রীতি নীতি মিশ্রন করে দেওয়া হয়। তবে সিংহভাগ যোগ করা হয় সংখ্যাগুরু হিন্দুধর্ম থেকে। তাই আকবরের দ্বীনে এলাহীর ঝোঁক হিন্দু ধর্মের প্রতি বেশি পরিলক্ষিত হয়। কোয়ান্টাম মেথড মানুষের সফলতা ও মুক্তির জন্য সেই একই পন্থা বেছে নিয়েছে। সকল ধর্মের কিছু কিছু অংশ এবং বৈজ্ঞানিক থিউরি যোগ করে চালু করেছে নতুন এক মেথড, জীবন দৃষ্টি, নজরিয়া বা ধর্ম।

দ্বীনে এলাহী- থেকে কোয়ান্টাম :

সর্বধর্ম সমন্বয়ে কোয়ান্টামের সাথে দ্বীনে এলাহীর ব্যাপক মিল পাওয়া যায়। যার সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো।

১. বহুজাতিক জ্ঞান চর্চা:

বাদশাহ আকবরের দরবারে সকল ধর্মের পণ্ডিতদের একত্রিত করে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করা হতো। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী ১/৫৩)

অনুরূপ কোয়ান্টামে সকল ধর্মের নির্জাস. মিশ্রণ করে নতুন এক জীবন যাপনের বিজ্ঞান উদ্ভাবন করা হয়েছে।

২. যুক্তি নির্ভরতা :

নতুন ধর্ম দ্বীনে এলাহীর মূল ভিত্তি আকল তথা মানব ব্রেণ নিসৃত বুদ্ধির উপর রাখা হয়েছিল। (উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাজী ১/৪২) আর ঐশী বিধানকে 'অন্ধ অনুসরণ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। অনুরূপ কোয়ান্টামের ভিত্তিও রাখা হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্র কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর উপর। আর ঐশী বিধিবিধানকে পক্ষপাতদুষ্ট মত বা অবিদ্যা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। (হাজারো প্রশ্নের জবাব - ১/১৫, ১/৪২৫)

৩. নববিধান

হিজরী দশম শতাব্দীতে একহাজার বছর পার হওয়ায় ইসলামের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে বলে ব্যাপক অপপ্রচারের ফলে নতুন ধর্ম, নতুন আইন, নতুন মেথড উদ্ভাবনের প্রয়োজন অনুভব করেছিল বাদশাহ আকবর। (তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমত ৪/১১১)

অনুরূপ কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের যুগে পুরাতন ধর্মবিধানকে নতুন জামা পরিধান করানোর উদ্দেশ্যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে। বলা হচ্ছে "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে।" তারা উদ্ভাবন করেছে নতুন জীবনদৃষ্টি, নতুন মেথড। কুরআন হাদীসের বিধিবিধান তথা শরীয়তে মুহাম্মদীকে তারা মানুষের মুক্তি ও সফলতার জন্য যথেষ্ট মনে করছে না। বরং তারা বলছে যুগের চাহিদা মেটাতে দরকার কোয়ান্টাম উদ্ভাবিত 'দি সায়েন্স অব লিভিং' নামক মিশ্র বিজ্ঞানের। (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৫৬, ১/৩০০)

৪. সহস্রাব্দের ডাক :

দ্বীনে এলাহীকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দ তথা আলফে সানির নববিধান বা নতুন জীবন দৃষ্টি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় মুদ্রায় সহস্রাব্দের তারিখ ছাপা হয়ে ছিল এবং আলফী নামে এক নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছিল। (তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমত - ৪/১১১) অনুরূপ কোয়ান্টামকে নতুন সহস্রাব্দের জীবন যাপনের বিজ্ঞান The science of living বলে প্রচার করা হচ্ছে। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-১৪৩) অথচ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত দ্বীন ইসলাম কোনো শতাব্দী বা সহস্রাব্দ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং কেয়ামত অবদী আগত সকল মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য ও শিরোধার্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- "আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সূরা সাবা ২৮) ইসলাম বিজ্ঞানের আবিস্কার বা উপকারী দিককে অস্বীকার করে না। কিন্তু জীবনযাপনের ধরন হতে হবে শতভাগ কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক।

এক্ষেত্রে শরীয়তকে পাশ কাটিয়ে বিজ্ঞানের অনুসারী হওয়ার অবকাশ নেই। ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানবের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। বিশেষ কোনো যুগে একে অচল অসম্পন্ন মনে করলে ঈমান থাকবে না।

৬. ঈমান ছাড়া সাধনা :

ঈমান আকীদা দুরস্ত করা ব্যতীত বিভিন্ন সাধনা বা রিয়াযাত মুযাহাদা দ্বীনে এলাহীর বৈশিষ্ট।

অনুরূপ কোয়ান্টামেও ঈমান কুফরের ভেদাভেদ ভুলে মৌন সাধণার নি:স্ফল কসরত চলছে। (হাজারো প্রশ্নের জবাব-মহাজাতক ১/১৯৯) অথচ পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আ'রাফের ১৫৮ নং আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, এই আয়াত দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রত্যেক দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপকভাবে রাসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আবির্ভাবের পর যে লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না সে লোক কোনো সাবেক শরীয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোনো ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়নভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কষ্মিনকালেও মুক্তি পাবে না। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

৭. সূর্য পূজা :

দ্বীনে এলাহীতে সূর্যের পূজা করা হতো এবং বাদশা আকবর নিজে সাংস্কৃতি ভাষায় সূর্যের এক হাজার নামের জপ করতেন। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী-১/২৭)

অনুরূপ কোয়ান্টামেও সূর্য মেডিটেশন নামে বিশেষ সাধণার প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া কোয়ান্টামে বিশেষ জপ নির্ধারণ করা হয়েছে। যাকে কোয়ান্টাধ্বনি বলা হয়। বিশেষ এই ধ্বনি জপতে জপতে আয়ত্বে আনতে পারলে নাকি এই ধ্বনি প্রয়োগ করে কাকতালীয়ভাবে অনেক কিছু ঘটানো সম্ভব। যেভাবে দরবেশ-ঋষিরা সাধনায় লক্ষ লক্ষবার তাদের মন্ত্র জপ করে শক্তি অর্জন করতেন। ঠিক কোয়ান্টাধবনির কার্যকারিতাও তাই। (হাজারো প্রশ্নের জবাব, মহাজাতক ১/১৬৪)

৮.অগ্নি পূজা :

অগ্নি পূজারীদের সাদৃশ্যে বাদশাহ আকবরের শাহী মহলে সর্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবং আগুনকে পবিত্র মনে করে সম্মান করা হত। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী-১/৪৩)

অনুরূপ বান্দরবনের লামায় অবস্থিত কোয়ান্টামের তীর্থস্থান যাকে ওরা মেডিটেশন রিসোর্ট বলে, সেখানে কুন্ডলী জেলে ধ্যান উৎসব শুরু করা হয়। যাকে ওরা Camp Firing বলে থাকে। (প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারীর বক্তব্য) আফসোস আজ মুসলমানরা নিরাময় ও সফলতার সন্ধানে অগ্নিপূজায় পর্যন্ত অংশ নিতে দিধা করছেনা। কোথায় গেল আজ তাদের ঈমানী আত্মমর্যাদা?

৯.বাইবেল প্রচার:

বাদশাহ আকবর বাইবেল ও মহাভারতের আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল। আর নিজ পুত্র শাহজাদা মুরাদকে খ্রিষ্টান পাদ্রীদের কাছ থেকে পাঠ গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছিল। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী-১/৪১,৪৩)

অনুরূপ কোয়ান্টাম বেদ, বাইবেল ও ধম্মপদের অনুবাদ প্রচার করে যাচ্ছে এবং এগুলোর মর্মবাণী অনুধাবনের জন্য সকলকে আহবান করে চলছে। (কো.কণিকা-৮)।

১০. পর্দা:

দ্বীনে এলাহীতে নারীদের পর্দার বিধান রহিত করে দেয়া হয়েছিল। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী-১/২৮)

অনুরূপ কোয়ান্টামে নারী পুরুষের যেভাবে অবাধ মিলন মেলা চলছে সেখানে পর্দার কোন প্রশ্নই আসেনা। সুন্দর করে লিপিষ্টিক মেখে মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছে নারী, আর দর্শকরা হা করে তাকিয়ে শুনছে তার বক্তব্য। বরং আরো একধাপ এগিয়ে টিনেজ যুবতী মেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে কুশল-বিনিময় ও আশির্বাদ দিয়ে সর্বনাশ করা হচ্ছে। (হা.প্র.জ.১/২২১)

অথচ পর্দা ইসলামের একটি ফরজ বিধান। পর নারীকে স্পর্শ করা দূরের কথা, তাদের দিকে তাকানোও ইসলামে নিষেধ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। (সূরা আল-আহযাব ৫৯)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, এখানে جلابيب শব্দটি جلباب এর বহুবচণ। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এচাদরের আকার আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এই চাদর উড়নার উপর পরিধান করা হয়। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) বলেন, আমি হযরত উবাইদা সালমানী (রহ.)কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং جلباب এর আকার আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপরের দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বাম চক্ষু খোলা রেখে ادناء ও جلباب এর তাফসীর কার্যত দেখিয়ে দিলেন। এই আয়াতটি পরিস্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

তাই মহিলাদের শরীর যেভাবে পরপুরুষ থেকে আবৃত করে রাখা ফরজ অনুরূপ

চেহারা আবৃত করাও ফরজ।
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে হজ্বের সফরে ছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে অনেক আরোহী অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের বরাবর চলে আসত তখন আমাদের প্রত্যেকে মাথা থেকে চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে নিতাম এবং আমাদের অতিক্রম করে চলে গেলে পুনরায় চেহারা খুলে নিতাম। (আবু দাউদ হাদীস নং ১৮৩৩, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৯৩৫, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ২৪০২১)
কুরআন-সুন্নাহর এসকল স্পষ্ট পর্দার বিধান লংঘন করে কোয়ান্টামের ভায়েরা বেপর্দা হয়ে যে সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন, তা কতটুকু সফলতা বয়ে আনবে একটু ভেবে দেখুন। কোয়ান্টাম তো আপনাদের পাপমুক্ত থাকার কথা বলে থাকে। বেপর্দা নারীপুরুষের কোর্স, গুরুজী কর্তৃক টিনেজ নারীদের মাথায় হাত বুলানোর মত গর্হিত কাজ কি পাপের সংজ্ঞায় পড়ে না?

১১.দাড়িঃ

দ্বীনে এলাহীতে মদ্যপানের বৈধতার পর সবচেয়ে জোর দেয়া হতো যে কাজের তা ছিলো দাড়ি মুন্ডানো। বাদশাহ আকবর ও তার মতাবলম্বী বড় বড় ধর্ম বিশারদগণ পর্যন্ত নিয়মিত গুরুত্বের সাথে দাড়ি মুন্ডন করতো। এর বৈধতা প্রমানের জন্য তারা নানা খোড়া যুক্তি প্রমান পেশ করে থাকতো। (উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাজী- ১/২৬)
অনুরূপ কোয়ান্টামের গুরু নিজেও দাড়ি মুণ্ডন করেন এবং এর বৈধতা প্রমানে জোরালো বক্তব্য রেখে থাকেন। এ সংক্রান্ত কোয়ান্টামের একটি প্রশ্ন-উত্তর এখানে তুলে ধরা হচ্ছেঃ
প্রশ্নঃ গুরুজী আপনি দাড়ি রাখেন না। আপনার বড় গোঁফ রয়েছে। এটা ইসলামবিরুদ্ধ এই বলে আমার এক বন্ধু প্রায়ই আমাকে বিরক্ত করে। আমি লজ্জিত হই। উত্তর দিতে পারিনা। কিন্তু আমি তাকে কোয়ান্টামে আনতে চাই। এ ব্যাপারে পরিস্কার ভাবে কিছু বললে খুশি হবো।
উত্তরঃ দাড়ির সাথে ইসলামের সম্পর্কটা কতটুকু তা আমাদের বুঝতে হবে। দাড়ি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর একটি সুন্নাত। কিন্তু ফরজ নয় বা ঈমানের অংশ নয়। কাজেই দাড়ি দিয়ে কেউ যদি কারো ঈমান বিচার করতে যান তিনি ভূল করবেন। দাড়ি রাখেন না শুধু এ যুক্তিতেই কাউকে ইসলাম বিরুদ্ধ বলা এটাও হবে একটা ভ্রান্ত কাজ। তবে দাড়ি রাখা সুন্নত এবং যিনি তা পালন করবেন, তিনি সওয়াব পাবেন। কিন্তু দাড়ি ফরজ বা ঈমানের অঙ্গ বা দাড়ি না রাখলে পরিত্রান পাওয়া যাবে না এমন কোন বক্তব্য কুরআন-হাদিসে কোথাও নেই। (হাজারো প্রশ্নের জবাব- মহাজাতক .১/৪২৩)
এই উত্তরের সপক্ষে কোন রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়নি এবং তা সম্ভবও নয়। এটা সম্পূর্ণ মনগড়া সাজানো বক্তব্য। সমাজে প্রচলিত একটি ভূল ধারণার ভিত্তিতে এ জবাবটি দেয়া হয়ে থাকতে পারে। দাড়ির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা হচ্ছে, দাড়ি রাখা সুন্নাত। অথচ প্রকৃত পক্ষে দাড়ি রাখা হচ্ছে ওয়াজিব। হাদিসে লম্বা দাড়ি রাখার জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর এবং দাড়ি লম্বা কর ও গোঁফ খাটো কর। (বুখারী শরীফ কিতাবুল লিবাস) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা গোঁফ কর্তন কর এবং দাড়ি নিচের দিকে ঝুলিয়ে অগ্নি পূজারীদের বিরোধীতা কর।(মুসলিম শরীফ পৃঃ ১২৯)এ সকল হাদিসে যেখানে জোরালো ভাবে দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছে কোয়ান্টাম এর বিপরীত জোরালো ভাবে তা মুন্ডনের যুক্তি পেশ করেছে। হাদিসের এ নির্দেশ অমান্য করে দাড়ি মুন্ডন বা এক মুষ্ঠির কমে কাটা হারাম ও কবিরা গোনাহ। তওবা না করলে সর্বক্ষণ এই কবিরা গোনাহতে লিপ্ত বলে ধর্তব্য হবে, শুধু মুণ্ডনকালীন নয়।
কিন্তু কোয়ান্টামের পক্ষে কি মুশরিক, অগ্নি পূজারীদের বিরোধীতা করে দাড়ি লম্বা রাখা আদৌ সম্ভব হবে? তাহলে তো সর্বধর্ম সমন্দয় দর্শনের তেলেসমাতিই ভেস্তে যাবে। তাই রাসূলের নির্দেশ পালনের চেয়ে সকলের মন জয় করা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বহ। এটাই কোয়ান্টামের বিজ্ঞান ও বিদ্যানের আসল চেহারা। যেখানে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ পালনকে ঈমানের অংশ নয় বলে, সুন্নাত ভেবে উপেক্ষা করা হয় আর মুনিঋষিদের বাণী, বুদ্ধের দর্শন ও নাস্তিক বিজ্ঞানীদের থিউরিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহন করা হয়। হাদীস শরীফে পরিস্কার বলা হয়েছে–
"আমি তোমাদের কারো কাছে তার পিতা মাতা, সন্তান সন্ততি এবং সকল মানুষের চেয়ে সর্বাধিক প্রিয়পাত্র না হলে সে মুমিন হতে পারবে না।" (বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৫)
তাই কোয়ান্টামের ভায়েরা ভেবে দেখুন! নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুহাব্বত বক্ষে ধারণ করে তার নির্দেশকে শিরোধার্য মনে করে দাড়ি লম্বা করবেন নাকি গুরুজীর অনুসরনে তা মুণ্ডনকে বৈধ মনে করবেন?

১২. বাই'আতঃ

দ্বীনে এলাহীতে দীক্ষা গ্রহণের সময় বাদশাহ আকবরের হাতে বাইআত হওয়ার প্রচলন ছিল। উক্ত বাইআতে চারটি বিষয়ের প্রত্যয়ন করানো হতো। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী

১/৬৮) অনুরূপ কোয়ান্টামের গুরু সকল ধর্মের লোককে বাইআত করান এবং বিশেষ প্রত্যয়ন পাঠ করান। সর্বধর্ম সমন্বয়ের এটি একটি উপযুক্ত হাতিয়ার। এ সকল দিক বিবেচনা করলে মনে হয় কোয়ান্টাম মেথড দ্বীনে এলাহীর নতুন সংস্করণ। তবে এখানে মৌলিক একটি তফাত লক্ষ্য করা যায়, আর তা হচ্ছে, দ্বীনে এলাহীতে সবচেয়ে বেশি হিন্দু ধর্মের আক্বীদা বিশ্বাস ও রিতি নীতি সংযোগ করা হয়েছিল। আর কোয়ান্টামে বৌদ্ধ ধর্মকে সর্বাধিক ফলো করা হয়েছে। কোয়ান্টামের উদ্দেশ্য যদি মানবতার কল্যাণ সাধন হয় তবে সর্বধর্ম সমন্বয়ের পরিবর্তে সকল ধর্মের লোক কে নিশ্চিত সফলতার রাজপথ ইসলামের দিকে আহবান করতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কুফর শিরিকে নিমজ্জিত মানব জাতির মুক্তির জন্য সকলকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে ছিলেন। যার যার ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করেননি। অথবা সকল ধর্মের সমন্বয়ে সহ অবস্থানের কথা বলেননি। তাই এ পথে কখনো সফল হওয়া যাবে না সুখী হওয়া যাবে না। পৌওলিক ও ইহুদী-খ্রিষ্টান সকলকে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ দরবারে আসার সুযোগ দিয়েছেন শুধু মাত্র তাদেরকে সত্যধর্ম ইসলামের প্রতি আহবান করার জন্য । সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য নয়। তৎকালীন সকল পরাশক্তিকে তিনি পত্র মারফত ইসলামের দাওয়াত দিয়ে ছিলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাবে সকলকে জানিয়ে দিয়ে ছিলেন যে সুখ-শান্তি সফলতা পেতে হলে ইসলাম গ্রহণের বিকল্প নেই। রোমের খ্রিষ্টান রাজা হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানো এ ধরণের একটি পত্রের বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আল্লাহর বান্দাও তাঁর রাসুল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস সমীপে। হিদায়াতের অনুসারীগণের প্রতি সালাম। পরসমাচারঃ আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে নিস্কৃতি লাভ করবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। কিন্তু যদি আপনি এতে অসম্মত হন, তবে আপনার প্রজাসাধারণের পাপের জন্যও আপনিই দায়ী হবেন। হে আহলে কিতাবীগণ এমন সত্যের দিকে আস, যাহার সত্যতা আমাদেরও তোমাদের নিকট সমভাবে স্বীকৃত। তা এই, আমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে মা'বূদ মনে করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। এবং আল্লাহকে ত্যাগ করে আমাদের মধ্য হতে কোন মানুষ অন্য কোন মানুষকে প্রভু বানিয়ে নিব না। যদি তোমরা অমান্য কর, তবে তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা এটা মান্য করছি। (বুখারী শরীফ হাদিস নং-১৩৮৭)

উক্ত পত্রের বক্তব্যের মাঝে কোনো গোজামিল নেই। যার যার ধর্ম পালনের কথাও নেই। বরং স্পষ্টভাবে ইসলাম গ্রহণের আহবান রয়েছে। মানবতার মুক্তির সনদ একমাত্র ইসলাম। অতএব কোয়ান্টামের উচিত সকল ধর্মের তোসামোদী না করে একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা যে, সফল হতে হলে সবধর্ম ছেড়ে সত্য ধর্ম ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ জরুরী।

কোয়ান্টাম মেথড-৯

বৌদ্ধ প্রীতির নমুনা

মুফতী শরীফুল আ'জম

যদিও কোয়ান্টাম সকল ধর্মের লোকদের আকৃষ্ট করতে প্রত্যেক ধর্মের কিছু কিছু বিষয় গ্রহণ করেছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে ধর্মের প্রতিচ্ছবি ও প্রভাব কোয়ান্টামে প্রস্ফুটিত হয় তা হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধ ধর্ম। আবির্ভাব, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও ধ্যান ধারণার ব্যাপক মিল লক্ষ্য করা যায় এতদুভয়ের মাঝে।

প্রবর্তন:

বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর প্রবর্তক হলেন গৌতমবুদ্ধ। পিতা শুদ্ধোদন শ্যাক্যবংশের প্রধান বা রাজা ছিলেন। গৌতম রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও বাল্যকাল থেকে তিনি চিন্তাশীল ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৫৯৪ অব্দের এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তীথির গভীর রাতে উনত্রিশ বৎসর বয়সে গৌতম চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে সত্যান্বেষণে বের হন। প্রথমে তিনি তৎকালীন সুবিখ্যাত মুনি ও ঋষি আলারা ও পরবর্তিতে উদ্দকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মুক্তির পথ সন্ধান করেন। কিন্তু কারো কাছ থেকে দুঃখের রহস্য উদঘাটন তথা মুক্তির সন্ধান না পেয়ে পাঁচজন সন্ন্যাসীকে সাথে নিয়ে নির্জন জঙ্গলে কঠোর কৃচ্ছ সাধনে ছয় বৎসর তপস্যা চালান। কিন্তু তাতে নিষ্ফল হন। তখন গৌতম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মধ্যম পন্থায় সাধনার উদ্দেশ্যে গয়ার নিকটবর্তী উরবিল্ব নামক গ্রামে চলে আসেন। সেখানে নৈরাঞ্জনা নদীর তীরে অশ্বত্থবৃক্ষ তলে দুঃখের রহস্য সন্ধানে পূণরায় ধ্যানমগ্ন হন। অবশেষে প্রায় পঞ্চাশ দিন পর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির শেষ রাত্রে তিনি বোধি বা চরম জ্ঞান লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধ মানব জীবন নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগত 'সব্বং দুঃখময়' অর্থাৎ জগত দুঃখময়। এই দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং দুঃখের কার্যকারণ ও প্রতিকারের সন্ধান পেয়েছিলেন।(ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৬৮১-৬৮৩)

এই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তনের ইতিহাস। কোয়ান্টাম মেথড প্রবর্তনের ইতিহাসও ঠিক একই ভাবে সাজানো হয়েছে। দুঃখের প্রতিকার করতেই কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম শেষে সন্ধান পাওয়া গেছে এই কোয়ান্টাম মেথডের। কোয়ান্টামের গুরুর কাছে করা এ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রশ্ন: আমরা জানি আপনি এক সময় সাংবাদিকতা করতেন। তারপর এস্ট্রলজি (রাশি চর্চা) করেছেন। সেসব ছেড়ে আপনি কেন কোয়ান্টামে এলেন?

উত্তর: আমি কেন কোয়ান্টামে? হ্যাঁ। এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন এবং এর উত্তর ও আমার কাছে সুস্পষ্ট। তবে উত্তর দেয়ার আগে একটু প্রেক্ষাপট বলা দরকার। প্রথমে বলি সাংবাদিকতায় কিভাবে এলাম? তারুণ্যে যখন মানুষের দুঃখ কষ্ট অভাব বঞ্চনা দেখেছি, মনে হয়েছিল এ দুঃখের কথা, কষ্টের কথা যদি লেখা যায় তাহলে কিছু একটা হবে। শুরু করলাম রিপোর্টারের কাজ।... কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বুঝলাম বাইরে থেকে যাই মনে হোক, একজন সাংবাদিকের স্বাধীনতা আসলে খুব সীমিত। তাকে লিখতে হয় পত্রিকার মালিকের ইচ্ছানুসারে, সত্য জানাতে চাইলেও জানানো যায় না। সিদ্ধান্ত নিলাম সাংবাদিকতা ছেড়ে দেবো। ...এস্ট্রলজির প্রতি আগ্রহ ছিলো। এই শখকেই পেশা হিসেবে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।কারণ মনে হলো, একজন মানুষকে যদি ভালো পরামর্শ দেয়া যায়। একটা গাইডলাইন দেয়া যায় তাহলে তার দুঃখটাকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন বা তাকে যদি সতর্ক করে দেয়া যায়, তাহলে দুঃখ থেকে তিনি হয়তো দূরে থাকতে পারবেন।... তবে একজন এস্ট্রলজার হিসেবে আমার সীমাবদ্ধতা ছিলো।...দুঃখ বলতে পারছি, কিন্তু দুঃখের কোন সমাধান দিতে পারছিনা। প্রতিকার করতে পারছিনা। এই অতৃপ্তি ছিলো, দুঃখবোধ ছিলো। আর যেহেতু ধ্যান মেডিটেশনের সাথে তারুন্যেই পরিচয় ছিলো, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ...মেডিটেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে তার ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে বিপন্ন অবস্থা থেকে তাকে মুক্ত করা সম্ভব। বুঝলাম তার ভেতরের শক্তির জাগরণ ঘটিয়েই তার দুঃখকে আনন্দে, রোগকে সুস্থতায়, ব্যার্থতাকে সাফল্যে, আর অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করা যাবে। যখন বুঝলাম তখন আর সময় নেইনি। যেভাবে সাংবাদিকতা ছেড়ে ছিলাম, তেমনি এস্ট্রলজি ছেড়ে কোয়ান্টামে নিজেকে সঁপে দিলাম। ...আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটাচ্ছি এখন।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব, মহাজাতক ১/৪২৯-৩১)

বোঝাগেলো মানুষকে দুঃখ মুক্ত করতে প্রথমে সাংবাদিকতা তার পর জ্যোতিষী অবশেষে মেডিটেশনের পথ অবলম্বন করে কোয়ান্টাম মেথড উদ্ভাবন করা হয়। এই একই লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিলের

জন্য গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন ।অথচ মানব মুক্তির পথ মানব বুদ্ধি বলে উদ্ভাবন সম্ভব নয়। মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে এত্তেবায়ে সুন্নাত তথা মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শের অনুসরণ। মনে প্রাণে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হলে মুক্তির জন্যে অন্য কোন মেথড বা জীবনদৃষ্টি উদ্ভাবন করার প্রয়োজন হবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"(সুরা আল-আহযাব-২১)

বৌদ্ধ ধর্মে আল্লাহ তা'আলা বা শেষ দিবসের কোনো ধারণা নেই। তারা নাস্তিক এবং পরকালে অবিশ্বাসী। তাই তারা মুক্তি পেতে নবীজী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ ভিন্ন বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করে। কিন্তু যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা সফলতা ও মুক্তির পথ হিসেবে নবীজীর আদর্শ অনুসরণ করবে না কি কোয়ান্টামের? চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে। আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত থেকে সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে– "মুমিনদের বক্তব্য কেবল একথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।" (সূরা আন্নুর-৫১) আলোচ্য আয়াতটি বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ বিবাদ ছিল। ইহুদী তাকে বলল, চল তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মিমাংসা করিয়ে নেই। মুনাফিক বিশর ছিল অন্যায়ের উপর। সে জানত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এজলাসে মুকাদ্দামা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবর্তে কা'আব ইবনে আশরাফ ইহুদীর কাছে মুকাদ্দামা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

অতএব, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ বাদে অন্য কোনো মেথড বা জীবন দৃষ্টির মাঝে সফলতা ও মুক্তির পথ খোঁজা মুমিনের কাজ হতে পারে না। মুমিন তো সর্বাবস্থায় তার সকল সমস্যার সমাধান নবীজী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত দ্বীনে ইসলামের মাঝে সন্ধান করবে।

মূল উৎস:

গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগত ও জীবন সম্পর্কে যে নীতি, বিধানও মতবাদ গড়ে উঠেছে তাই 'বৌদ্ধদর্শন' বা 'বৌদ্ধধর্ম'। বুদ্ধের উপদেশবাণী ও চিন্তাধারাই বৌদ্ধ দর্শনের উৎস ও ভিত্তি। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৬৮১)

ওহী বা ঐশী বাণীর সাথে এধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। একজন মানবের বিবেক প্রসূত সফলতার সূত্রসমূহ এখানে মেনে চলা হয়।

কোয়ান্টাম মেথডের অবস্থাও তাই। মহাজাতক কর্তৃক উদ্ভাবিত জীবনদৃষ্টি, চিন্তা-ধারা, উপদেশ ও বাণীসমূহই এই মেথডের উৎস ও ভিত্তি। নির্দিষ্ট কোনো ধর্মগ্রন্থের অনুসরণ কোয়ান্টামে করা হয় না। বরং সকল ধর্মের নির্যাস নিজের বুদ্ধিতে আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের লেভেল লাগিয়ে চালানোর পন্থা গ্রহণ করা হয়। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস- ১৪৩)

পরকাল:

বুদ্ধের বাণী ও দর্শনসমূহ জগত ও জীবন কেন্দ্রিক ছিল, যেখানে জগতের দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। আখেরাত বা পরকালের কোন আলোচনা সেখানে নেই। পরকালের মুক্তি বা দুঃখ লাঘব কি করে হবে? তা ওই দর্শনে স্থান পায়নি।

কোয়ান্টাম মেথডের অবস্থাও তাই। "সাফল্যের চাবিকাঠী কোয়ান্টাম মেথড"বই এর কভারের শেষ পৃষ্ঠায় মহাজাতকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে;" জাগতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্য জীবন যাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথড এর উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক" ।অর্থাৎ এখানে শুধু জাগতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের টেকনিক নিয়ে আলোচনা হয়। এখানে আখেরাতের ধ্যান-ধারণা বা সমস্যা সমাধানের কোন আলোচনা নেই। এক প্রবন্ধে মহাজাতক লিখেন "একটাই তো জীবন। সুখ সাফল্য আনন্দ খ্যাতি পার্থিব বা আত্মিক যা কিছু অর্জন তা তো এই এক জীবনেরই ফসল।" (কো.উ.-৬) আখেরাতের বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির পক্ষে একটাই তো জীবন এমন বক্তব্য দেয়ার কোন অবকাশ কি আছে? বরং পার্থিব এ জীবনের পর আখেরাতের আরেক জীবন সামনে রয়েছে আর সেটাই চিরস্থায়ী ও আসল জীবন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক বৈ তো কিছু নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত" ।(সুরা আল- আনকাবুত–৬৪)

হ্যাঁ, অবিশ্বাসী তথা কাফেররা পরকাল বিশ্বাস করে না। তারা বলে, "আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা

পুনরুত্থিত হবো না।" (সূরা আল-মুমিনুন-৩৭) অর্থাৎ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই অংশ এবং পরকালের জীবন বলতে কোনো কথা নেই। কেয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের বিশ্বাসও তাই।

কোয়ান্টাম মেথডও মুক্ত বিশ্বাসের নামে বিভিন্ন কথা ও কাজের মাধ্যমে এই কুফরী বিশ্বাসই মুসলমানদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। কোয়ান্টামের মতে পার্থিব বা আত্মিক অর্জনের জন্যই এ জীবন, আখেরাতের জন্য নয়। অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?" (সূরা আল-মুলক-০২) হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াত তেলাওয়াত করতঃ احسن عملا পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী যে আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত বিষয়াদী থেকে সর্বাধিক বেচে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার জন্য সদাসর্বদা উম্মুখ হয়ে থাকে। (কুরতুবী)

মোট কথা, বৌদ্ধ ধর্ম যেমন শুধু জগত ও জীবনের সমাধান দেয়, আখেরাত বাদ। অনুরূপ কোয়ান্টামও শুধু জাগতিক ও মানবিক সমস্যার সমাধান দেয়, আখেরাত বাদ।

দুঃখের কারণ:

বুদ্ধের দর্শন মতে জগতে দুঃখের কারণ মোট ১২ টি। তন্মধ্যে অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা বা আসক্তি উল্লেখযোগ্য। এই দ্বাদশ নিদানকে সংক্ষেপে লোভ, দ্বেষ ও মোহ রূপেও চিহ্নিত করা হয়। (ইস.আ.ভ্রা.-৬৮৪) কোয়ান্টামও এ ব্যাপারে একমত এবং ওই সকল পরিভাষাই হুবহু কোয়ান্টামে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অবিদ্যা:

যেমন অবিদ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে; "সকল ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর তথ্য, ধারণা, সংস্কার ও বিশ্বাসের নামই অবিদ্যা। আর এ অবিদ্যাই মানবজীবনের অশান্তির মূল কারণ।" (কো. কণিকা-১৬)

"লালসা কামনা বাসনা আসক্তি লোভ দ্বেষ মোহের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা।... সকল অশান্তির মূল যেমন অবিদ্যা, সকল অকল্যাণের মূলও অবিদ্যা।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব-১/২৮৪)

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর তথ্য বা ধারণার সংজ্ঞা ঠিক করার মাপকাঠি কি হবে? বুদ্ধের দর্শন, কোয়ান্টাম মেথড নাকি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ? যেমন ধরুন; ইসলাম গান-বাদ্য ও পর্দাহীনতাকে হারাম বলে। আর কোয়ান্টাম তাদের মিউজিক ও বেপর্দা নারী-পুরুষের মেলাকে হালাল বলে। এগুলো তাদের মতে অবিদ্যা নয়। (হাজারো প্রশ্নের জবাব-১/৫১,১/২৯০) এখন কার কথা সঠিক? কোয়ান্টিয়ার ভায়েরা উত্তর দিন।

সংস্কার:

বৌদ্ধ ধর্ম মতে দুঃখের অন্যতম কার্যকারণ 'সংস্কার' প্রসঙ্গে কোয়ান্টাম বলে– "ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের শৃঙ্খলমুক্তির পথ মেডিটেশন"। এবং "ভ্রান্ত ধারনা ও সংস্কারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত বিশ্বাসে উপনীত হওয়াটাই হচ্ছে মানুষের আসল স্বাধীনতা।"(কোয়ান্টাম কণিকা-১৫-১৬)

আসক্তি:

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণে নির্ধারিত দুঃখের অন্যতম কার্যকারণ 'তৃষ্ণা' বা 'আসক্তি' প্রসঙ্গে কোয়ান্টামের অভিন্ন বক্তব্য হচ্ছে- "চাওয়া যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন সেটা আসক্তি। দুঃখের প্রধান কারণ এই আসক্তি।" (কোয়ান্টাম কণিকা ১৮, হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৩০৯)

উত্তরণের পথ:

বৌদ্ধ ধর্ম মতে দুঃখের যে ১২ টি কারণ রয়েছে এগুলো হচ্ছে দুঃখের একেকটি শৃঙ্খল। এসকল শৃঙ্খল গুলো ছিন্ন করতে পারলেই দুঃখ দূর হয়ে যাবে। আর ছিন্ন করার পদ্ধতিই হলো বুদ্ধের সমগ্র ধর্ম দর্শনের মূল শিক্ষা। যার সারকথা হলো শৃঙ্খলা। অর্থাৎ দুঃখের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে শৃঙ্খলা। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ.-৬৮৩-৬৮৪)

কোয়ান্টামের বিভিন্ন বই পুস্তকেও একথা বারবার আলোচিত হয়েছে এবং শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খল মুক্তির নানান কৌশল নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। কোয়ান্টামের কয়েকটি সূত্র এখানে তুলে ধরা হলো। "শৃঙ্খলাই শৃঙ্খল মুক্তির পথ"।"বিশ্বাস শৃঙ্খল মুক্ত করে আর গোঁড়ামী শৃঙ্খলিত করে"।"কাম শৃঙ্খলিত করে আর প্রেম জীবনকে শৃঙ্খল মুক্ত করে"। "মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে কেউ তার শৃঙ্খলকে ভাঙতে পারে"। "ভ্রান্তধারণা ও সংস্কারের শৃঙখল মুক্তির পথ মেডিটেশন।" (কোয়ান্টাম কনিকা-১৬)

বৌদ্ধ ধর্ম মতে সাধনার মাধ্যমে এই শৃঙ্খলা আয়ত্ব করতে পারলেই শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করা যাবে। অনুরূপ কোয়ান্টাম ও মেডিটেশনকে শৃঙ্খল মুক্তির সাধনা নির্বাচন করেছে। মেডিটেশনের মাধ্যমেই দুঃখ জয় ও সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

নির্বাণ লাভ :

বুদ্ধের উদ্ভাবিত ধর্ম দর্শনে নির্বাণ তথা অস্তিত্ব হতে মুক্তি লাভ করাই হচ্ছে একজন ধার্মিক মানুষের মূল চাওয়া-পাওয়া। তাদের সকল সাধনা আরাধনা মূলত এই নির্বাণের উদ্দেশ্যে

হয়ে থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম মতে দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু, জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কোন কথা নেই। আছে নির্বাণ লাভ অথবা পূণরপূণর জন্মলাভ করে জগতের দুঃখে নিপতিত হওয়া। তাই যে ভালো কাজ করবে সে দুনিয়ায় পূণর্জন্ম গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে এবং নির্বাণ লাভ করবে। আর অসৎ কাজ করলে এ দুনিয়ায় পূণর্জন্ম গ্রহণের মাধ্যমে জগতের দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত হবে। নির্বাণ বলতে বৌদ্ধরা মূলত পূণর্জন্মের নিরোধ হওয়া, তৃষ্ণা,ক্ষয়, রাগ,দ্বেষ ও মোহ এবং সর্বপ্রকার বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করাকে বোঝায়। নির্বাণ চিত্তের এমন এক অবস্থা, যা সব উপাধি বর্জিত ও সর্ব সংস্কার মুক্ত। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৬৫৮)

কোয়ান্টামও এই একই দর্শনের প্রচারণা চালাচ্ছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাষাটা কিছু কিছু পরিবর্তন করে নির্বাণ লাভের প্রক্রিয়া রপ্ত করার প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। জান্নাত লাভ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে এখানে কোন আলোচনা নেই। নির্বাণ বলতে বৌদ্ধরা যা বোঝায় কোয়ান্টামের ব্যাখ্যাও তাই, শুধু ভাষাটা আলাদা। নির্বাণ শব্দের স্থলে তারা 'স্বাধীনতা', 'প্রকৃতির সাথে একাত্মতা', 'নিজেকে লীন করা' কিংবা 'মহাচেতনায় মিশে যাওয়া' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। যেমন বলা হয়েছে– "ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত বিশ্বাসে উপণীত হওয়াটাই হচ্ছে মানুষের আসল স্বাধীনতা।"(কোয়ান্টাম কনিকা-১৬) আসল স্বাধীনতা তথা নির্বান লাভ, যা ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের মত দুঃখের শৃঙ্খল হতে মুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। কোয়ান্টামের সাধনার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে এই স্বাধীনতা, মহাচেতনায় মিশে যাওয়া, প্রকৃতির সাথে এক হয়ে নিজের অস্তিত্বকে লীন করা। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হচ্ছে। শিথিলায়নের (ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি) অনুশীলনের এক পর্যায়ে বলা হয়েছে– "অনুভব করুন দেহের জৈব কোষগুলো আর জৈব কোষ নেই, পরিনত হয়েছে বালু কণায়। অনুভব করুন আপনার সারা দেহ এখন বালু কণায় পরিণত হয়েছে। এবার অনুভব ও অবলোকন করুন আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে বালুকণাগুলো ঝরে পড়তে শুরু করেছে। আঙ্গুল, হাত,পা, বুক, পেট, উরু, সব বালুর মত ঝড়ে ঝড়ে পড়ে যাচ্ছে। আপনি পরিণত হচ্ছেন এক বালুর স্তুপে। এখন আপনি অনুভব করুন উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে।বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। বাতাস ঝড়ের রূপ নিচ্ছে আর ঝড় আপনার শরীরে অবশিষ্টাংশ হিসেবে যে বালু কণাগুলো রয়েছে তা উড়িয়ে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আপনার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। আপনার বলতে এখন রয়েছে শুধু আপনার চেতনা, আপনার মন। আপনি এখন পরিপূর্ণ শিথিল।" (সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড -৫৯)

নির্বাণের এই অনুশীলনের নাম কোয়ান্টাম রেখেছে শিথিলায়ন। নির্বাণ আর শিথিল হওয়াটা যেন একই অনুভূতির নাম। যেখানে দেহের অস্তিত্ব প্রকৃতির সাথে মিশে লিন হয়ে যাবে আর রবে শুধু চেতনাও মন।

এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম ধ্যানের প্রাথমিক অনুভূতি, এর চেয়ে আরো গভীর স্তরের ধ্যান হচ্ছে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার মেডিটেশন। যেখানে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় নিজের চেতনাকে লীন করে, এ্যালোমিনিয়াম, তামা, পিতল, ইস্পাত, চুম্বক, সীসা, রাবার ইত্যাদি ধাতুর দেয়াল ভেদ করার কল্পনা করা হয়। বিভিন্ন লতা-পাতা, ফল, ফুল, গাছ-পালা, গ্রহ-তারা, সাত সমুদ্র ও প্রকৃতিক দৃশ্যের মাঝে নিজেকে মিটিয়ে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার অনুশীলন করানো হয়। অবশেষে একথা কল্পনা করতে বলা হয়। "আপনি এবার পরিপূর্ণভাবে অনুভব করুন, আপনি যত ক্ষুদ্রই হোন, এখন প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছেন। আপনি প্রকৃতির শক্তির সাথে একীভূত হয়েছেন। আপনার চেতনা মিশেগেছে মহাচেতনার সাথে। তাই আপনার যে কোনো সমস্যাই থাকনা কেন, তা এখন আর আপনার সমস্যা নয়, পরিণত হয়েছে প্রকৃতির সমস্যায়।আর তা সমাধানের দায়িত্ব শুধু আপনার চেতনার উপরই বর্তায় না, বর্তায় মহাচেতনার উপর। আপনি মহাচেতনার হাতে ফলাফলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে নিজের কাজ করে যান। কাজের ফলাফল ও সাফল্যে আপনি চমৎকৃত হবেন।" (কোয়ামন্টাম মেথড ১৯৭-২০০)

অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে মিশে একাত্ম হতে পারলে সব সমস্যার সমাধান প্রকৃতিই করে দিবে। (নাউযুবিল্লাহ) বৌদ্ধ ধর্মের নির্বান লাভের বাস্তবতাও তাই। নির্বান লাভ করে অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হতে পারলে প্রকৃতির সাথে মিশে একাকার হতে পারলে সকল দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, বান্দা ফরজ এবাদতের পর নফল এবাদত বন্দেগী করতে করতে আল্লাহ পাকের এত নৈকট্য লাভ করে যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার থাকে না আল্লাহর হয়ে যায়। অর্থাৎ সে ফানাফিল্লাহর স্তরে পৌঁছে যায়। তখন তার সকল ইচ্ছা আল্লাহর অধিনে পরিচালিত হতে থাকে। আর তার সকল চাওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে পূরণ হতে থাকে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৫০১)

কোয়ান্টাম হাদীস নির্দেশিত ফানা

ফিল্লাহর পরিবর্তে প্রকৃতির মাঝে ফানা হয়ে যাওয়ার অনুশীলন করাচ্ছে। আর মানুষকে প্রকৃতির অধিনে সঁপে দিচ্ছে। সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে পাওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতির কাছ থেকে কামনা করছে। এধরণের মেডিটেশনের অনুশীলন শিরক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে কি?

একটি বিভ্রান্তির জবাব:

প্রকৃতি পূজার পক্ষে সাফাই গেয়ে কোয়ান্টাম প্রশ্ন-উত্তর আকারে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে।

প্রশ্ন: প্রকৃতির সাথে একাত্মতা মেডিটেশনে বলা হয় যে, এখন থেকে কোন সমস্যাই আপনার সমস্যা নয়। এখন প্রকৃতিই আপনার সমস্যা সমাধান করবে। কিন্তু সকল সমস্যা সমাধান তো করবেন আল্লাহ। প্রকৃতি কীভাবে আমার সমস্যা সমাধান করবে?

উত্তর: এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন। আমরা এখানে যে প্রকৃতির নেপথ্য স্পন্দনের কথা বলছি তা একটু বোঝার চেষ্টা করি। আসলে প্রকৃতি কার সৃষ্টি? কে চালান প্রকৃতি? উত্তর হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তিনি প্রকৃতি যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন প্রাকৃতিক নিয়ম, যে নিয়মে প্রতিটি কাজ সম্পাদিত হয়। (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/২২৩)

কোয়ান্টামের এই উত্তরটা খোঁড়া যুক্তি ও শিরকের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। উত্তরের সার কথা হলো প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহ পাক এবং এর মাধ্যমে মানুষের সমস্যা সমাধান করা আল্লাহর নিয়ম। তাই প্রকৃতির কাছে সমস্যার সমাধান কামনা বৈধ। অথচ সাধারণ বিবেকের কথা হলো প্রকৃতি নিজেই যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি তাই সকলের স্রষ্টা মহান আল্লাহর কাছে চাইলেই তো হয়, প্রকৃতির কাছে চাওয়ার কি প্রয়োজন? রাজা তার কার্যাদী উজির-নাযিরের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকেন এটাই সাধারণ নিয়ম। তাই বলে কি রাজার পরিবর্তে উজিরের বরাবর দরখাস্ত লিখা, উজিরের কাছে নিজেকে সমর্পন করা বৈধ হবে? এটাকেই বলে শিরক। মুশরিকগণ সকলেই আল্লাহ পাকের উপর ঈমান রাখে তাকে স্রষ্টা মনে করে, কিন্তু তার সাথে অন্যান্যদের শরীক সাব্যস্ত করে তাদের পূজা করে বলে তারা মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়। তদ্রুপ প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহ পাক একথা বলে আবার সেই সৃষ্ট বস্তুর কাছে সমস্যা সমাধান কামনা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। সমস্যা সমাধান তো করবেন একমাত্র আল্লাহ পাক, চাই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী করুন বা ব্যতিক্রম কোন পন্থায়। তাই সমাধান কামনা করতে হবে একমাত্র তাঁরই কাছে। গাছ-পালা, লতা-পাতা বা কোন ধরণের মাখলুকের কাছে সমাধান কামনা ও তার সাথে একাত্ম হওয়ার মেডিটেশন নিঃসন্দেহে শিরক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "তিনিই সে মহান আল্লাহ যিনি তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-বাক্বারা-২৯) অর্থাৎ কুল মাখলুকাত মানুষের সেবক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। আর মানুষদের নিয়োজিত করা হয়েছে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। এসকল সেবকের সেবা গ্রহণ করে স্রষ্টার সকল হুকুম-আহকাম পালন করার মাধ্যমে আখেরাতের তৈয়ারী করাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে তাঁর সকল বিধি-বিধানের সামনে নিজেকে সঁপে দেয়াই হচ্ছে মানুষের আসল সফলতা। তাই প্রকৃতির মাঝে নিজেকে লীন না করে প্রকৃতির স্রষ্টার মাঝে নিজেকে লীন করতে হবে। এর বিপরীত প্রকৃতির সাথে একাত্মের অনুশীলন অপাত্রে কৃতজ্ঞতার সমতুল্য। যেমন, কেউ যদি মানি অর্ডার পেয়ে ডাক পিয়নের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়, তার গুণ কীর্তনে মুখর হয় আর টাকা প্রেরকের কথা ভুলে যায় তবে সে কৃতঘ্ন হিসেবে গণ্য হবে। অনুরুপ প্রকৃতির স্রষ্টার কথা ভুলে গিয়ে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে সকল সমস্যার সমাধান প্রকৃতির কাছে কামনা করাও আল্লাহর নাফরমানী হিসেবে ধর্তব্য হবে। অতএব আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে সকল সমস্যা প্রকৃতির মাধ্যমে সমাধান করার অনুশীলন করতে পারে না। বৌদ্ধরা যেহেতু আল্লাহ ও আখেরাতের বিশ্বাসী নয় তাই তারাই প্রকৃতি পূজার এ পদ্ধতী উদ্ভাবন করে ও এর অনুশীলন করে থাকে। মুমিন মুসলমান হতে হলে সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে হওয়ার বিশ্বাস রাখতে হবে, কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাস অনুসারে প্রকৃতির কাছ থেকে নয়।

মোট কথা, বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে দুঃখ জয় করা। দুঃখের কারণসমূহের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তি লাভ করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তাদের ধর্মের সকল সাধনা-আরাধনা প্রবর্তিত হয়েছে ও চর্চিত হয়ে আসছে। কোয়ান্টাম মেথড ও সেই একই পথে হেটে চলছে শুধু ভাষাটা আধুনিক। এবং দুঃখ জয়ের জন্যে শৃঙ্খল ভঙ্গের বিভিন্ন টেকনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। যেহেতু বর্তমান যুগটা বিজ্ঞানের যুগ বলে প্রসিদ্ধ তাই কোয়ান্টাম বৌদ্ধ ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সজ্জিত করে কিছুটা চমক সৃষ্টি করে নিজেকে এর উদ্ভাবক হিসেবে জাহির করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে কোয়ান্টামকে বৌদ্ধ ধর্মের আধুনিক মডেল বলে মনে হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। ঈমান বিধ্বংসী এই মেথড থেকে আল্লাহ পাক সকলকে রক্ষা করুন।

কোয়ান্টাম মেথড-১০

তথাকথিত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

মুফতী শরীফুল আ'জম

জীবন দান করেছেন যিনি সেই মহান স্রষ্টা জীবন পরিচালনার বিধান ও দান করেছেন আর এটা একমাত্র তাঁরই অধিকার। সেই বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হলে মানবজীবন হবে সফল ও আলোকিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- ان الحكم الا لله আল্লাহর ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই।(সুরা ইউসুফ-৪০)

আল্লাহ তা'আলা যেমন মহান ও প্রজ্ঞাময় তাঁর দেয়া বিধান ও তেমন নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের বিধান দেয়া হয়েছে তা ঐ যুগের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ছিল এবং সর্বপ্রকার যুগ চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল। আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের যুগ যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত ও স্থায়ী তাই তাঁর আনীত জীবনবিধান ও পূর্ণাঙ্গ রূপে কেয়ামত অবধি বাকি থাকবে এবং সকল প্রকার যুগ চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। এ মহা সত্যকে পাশ কাটিয়ে কোয়ান্টাম মেথড নিজেদের উদ্ভাসিত মতবাদকে কৌশলে পূর্ণাঙ্গ জীবন দৃষ্টি আখ্যা দিয়েছে। আর ইসলামের অমোঘ জীবন বিধানকে অর্ধাঙ্গ অপূর্ণাঙ্গ বলার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে গেছে। তাদের এমন অসত্য ও কৌশলী বক্তব্য শুনে আধুনিক মানুষ নিজেদের অজান্তে ঈমানের মতো দৌলত হারিয়ে নিস্ব হতে চলছে। সেক্যুলার দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ধর্মীয় দৈন্যতার সুযোগে তারা ঈমানবিনাসী এই মেথড হজম করাতে সক্ষম হচ্ছে। কোয়ান্টামের ৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক "কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস" -এর এক প্রবন্ধে লেখা হচ্ছে– সুস্থ, সুন্দর ও স্বার্থক জীবনের জন্য প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি। সমকালীন মানুষের মূল সমস্যা এখানেই। সকল চিন্তা এক দেশদর্শিতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। একজন অ্যাকাউনট্যান্ট মনে করেন হিসাববিজ্ঞান দিয়েই তিনি সকল সমস্যার সমাধান করবেন। প্রকৌশলী মনে করেন তার প্রযুক্তি জ্ঞানই জীবনের সমস্যা সমাধান করবে। চিকিৎসক মনে করেন ওষুধ খেলে বা অপারেশন করলেই শরীরের সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আমলা মনে করেন সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি তারই হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশেষ কোনো বিষয়ে ডক্টরেট করে মনে করেন পৃথিবীর সকল জ্ঞান তার আয়ত্তে চলে এসেছে। একজন আলেম– "পুরোহিত মনে করেন ধর্মাচারই সব সমস্যার সমাধান করবে। একজন তরুণ বা তরুণী মনে করে বহুজাতিক কোম্পানির একটা চাকরি পেলে জীবনের সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু স্বার্থক ও পরিতৃপ্ত জীবন আর এই ভাবনাগুলোর মধ্যে ব্যবধান এক সমুদ্রের" । (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-১৪৩)

কী চমৎকারভাবে এখানে বিভিন্ন পেশাজীবীদের ভাবনার সাথে একজন আলেমের কথাকে একাকার করে ফেলা হয়েছে। এ সকল পেশাজীবীদের আবিষ্কৃত দর্শন আর একজন আলেমের দেয়া ধর্মীয় দিকনির্দেশনা যেন এক পাল্লায় মাপার বস্তু। ভাবখানা এমনই। অথচ মানবজীবনের সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পেশার লোক কর্তৃক প্রদত্ত থিউরি আর কোনো আলেমের বাতলানো ধর্ম ব্যাখ্যা কখনো এক হতে পারে না। দুনিয়াতে নানা পেশার লোক মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের আবিষ্কৃত মতের সফলতার দাবি করছে ঠিকই কিন্তু কেহ নিজেকে পূর্ণাঙ্গ জীবন চাহিদা মেটাবার যোগ্য বলে ঘোষণা করছে না। পক্ষান্তরে একজন আলেম জীবন যাপনের যে সকল বিধান কর্ম পন্থাও আদর্শের প্রচার করে থাকেন তা হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত ও নির্ধারিত জীবন বিধান ইসলাম। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে যার অনুসরণ মানব জাতীর সফলতার জন্য অবধারিত। জীবনের সকল দিক নিয়ে যেখানে কল্যাণকর ও পূঙখানোপূঙখ দিকনির্দেশনা ও বিধি-বিধান প্রদান করা হয়েছে। সফলতার জন্য একজন আলেম মূলত পূর্ণাঙ্গ এই জীবনব্যবস্থা ইসলাম প্রতিপালনের কথাই বলে থাকেন। তাই অ্যাকাউনট্যান্ট, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, আমলা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো পেশাজীবীদের সমস্যা সমাধানের ভাবনার সাথে ইসলাম প্রদত্ত জীবন বিধানকে তুলনা করা ভুল। সমস্যা সমাধানে ইসলামকে যথেষ্ট মনে করা না হলে ঈমান থাকবে না। কোয়ান্টামের উক্ত প্রবন্ধের মাঝে পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি হিসেবে নিজেদের উদ্ভাবিত মেথডকে উপস্থাপন করা হয়েছে আর ইসলামকে বিভিন্ন পেশাজীবদের ভাবনার মতো একটি অর্ধাঙ্গ ভাবনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। অথচ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মেথডকে সফলতার চাবিকাঠি মনে করা হলে এর পরিণতি কী হবে, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে- "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"(সুরা আলে ইমরান-৮৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে শেষ

নবীর আবির্ভাবের পর একমাত্র তাঁর আনীত ধর্মকেই ইসলাম বলা হবে। এ ধর্মই বিশ্ববাসীর মুক্তির উপায়। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন) এখানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনদৃষ্টি গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ তা পালন করলে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাফসীরে কাবীরে আখেরাতে ক্ষতির বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে। ঐ ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দুনিয়াতে যে কষ্ট-ক্লেশ করেছে এর উপর আফসোস ও আক্ষেপ করার যন্ত্রণাও আখেরাতে ভোগ করতে হবে। (তাফসীরে কাবীর ৮/১১৬)

ইসলামকে সফলতা প্রাপ্তির পূর্ণাঙ্গ বিধান না ভেবে এর যাবতীয় বিধিবিধানকে শুধু ইবাদাত বন্দেগীর মাঝে সীমাবদ্ধ মনে করা বা মসজিদের চার দেয়ালে একে বন্দি করার ফন্দি করা হলে সাফল্যের চাবিকাঠি কখনো হাতে আসবে না। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ইসলামকে পূর্ণ অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"(সুরা আল বাকারা-২৮)

আয়াতটির দুভাবে তাফসীর করা হয়েছে। এক. তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা চোখ-কান, মন-মস্তিক সবকিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়। এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ অথচ তোমাদের মন-মস্তিস্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিস্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে কিন্তু হাত-পা'সহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে। দুই. তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদাতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক অথবা রাজনীতির সাথে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে, ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। উভয় তাফসীরের মূল প্রতিপাদ্য মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ তা মানবজীবনের যেকোনো বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

সতর্কতা : যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদাতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠিন সতর্কতাবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দ্বীনদারদের মধ্যেই এই ত্রুটি বেশিরভাগ দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন আচার-আচরণ বিশেষত: সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয় এরা যেন এসব রীতিনীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে-শিখতেও যেমন এদের কোনো আগ্রহ নেই তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোনো আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ, অন্ততপক্ষে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) রচিত "আদাবে মু'আশারাত" পুস্তিকাটি পড়ে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন)

তাই সফলতার সন্ধানে কোয়ান্টামের দ্বারস্থ না হয়ে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসরণই হবে একজন বুদ্ধিমান আদম সন্তানের কর্তব্য। যে রূপ পূর্ণাঙ্গ, কল্যাণমুখী, বাস্তবসম্মত সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উভয় জাহানের কামিয়াবীর জন্য প্রণয়ন করেছেন, অন্যকারো পক্ষে তা উদ্ভাবন সম্ভব নয়। অতএব কোয়ান্টাম চর্চার পরিবর্তে ইসলাম চর্চাই সকল ধর্মের লোকদের সফলতার একমাত্র রাজপথ।

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে কোয়ান্টামের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে "কোয়ান্টাম হচ্ছে শাশ্বত ধর্মীয় চেতনার নির্যাসে সমৃদ্ধ পরিপূর্ণ জীবন নির্মাণের প্রক্রিয়া।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৩০২) এখানে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় চেতনার কথা বলা হয়নি বরং সকল ধর্মের নির্যাস মিশ্রণে সমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের ব্যবস্থাপনার নামই হচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড। বিভিন্ন বই পুস্তকে কোয়ান্টাম নিজেদের নযরিয়া বা দৃষ্টিভঙ্গিকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করে থাকে। তাদের এই দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। পবিত্র কুরআনে একমাত্র ইসলাম ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا۔ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"(সুরা আল মায়েদাহ-৩) মুফাসসিরীনে কেরাম এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীনও নিজ নিজ যুগানুসারে পরিপূর্ণই ছিল কোনোটাই অসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু সেগুলো একটি নির্দিষ্ট যুগ পর্যন্ত

সীমাবদ্ধ ছিল আর নবীজি মুহাম্মদ (সা.) এর দ্বীনে ইসলাম সার্বিক পরিপূর্ণতায় ভরপুর, পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলীল স্বরূপ এবং কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

واما فى آخر زمان المبعث فانزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة فالشرع ابدا كان كاملا الا ان الاول كمال إلى زمان مخصوص والثانى كمال إلى يوم القيامة فلاجل هذاالمعنى قال :اليوم اكملت لكم(التفسير الكبير ١١٦-١١)

যুগ সমস্যার সমাধানে ইসলাম :

কেয়ামত অবধি মানব সভ্যতা যতই আধুনিক হোক না কেন, বিজ্ঞানের যতই উৎকর্ষ সাধন হোক না কেন, যে কোনো যুগীয় সমস্যা সমাধানে, যুগ চাহিদা পূরণে কল্যাণময়ী দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম একমাত্র ইসলাম। এজন্য ইসলাম যে ব্যবস্থা রেখেছে তা হচ্ছে ইস্তিম্বাত ও ইজতিহাদ। তাই মানব জীবনের কিছু সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিধি-বিধানের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে আর কতেক সমস্যা এমন রয়েছে যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে খুঁজে বের করা সম্ভব। যুগের যে কোনো নতুন সমস্যার সমাধান এই পদ্ধতিতে ইসলামের মাঝে নিহিত রয়েছে। প্রত্যেক যুগের যোগ্য আলেম-উলামাগণ জাতির সামনে তা তুলে ধরতে সক্ষম হবেন। তাই পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি ও সর্বজনীন কল্যাণের ধর্ম একমাত্র ইসলাম।

ইসলামের জন্য সুসংবাদ :

পরশ্রীকাতরতা বলতে একটি কথা আছে। ইহুদী-খ্রিস্টানরা ইসলামের সাথে এমন নিন্দনীয় আচরণই যুগ যুগ ধরে করে আসছে। ইসলামকে যখন পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীকৃতি দিলেন তখন তাদের গাত্রদাহ সীমা ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাই ইসলামকে অর্ধাঙ্গ-বিকলাঙ্গ প্রমাণ করার চক্রান্ত শুরু করে ঐ গোষ্ঠী। সর্বশেষ কোয়ান্টামের মাধ্যমে তাদের অন্তরজালা নিবারণের নিস্ফল প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। আধুনিক মানুষের কাছে ইসলামকে অচল ও সেকেলে হিসেবে উপস্থাপন কোয়ান্টামের লক্ষ্যতে পরিণত হয়। ইহুদীরা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে এসে বলল, এমন একটি আয়াত আছে যদি তা আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হতো তবে সেদিন আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করতাম। হযরত উমর (রা.) বললেন, সেটি কোন আয়াত? তারা বলল, "আজ তোমাদের দ্বীনকে আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম আর তোমাদের প্রতি আমার করুণা পরিপূর্ণ করে দিলাম।" (বোখারী শরীফ-৪৪০৮)

ইহুদীরা নিজেদের ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করত কিন্তু তাদের এই অহমের উপর উক্ত আয়াত চরমভাবে চপেটাঘাত করে মুসলমানদের পক্ষে এই সুসংবাদ শুনে তারা নিরুপায় হয়ে এই আপত্তি করে বসল যে, এমন সুসংবাদ শুনেও তোমাদের মাঝে কোনো পরিবর্তন নেই। যদি আমাদের বেলায় এমন হতো তবে সেদিন আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করতাম।

চিরসবুজ এই ইসলাম:

উক্ত আয়াতের মাঝে ইসলামের ব্যাপারে তিনটি সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সংক্ষেপে তা এভাবে বর্ণনা করেন-"(ক) আজ তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেছি বিধায় কখনো তাতে পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। (খ) আমার অনুকম্পা তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি বিধায় এই দ্বীন কখনো অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হবে না। (গ) চিরস্থায়ীভাবে তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে আমি পছন্দ করে নিয়েছি বিধায় কখনো আমি এতে অসন্তুষ্ট হব না। (ইবনে কাসীর ২/১৪)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের আশস্ত করেছেন যে, তোমাদের এই দ্বীন সর্বকালে পূর্ণাঙ্গই থাকবে। তাই দ্বীনের ব্যাপারে প্রতারকদের কথায় সন্দিহান হওয়া বা বিজ্ঞানের ঝলক দেখে ধোঁকা খাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অন্যান্য ধর্ম যেভাবে বিকৃত হয়ে গেছে ইসলামের ক্ষেত্রে তেমনটি হবে না। ইসলাম সর্বদা পূর্ণাঙ্গ ও চির সবুজ জীবনব্যবস্থা হিসেবে রক্ষিত থাকবে।

স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জীবনব্যবস্থা:

সার্থক ও সফল জীবনের যে রোডম্যাপ কোয়ান্টাম উদ্ভাবন করেছে তা কতটুকু সফলতা বয়ে আনবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। নিশ্চিত সফলতার পথ হচ্ছে ইসলাম এ ব্যাপারে নবীজির সিলমোহরযুক্ত ছাড় পত্র রয়েছে। তাই নিশ্চিত সাফল্যের রাজপথ ইসলাম ছেড়ে কোয়ান্টামে উদ্ভাবিত জীবনদৃষ্টি অনুসরণ বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-

আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে এমন আলোকিত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট দ্বীনের উপর রেখে গেছি যার রাত-দিন একবরাবর" (ইবনে মাজাহ- হাদীস নং৫) অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের বাস্তবমুখী সাদামাটা আদর্শের অনুসরণ এমন সহজ যেমন পরিষ্কার ময়দানে রাতে ও দিনে চলাচল করা সহজ। (তাকমীলুল হাজাহ-২৩)

ইসলামকে মজবুত করে ধরতে হবে :

সুন্দর ও স্বার্থক জীবনের জন্য কোয়ান্টাম পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে কুরআন-সুন্নাহর মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করেছে। নব উদ্ভাবিত কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত বেদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের নব আবিষ্কৃত মেথড থেকে সতর্ক থাকতে এবং ফেতনার যুগে কুরআন-সুন্নাহকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদীসে এসেছে-

" আমার পরে যে বেঁচে থাকবে সে বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে। তোমাদের কর্তব্য হবে আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। তোমরা সুন্নাতকে মজবুত করে

আঁকড়ে ধরে রাখবে। আর নব উদ্ভাবিত সকল পথ মত থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ নব উদ্ভাবিত বস্তুই হচ্ছে বেদ'আত আর প্রতিটি বেদআতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মেশকাত) মুল্লা আলী ক্বারী (র.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- মানবজীবনের সৌভাগ্য ও সফলতা নির্ভর করে সুন্নাতের অনুসরণের উপর। (মেরকাত১/৩৭৪)

মুমিন ইসলামের উপর তুষ্ট থাকে :

নবীজি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত জীবন বিধানের উপর পরিতৃপ্ত হতে না পারা কোয়ান্টামের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। নিজের বুদ্ধি মতে সকল ধর্মের নির্যাস আর বিজ্ঞানের থিউরি, মিশ্রণে সফলতার সূত্র আবিষ্কার সবচেয়ে বড় ভুল। মুমিন হতে হলে সর্বাবস্থায় কুরআন-সুন্নাহর মাঝে নিজের সকল সমস্যার সমাধান, সকল প্রশ্নের উত্তর আর সকল চাহিদা পূরণের দিকনির্দেশনা খুঁজে পাওয়ার বিশ্বাস রাখতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থায় তুষ্ট থাকতে হবে এবং মনে প্রাণে তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। বিধাতা হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর আস্থাশীল থাকতে হবে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শকে একমাত্র পালনীয় বিশ্বাস করতে হবে। কোয়ান্টামের আবিষ্কৃত জীবন যাপনের বিজ্ঞানের অনুসরণ করা যাবে না। যার ভিত্তি রাখা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত জীবনের সংজ্ঞা আর রুশ দার্শনিক লিও টলস্টয়-এর কিছু মন্তব্যের উপর। ইহুদী-খ্রিস্টান বা তাদের স্বাস্থ্য সংস্থার দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী জীবন যাপনের বিজ্ঞান পালন করতে হবে কেন? ইসলামের বিধি-বিধান নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ জীবনকি একজন মুমিনের জন্য যথেষ্ট নয়? কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাসের ১৪৩ নং পৃষ্ঠায় এবং হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৩০০ পৃষ্ঠায় কোয়ান্টাম জীবনদৃষ্টি সায়েন্স অব লিভিংয়ের আলোচনায় কুরআন-সুন্নাহর কোনো উদ্ধৃতি স্থান পায়নি, স্থান পেয়েছে শুধু স্বাস্থ্য সংস্থা আর খ্রিস্টান দার্শনিক লিও টলস্টয়ের মন্তব্য।

অথচ হাদীসে পাকে বলা হয়েছে– "ঈমানের স্বাদ ঐ ব্যক্তি আস্বাদন করতে পেরেছে যে আল্লাহ তা'আলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রাসূল হিসেবে পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে।" (মুসলিম, মেশকাত) মুল্লা আলী ক্বারী (রহ.) পরিতৃপ্ত হওয়ার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন- "পরিতৃপ্ত থাকার অর্থ হচ্ছে শারীরিক ও আত্মিকভাবে ইসলামের সকল বিধি-বিধান পরিপালন করা। সবর, শোকরও তাকদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা শরীয়ত নির্দেশিত করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াদী মেনে চলা। সুন্নাত, শিষ্টাচার, আচার-ব্যবহার ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে নবীজি (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া। দুনিয়ার প্রাচুর্য বিমুখতা ও পরকালমুখী হয়ে জীবন যাপন করা।" (মেরকাত-১/১৪৩) কোয়ান্টামের শিক্ষা এই হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের অনুগত হওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেদের মেথডের অনুগত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। তাকদীরের বিশ্বাসী হওয়ার পরিবর্তে তাকদীর ডিঙ্গানোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সুন্নাত অনুসরণের স্থলে মনগড়া সফলতার সূত্র অনুসরণের কথা বলছে। পরকালের কথা ভুলিয়ে প্রাচুর্যের লিপসা জাগিয়ে তুলছে।

আংশিক পরিত্যাগের জের :

কোয়ান্টাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টির কথা বলছে তাতে অহরহ ইহুদী-খ্রিস্টান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকদের দর্শন গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের বই-পুস্তকে লিও টলস্টয়, ডা. বেনসন, রজার স্পেরি, স্যার জন একল্স, ডা.ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড, বিজ্ঞানী নিউটন, আইনসটাইন, উইগনার বা ডাঃ কার্লগুস্তাভসহ আরো বহু দার্শনিক ও মুনিঋষীদের আলোচনা ও উপদেশ লক্ষ্য করা যায়। জীবন যাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টামের যে সকল বিষয় এসব দার্শনিকের মতানুসারে সাজানো হয়েছে সেক্ষেত্রে ইসলামের আক্বিদা বিশ্বাস ও বিধি-বিধান অবশ্যই পরিত্যাজ্য হয়েছে। আংশিক শরীয়ত পরিত্যাগের কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে তা ভাবার সুযোগ ও হয়নি। আকর্ষণীয় উপস্থাপনের ফলে সাধারণ মানুষ ও সেদিকটি ভেবে উঠতে পারছে না। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বিশ্ববিখ্যাত বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে লিখেন-"ইসলামের আংশিক কোনো বিধি-বিধানকে যদি কেহ অলসতা বা অবহেলা করে ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে সতর্ক করে দেয়া হবে আর সে দুর্বল মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইসলামকে আংশিকভাবে অস্বীকার করতঃ পরিত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।" (ফাতহুল বারী১/১২৮)

সাফল্য ও মুক্তির সন্ধান পেতে যারা কোয়ান্টামে যাচ্ছেন তারা একটু ভেবে দেখুন নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাত কতটুকু পালন করা হয়েছে। বিশ্ববাসীর জন্য যাকে আদর্শ ও মডেল হিসেবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে তাঁর আদর্শ অনুযায়ী আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সাজানো হয়েছে কি না? তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবন যাপন করা হলে কোনো ধরনের মেথড বা সাধু-সন্নাসীর দ্বারস্থ হতে হবে না। এর বিপরীত পথে হাঁটলে সাময়িক ভালো লাগলেও চূড়ান্ত সফলতা ও প্রশান্তি কখনোই ধরা দিবে না।

কোয়ান্টাম মেথড-১১

পাপ কমানোর ডাক

মুফতী শরীফুল আ'জম

ভয়াবহতার বিচারে পাপ হচ্ছে আগুন সমতুল্য। যেভাবে আগুনের ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ ভস্মীভূত করে দিতে পারে বিশাল জন বসতিকে, অনুরূপ ছোট একটি গুনাহ মানুষকে নিক্ষেপ করতে পারে জাহান্নামের অতল গহবরে। তাই পাপ থেকে পাক-ছাফ, পুতঃ-পবিত্র জীবন একজন মুমিনের একান্ত কাম্য। পাপ কমানো নয় বরং পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া ও পাপ থেকে হাজার মাইল দূরে থাকার দোয়া শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম।

اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد۔

"হে আল্লাহ আমার ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে পূর্বপশ্চিমের দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও। শুভ্রকাপড়ের ময়লা বিদূরিত করার ন্যায় গোনাহ থেকে আমাকে পবিত্র করে দাও। আমার গোনাহসমূহ বরফ, পানি ও হিমশিলা দ্বারা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও।" (বোখারী)

এটা হচ্ছে ইসলামের পূর্ণতার একটি নিদর্শন, যেখানে আধুরা নয়, বরং পরিপূর্ণ ক্লিন হওয়ার শিক্ষা বিদ্যমান। এর বিপরীত কোয়ান্টাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বা জীবন দৃষ্টি উদ্ভাবন করেছে তাতে পাপ মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে পাপ কমানোর কথা বলা হয়েছে। "কোয়ান্টাম হচ্ছে সেই সায়েন্স অফ লিভিং যা বলে দেয় জীবনটাকে কীভাবে সুন্দর করা যায়। ভুল থেকে কীভাবে দূরে থাকা যায়। পাপ কত কম করা যায়।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব-১/৩০১, কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-১৪৩)

আসলে পাপ সম্পর্কে কোয়ান্টামের কোন ধারণাই নেই, অন্যথায় এমন কথা তারা বলতে পারতো না। পাপতো পাপই এর কম বেশ সবই পরিহারযোগ্য। আংশিক পাপ মুক্ত হওয়ার কথা যেখানে বলা হয় তা পূর্ণাঙ্গ জীবন দৃষ্টি হয় কি করে?

আসলে কোয়ান্টাম যে পাপ কমানোর ডাক দিয়ে যাচ্ছে সেখানে কোন ধরণের পাপ উদ্দেশ্য বা কোন অর্থে তারা পাপ শব্দের প্রয়োগ করছে তা অস্পষ্ট। কুফর-শিরকের মত জঘন্য পাপই যখন কোয়ান্টামের মতে পাপের সংজ্ঞায় পড়ে না। ছোট-খাটো পাপের কথাতো বাদই। গান, বাদ্য আর বেপর্দা তো কোয়ান্টামের অনন্য ভূষণে পরিণত হয়েছে। সাথে রয়েছে আশির্বাদের নামে টিনেজ মেয়েদের মাথায় হাত বুলানোর মত গর্হিত কর্মকাণ্ড। মনে হয় পাপের নতুন কোন সংজ্ঞার প্রচলন তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টির লক্ষ্য। কিন্তু পাপ পূণ্যের সংজ্ঞা দেওয়ার মালিক তো আর কোয়ান্টাম নয়, সে এর সংজ্ঞা দেবে কি করে? তাই কুরআন-সুন্নাহর আলোকেই পাপ-পূণ্যের পরিচয় বা সংজ্ঞা জেনে নিতে হবে।

কুফর-শিরক :

কোয়ান্টামের যে প্রবন্ধে পাপ কত কম করা যায় বলে পাপ থেকে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে এর কয়েক লাইন পরেই বলা হচ্ছে "কোয়ান্টাম প্রত্যেকের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেককে উৎসাহিত করে আন্তরিকভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনে"। (কো:উ:-১৪৩) নিজ নিজ ধর্ম পালন করে তো কেহ মুমিন, কেহ কাফির বা মুশরিক হবে। এর প্রতিই যখন কোয়ান্টাম মানুষকে উৎসাহিত করছে তাহলে বোঝা যায় কুফর আর শিরকে লিপ্ত হওয়াটা কোয়ান্টামের মতে কোন পাপ নয়। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে কুফর, শিরক হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম মহাপাপ। ইরশাদ হচ্ছে- "নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহাপাপ।" (সুরা লোকমান-১৩) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, "আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম।" (সুরা বাকারা-২৫৪) কুরআনের ভাষায় যা সবচেয়ে মহাপাপ কোয়ান্টামের দৃষ্টিতে তা কোন পাপই নয়। উল্টা তা পালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে তাও আবার আন্তরিকভাবে!

কোয়ান্টামের সাধনা মানুষকে পাপমুক্ত করা তো দূরের কথা বরং পাপীকে তার পাপ সাগরের আরো গভীরে নিমজ্জিত করে দেওয়া এই সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট। ইসলামের শিক্ষা একজন পাপিষ্ট গান্দা মানব সন্তানকে পবিত্র আত্মা, আলোকিত এক মর্দে মুমিনে পরিণত করে দেয়। আর কোয়ান্টামের মৌণ সাধনা একজন কাফেরকে কুফর শিরিকের মাঝে আরো পাকাপোক্ত করে দেয়। কোয়ান্টাম এটাকে নিজের গুণাগুণ হিসেবে গর্ব করে প্রচারও করে থাকে। তাদের বইতেই লিখা আছে, নিয়মিত কোয়ান্টামের মৌণ সাধনা একজন খৃষ্টানকে ভাল খৃস্টান হিসেবে সন্তে রূপান্তিরিত করে। একজন হিন্দুকে ভাল হিন্দু হিসেবে ঋষিতে পরিণত করে দেয়। একজন বৌদ্ধ নিয়মিত এই সাধনা করলে খাটি বৌদ্ধ বা ভিক্ষুতে রূপান্তরিত হয়।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/২৩৯)

পাপ কমানোর ডাক আর এই বক্তব্যের

সাথে নুন্যতম সামঞ্জস্য আছে কি না? পাঠক একটু ভেবে দেখুন। যে মেথড কুফর শিরিকের ভিত্তি মজবুত করে, তা পাপ কমানোর মেথড হতে পারা আকাশ-কুসুম ভাবনা ছাড়া আর কিছু নয়। পাগলও এমন অসংলগ্ন কথা বলতে পারে না। এমন দৃষ্টিভঙ্গি কখনো পূর্ণাঙ্গ জীবন দৃষ্টি হতে পারে না। পূর্ণাঙ্গ জীবন দৃষ্টি হবে সেটাই যা মানুষকে কুফর-শিরকসহ অন্যসব পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেয়। আর তা হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।

কোয়ান্টামের ভাইয়েরা জেনে রাখুন! কুফরের প্রতি সমর্থন ও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। কোয়ান্টাম পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি সায়েন্স অফ লিভিং এর নামে কুফরী মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। এদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ হলে কি পরিণতি হবে পবিত্র কুরআন তার স্পষ্ট প্রমান বহণ করছে।

ইরশাদ হচ্ছে-"আর কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারী করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে। তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষন না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন। (সুরা আন নিসা-১৪০) এআয়াতের তাফসীরে বলা হচ্ছে"কুফরীর প্রতি মৌন সম্মতিও কুফরী" আলোচ্য আয়াতের শেষে ইরশাদ হয়েছে– "এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ তা'আলার আয়াতও আহকামকে অস্বীকার বিদ্রুপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরা ও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহর অংশীদার হবে। অর্থাৎ খোদা না করুন তোমরা যদি তাদের কুফরী কথা বার্তা মনে প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুত: তোমরাও কাফের হয়ে যাবে। কেননা কুফরী পছন্দ করা ও কুফরী।" (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন) এখানে উল্লেখিত কোন কাজটি কোয়ান্টামে হচ্ছে না? ইসলামকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করার দ্বারা এর বহু বিধি-বিধান অস্বীকার করা হচ্ছে, তাকদীরকে অস্বীকার করা হচ্ছে। ফলে এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস থেকে ঈমান উঠে যাচ্ছে। অসংখ্য আয়াত ও হাদীস কে বিকৃতভাবে 'কুরআন কণিকা' ও 'হাদীস কণিকা'য় ছাপা হয়েছে। এসকল বিষয়ে ইতি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে তাই এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এহেন গর্হিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত কোয়ান্টামের কাছে প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য, সাফল্য ও নিরাময় লাভের আশায় গমন করা তাদের কুফরী মতবাদের সমর্থনের শামীল। কুফর-শিরকের মত মহা পাপ যাদের পাপের সংজ্ঞাতেই পড়েনা ছোট খাটো পাপ তো তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

গান-বাদ্যঃ

কোয়ান্টাম একদিকে পাপ কমানোর ডাক দিচ্ছে অপর দিকে গান-বাদ্য কে সমর্থন দিচ্ছে। শুধু সমর্থনই নয় বরং যে হল রুমে বসে পাপ কমানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আর দীর্ঘ সময় ব্যাপী কোর্স করানো হয় তার পুরো সময়টাই বিশেষ মিউজিক বাজিয়ে সকলকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। বিশেষ এই জাদুময়ী মিউজিক প্রতিদিন দশ ঘন্টা লাগাতার শ্রবণের ফলে ব্রেণে এক বিশেষ মেসেজ পৌঁছে যায়। ফলে চারদিনের মাথায় গুরুজীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং তার মায়াবী কণ্ঠে উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। তাদের এই মিউজিক নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে এটা ইসলাম সমর্থন করে কিনা? ইসলামে তো গান-বাদ্য হারাম তাহলে কোয়ান্টামে কেন এটা হচ্ছে? এমন প্রশ্নের জবাবে কোয়ান্টাম নাচ-গান ও অভিনয়ের বৈধতা দিতে গিয়ে বলে "নাচ,গান বা অভিনয় কী কাজে লাগানো হচ্ছে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। এটা আপনাকে স্রষ্টার দিকে আকর্ষণ করে, না স্রষ্টা থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমরা যে মিউজিক ব্যবহার করি এটা কি আপনার মনকে প্রশান্ত করে, না মনকে শয়তানের মতো অস্থির করে তোলে, অশান্ত করে। ইসলামে সেই জিনিষটা হারাম যেটা আপনার জন্য ক্ষতিকর, আর সেই জিনিষটা হালাল যেটা আপনার জন্য কল্যাণকর।" (হাজার প্রশ্নের জবাব ১/৫১)

এটাই হচ্ছে কোয়ান্টামের ভয়ংকর রূপ, সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো। তাদের এই বক্তব্যের স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর কোন দলীল নেই। আছে শুধু খোড়া যুক্তি, ক্ষতিকর নাচ-গান হারাম আর উপকারী হলে হালাল। এক প্রকারের নাচ-গান আর অভিনয় নাকি স্রষ্টার নিকটবর্তী করে? নাউযুবিল্লাহ! এমন কথা বললে ঈমান থাকবে কি করে। নাফরমানী করে স্রষ্টাকে রাজী করা মসকারা ছাড়া আর কি হতে পারে? কোয়ান্টামের প্রশিক্ষণ অনুসারে নাচ, গান বা অভিনয় করা হলে তা হালাল হয়ে যায়, উপকারী হয়ে যায়, মানুষকে স্রষ্টার দিকে আকৃষ্ট করে। এই তো হচ্ছে কোয়ান্টামের পাপ কমানোর সাধনার বাস্তব চিত্র। নাচ-গান, সিনেমার অভিনয় করেও পাপ মুক্ত হওয়ার সনদ পেলে আর লাগে কি? এমন সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করে কে? তাই গায়ক-গায়িকা আর নায়ক-নায়িকাদের আনাগোনায় কোয়ান্টামের কোর্স মুখরিত থাকে।

ইসলামের সাথে কোয়ান্টামের এই পাপ কমানোর সাধনা চরম সাংঘর্ষিক। ইসলামে নাচ-গান সম্পূর্ণ হারাম।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم،

ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين (سورۂ لقمان ٦)

"এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" (সুরা লোকমান-৬)

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ ও তাফসীরবিদগণের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিসসা-কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে সেগুলো সবই لهــو الـــحـــديـــثএর অন্তর্ভুক্ত। বোখারী ও বায়হাকী (র.) স্ব-স্ব কিতাবে لهـــــــو الـــحـــديـــث এর এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। (আবু দাউদ, আহমদ)

অতএব ইসলামে নাচ-গান অভিনয় সবই হারাম করা হয়েছে, এদের জন্য অবমাননাকর শাস্তির ঘোষণা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে এসেছে।

কোয়ান্টামের পাপ কমানোর সাধনা পাপ কমানোর পরিবর্তে উল্টা পাপ কাজে আরো পারদর্শী করে তোলে। নাচ-গান, অভিনয়ের মত খোদার নাফরমানী থেকে ফেরানোর পরিবর্তে এর প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হওয়ার কৌশল শিক্ষা দেয়। যার বাস্তব কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হলো-

ক. কোয়ান্টামের কোর্সের ২৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট জনৈক অভিনেত্রী নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "মেডিটেশন করার পর অভিনয়ে আমি অনেক বেশি কনসেনট্রেট করতে পারি। আগে একটা চরিত্রে ঢুকার আগেই হুট করে বেরিয়ে যেতাম আবার সাবা হয়ে যেতাম। দেখা যেতো যে, লাফালাফি করছি, গল্প করছি। পরের বার ওই চরিত্রটা ধারণ করতে আমার অনেক সময় লাগতো। ফলে পারফরমেন্স ভালো হতো না। এখন আমি এটা খুব ভালো করতে পারি। একবার ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে চ্যানেল ওয়ানের একটা লাইভ অনুষ্ঠানে যাবো। রাত ১২ টায় অনুষ্ঠান। উত্তরায় আমার শুটিং থেকে রওনা দিয়েছি রাত ১০ টায়। রাস্তায় এমন অবস্থা যে ১৫ মিনিট মাত্র বাকি, অথচ গুলশানের পথে অর্ধেকও ততক্ষণ যেতে পারিনি। এদিকে টিভির স্ক্রলে আমাদের নাম দেখানো হচ্ছে। কী বিব্রতকর অবস্থা। মনে মনে কোয়ান্টা ধ্বনি করতে লাগলাম এবং আমরা পৌঁছেছিলাম ঠিক সময়েই।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-৪০)

খ. কোয়ান্টাম কোর্সের ২২১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট খ্যাতনামা এক নৃত্যশিল্পী নিজের অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করেন "নাচে প্রথমে আমরা একটা গান বা সঙ্গীতের কম্পোজিশন করি। এটা চিন্তার স্তরেই হয়। তারপর বাস্তবে তার প্রতিফলন করি নাচের মুদ্রা তুলে। সেখানেও আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা পারফর্ম করছি কোন কিছু না দেখে না পড়ে। ফলে এক্ষেত্রে ভিজুয়ালাইজেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এ জিনিষটিই হয় মেডিটেশনে।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-৫৯)

গ. ১৮০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট জনৈক সঙ্গীতশিল্পী বলেন "সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় তাসখন্দে ৪৮ টি দেশের প্রতিযোগীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩য় স্থান অর্জন করেছিলাম। সেটি ছিলো আমার একটি মনছবি। তখনই মনে হয়েছিলো এ কোর্সটি আরো আগেই করা উচিত ছিলো। কোর্স করার পর থেকে মেডিটেশন আমার দৈনন্দিন জীবনের অংশ।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-৪৩)

ঘ. ২৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট এক সঙ্গীতশিল্পী বলেন "মেডিটেশন করার পর মিউজিকে এটি কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছি। যেমন, স্বরায়ন চর্চা করে কণ্ঠের অনুশীলনটি খুব ভালো হচ্ছে। প্রাকটিসে মনোযোগ বেড়েছে। যেতে পারছি মিউজিকের গভীরে। আমার এ পর্যন্ত পাঁচটি এলবাম বেরিয়েছে। এর মধ্যে কোর্সের পর আসা মন ভাসিয়ে দেয় এলবামটি খুব ভালো করেছে। "(কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-৪৮)

এই হলো পাপ কমানোর সাধনার সফলতার সামান্য নমুনা, ৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারকে যা সাড়ম্বরে ছাপা হয়েছে। এদের প্রত্যেকেরই একই অভিজ্ঞতা যে নাচ, গান আর অভিনয়ের মত গুনাহের ক্যারিয়ারে পূর্বের চেয়ে ভালো পারফর্ম করতে পেরেছে কোয়ান্টাম কোর্সের কৃপায়। কোয়ান্টামের সাধনা তাদেরকে এ সকল গর্হিত পাপ কাজে আরো পটু ও দক্ষ করে তুলেছে। কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলো কোন পাপ নয়। তাদের সায়েন্স অফ লিভিং এর মতে এ সকল নাচ-গান আর নৃত্য অভিনয় অশান্ত মনে প্রশান্তি আনয়ন করে তাই বৈধ। অথচ সমাজের একজন সাধারণ বিবেক সম্পন্ন লোকও একথা বুঝতে পারে যে, নাচ-গান আর সিনেমা নাটকের সয়লাবের কারণেই সমাজের অবক্ষয় তরান্বিত হয়েছে। যুবসমাজের চরিত্র ধ্বংস, ব্যভিচার আর ইভটিজিং এর মত ব্যাধি সমাজে স্থান করে নিয়েছে এ ছিদ্র পথেই। আর কোয়ান্টাম আরো বেশি যৌনতা ছড়িয়ে দিতে পারদর্শী করে তুলছে নট-নটিনী আর গায়ক-গায়ীকাদের। একদিকে পাপ কমানোর ডাক অপর দিকে বেহায়াপনার পালে হাওয়া দেয়া প্রতারণার শামিল। পাপ কমানো তো দূরের কথা পাপীকে আরো পাপিষ্ট করে গড়ে তুলতেই ভূমিকা রাখছে তাদের এই মেথড।

বেপর্দা-বেহায়াপনা:

পাপ কমানোর ডাকে সাড়া দিয়ে নারী-পুরুষ বেপর্দাভাবে কোয়ান্টামের কোর্সে যে ভাবে একত্রিত হচ্ছে তাতে কোন পাপ বোধ জাগ্রত হচ্ছে না। পর্দা যে শরীয়তের একটি ফরয বিধান তা যেন কোয়ান্টিয়ার ভায়েরা বেমালুম ভুলেই গেছেন। পরনারী দর্শন কোয়ান্টামের একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এটা তাদের কাছে পাপের সংজ্ঞায় পড়ে না। সেজে গুজে নারীরা মঞ্চে হাজির হচ্ছে আর সাধু সন্ন্যাসীরা মন নিয়ন্ত্রন করে তাদের চেহারাখানা দর্শন করছে। ইসলাম বাস্তব বিবর্জিত কোন মৌন সাধনা সমর্থন করে না। মন ঠিক রেখে পর নারী দর্শনের পরিবর্তে নারী-পুরুষকে তাদের দৃষ্টি অবণত রাখার শিক্ষা দেয় ইসলাম। আর এটাই সর্বোচ্চ সতর্কতার দাবি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে "মুমিনদেরকে বলুন তারা যা করে, আল্লাহ অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে।" (সুরা আন নুর-৩০-৩১)

নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে ইসলামের এই পর্দা বিধান। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম-প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দুটিকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।(তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

এখানে গুনাহের দুই প্রান্তের কথা উল্লেখ করে তা থেকে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। সূচনা ও পরিণতি উভয়টি হারাম। এর সঙ্গে মাঝের সব কিছু হারাম।

এই আয়াতে প্রদত্ব বিধান আর কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে তফাত কয় সমুদ্রের তা একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসে। এহেন পাপ নেই যা কোয়ান্টামে হচ্ছে না। পাপের সূচনা নারী দর্শন যখন তারা বৈধ করে দিয়েছে এর পরিণতি ও তারা ঠেকাতে পারছে না। কোয়ান্টামকে যারা কাছ থেকে দেখেছে, কোর্স করেছে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেছে এমন কোয়ান্টাম ফেরা ভাইদের কাছ থেকে জানা যায় বেপর্দার করুন পরিণতির কথা। কোর্স করতে এসে দেখা, সেই দেখা থেকে পরিচয় অতঃপর প্রেম-প্রণয়ের অনেক কাহিনী। এর বিপরীত পরকীয়ার জেরে সংসার ভঙ্গের মত তিক্ত অভিজ্ঞতাও কোয়ান্টামের ঝুড়িতে বিদ্যমান। আর এসবই হচ্ছে পর্দাহীনতার কুফল।

বাস্তব বিরোধী সাধনা কখনোই ধোপে টেকেনা। বিড়ালের মাথায় চেরাগ রাখার সাধনার ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে, কঠিন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিড়ালকে মাথায় চেরাগ রাখায় অভ্যস্ত করে রাজ দরবারে নিয়ে এসেছিল এক উজির। বাদশাহ পরীক্ষা করার জন্য একটি ইঁদুর সামনে ছেড়ে দিতেই বিড়াল সকল প্রশিক্ষণ ভুলে সভাবজাত আঁচড়নের বহিঃপ্রকাশ করে বসলো। চেরাগ ফেলে এক লাফে ইঁদুরকে জাপটে ধরলো। পর্দাহীন সাধকদের অবস্থাও তাই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে সকল সাধনা গচ্চা যাচ্ছে। এভাবে পাপ মুক্ত হওয়া যাবেনা। স্থায়ী প্রশান্তি লাভ হবে না। ঈমান আক্বীদা দুরস্ত করে নববী সুন্নাতে পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হলে তবেই পাপ মুক্ত আলোকিত মানুষ হওয়া যাবে।

পরনারী দর্শনের চেয়ে আরো স্পর্শ কাতর ও বড় পাপ হচ্ছে পরনারী স্পর্শ করা। নারীদের মাথায় হাত বুলানোর মত নির্লজ্জ কাণ্ড কোয়ান্টামের পাপের সংজ্ঞায় স্থান পায়নি। এই সর্বনাশী কর্মের নাম দেয়া হয়েছে আশির্বাদ বা দোয়া। গুরুজীর নিজস্ব বক্তব্য থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো।"একবার এক টিনেজ মেয়ের সাথে দেখা। আমাদের এই গ্রাজুয়েট মেয়েটিকে আগে প্রোগ্রামে দেখলেও মাঝখানে দেখছিলাম না। তার সাথে দেখা হওয়ার পর মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। কি 'মা', কেমন আছো? জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে কাঁন্না। কেন? কারণ একবার কোন এক প্রোগ্রামে আমার যাওয়ার পথে অনেকের মাথায় হাত রেখেছি, কিন্তু মেয়েটির মাথায় রাখিনি এবং সেটাই তার দুঃখ এবং এই দুঃখ থেকে অভিমান। সেই কারণে গত ছয় মাস সে ফাউন্ডেশনের কোন প্রোগ্রামে আসে নি। আমি মেয়েটিকে বললাম, দেখ মা, এটা হয়তো ভিড়ের মধ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যদি এটা আমাকে বলতে তাহলে আমি তো কয়েকবার তোমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করতাম।" (গুরুজী হাজারো প্রশ্নের জবাব-১/২২৯)

এই হচ্ছে কোয়ান্টামের গুরুজীর কীর্তি। তার মান-ইজ্জত বাঁচাতে হলে বেহায়াপনার সংজ্ঞা নতুন করে ঠিক করতে হবে। আর পাপের নতুন সংজ্ঞার চাহিদা তো আগেই সৃষ্টি হয়েছে। কোয়ান্টামের আত্মশুদ্ধি এমন অশ্লিলভাবেই অংকন করা হয়েছে। অথচ ইসলাম পরনারী দর্শন যেভাবে হারাম করেছে পরনারী স্পর্শকে ও হারাম করেছে। এতসব হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যে সাধনা করা হচ্ছে তা সাইকি পাওয়ার, কমান্ড সেন্টার বা ইএসপির মত অর্জন উপহার দিতে পারে কিন্তু পাপ মুক্ত করে জান্নাতী বানাতে পারবে না।

নারী-পুরুষের সঙ্ঘবদ্ধ ভ্রমণ:

কোয়ান্টামের পাপ কমানোর ডাকে সাড়া দিয়ে বহু নারী পুরুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে যোগ দেয়। এরই অংশ হিসেবে ঢাকার শান্তি নগর থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বান্দরবানের লামায় ধ্যানযাত্রা অনুষ্ঠানে অংশ নেয় শত শত নারী-পুরুষ। নামে ধ্যানযাত্রা হলেও তা একটি চমৎকার ও রোমান্টিক দেশ ভ্রমণ। ধ্যান সাধনার নামে ভিন পুরুষদের সাথে দলবেধে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো, একই মঞ্চে বসে মেডিটেশন, দরবারানে বসে চা খেতে খেতে গল্প করা, খোলামেলাভাবে জলস্রোত আর ঝর্নায় রোমাঞ্চকর প্রকৃতি স্নান সহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে কোয়ান্টামের এই ধ্যান যাত্রায়। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-১১৭)

সাধনার কথা বলে, প্রশান্তির মুলা ঝুলিয়ে মা-বোনদের নিয়ে এমন ভ্রমনের আয়োজন করে কোয়ান্টাম কি সর্বনাশ করছে তার অংক মেলানোর সময় হয়েছে। যেখানে হজ্বের মত ফরয বিধান আদায় করতে মহিলারা নিজস্ব মাহরাম পুরুষ ছাড়া যেতে পারে না সেখানে কোয়ান্টামের ধ্যান যাত্রায় মহিলাদের গমন কি করে বৈধ হয়। এদেশ তো এখনো পশ্চিমাদের মত হয়নি। যেখানে নারী-পুরুষ কে কার সাথে পর্যটনে বের হচ্ছে তার কোন হিসেব নেই। নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশের মানুষ এমন বেহায়াপনার ধ্যানযাত্রা মেনে নিবে না। কোয়ান্টাম নানান শৃঙ্খল ভঙ্গের শ্লোগান দিয়ে থাকে। এর মধ্যে পারিবারিক শৃঙ্খল ভঙ্গের প্রতি একটু বেশি জোর দেয়া হয়। পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে ইউরোপ-আমেরিকার মত ফ্রি মাইন্ডের সমাজ গড়ার সংকল্প নিয়েই কোয়ান্টামের এই আয়োজন। এর নাম দিয়েছে সৎ সঙ্ঘে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। পরিবার বাদ দিয়ে নিজের স্বামীকে রেখে কোয়ান্টামের সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ করতেই পাহাড়ের নিরিবিলি পরিবেশে নিয়ে যাওয়া হচেছ মা-বোনদের। যার ফলে অনেকের পরিবারে ইতিমধ্যে ফাটল ধরে গেছে, প্রশান্তির সাধনা পরিণত হয়েছে অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে। আর কেনইবা হবেনা? কোন আত্মমর্যাদাশীল পুরুষ ভিন পুরুষের সাথে নিজ স্ত্রী দলবেধে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো, ঘরের বাইরে রাত কাটানো, আশির্বাদের নামে গুরুজী কর্তৃক মাথায় হাত বুলানো, আর ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্ন প্রোগ্রামে, সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কাটানো কি পছন্দ করতে পারে? এর অত্যাবশ্যম্ভাবী পরিণত হচ্ছে পারিবারিক অশান্তি আর বিচ্ছেদ। বাস্তব কয়েকটি চিত্র কোয়ান্টামের বই থেকে তুলে ধরা হচ্ছে।

ক. কোয়ান্টামের যে কোনো প্রোগ্রামে আসার আগে বাসায় যে ঝামেলা হয় বা বাধা হয়, শান্তি লাগে না। এই বাসার বৃত্তটা ভাঙ্গবো কীভাবে? গুরুজী, সুন্দর বুদ্ধি দিলে উপকৃত হবো।" (হা.প্র. জ.১/৪৫)

খ. শ্বশুর বাড়ীতে অনেক অবহেলিত হই, ফাউন্ডেশনে আসা তারা পছন্দ করেন না। এ ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?" (হা.প্র.জ.১/৪৬)

গ. "আমার স্বামী একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হওয়া সত্ত্বেও আমার মেডিটেশন করায় বাধা দেয়। কোয়ান্টামের কার্যক্রমে আসা নিয়ে প্রায়ই অশান্তি করে এবং নানা রকম কটুক্তি করে। আমার কী করা উচিত?" (হা. প্র. জ.১/৪৭)

কোয়ান্টামে গমনের ফলে পরিবারে যে সমস্যা হচ্ছে তার সমাধান কামনা করে গুরুজীর কাছে প্রশ্ন করেছেন কয়েকজন মহিলা।

কোয়ান্টামের সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এসব ঘটনা। এমন আরো অসংখ্য পারিবারিক অশান্তির হৃদয় বিদারক কাহিনী রয়েছে। এটাকেই বলে "বদলে গেছে লাখো জীবন"!!

এভাবে পরিবারের বৃত্ত ভেঙ্গে কোয়ান্টামের সাধকদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ করাই ওদের টার্গেট কি না ভেবে দেখা দরকার। নারী হয়ে ঘরের বাইরে সাধনায় লিপ্ত হলে বাসায় ঝামেলা হবেই। কোন ভদ্র পরিবার পুত্র বধুর বাইরে বিচরণ, ভীনপুরুষের দলে পাহাড় ঝর্ণায় ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করতে পারে না। স্বামীকে রেখে সাধু-সন্ন্যাসীর প্রোগ্রামে সময় কাটালে কটুক্তি শুনতেই হবে।

যে গুরুজীর চক্রে পড়ে অশান্তি হলো আবার সমাধানও তার কাছেই কামনা করা নির্বুদ্ধিতা নয় কি? মুরগীর বুদ্ধি নিয়ে চললেও তো পারিবারিক এই অশান্তি রোধ করা যেতো। শিয়ালের আগমন টের পেয়ে বুদ্ধিমতী মুরগী গাছের ডালে আশ্রয় নিল। ধুর্ত শিয়াল ফন্দি অটল তাকে ধরার। বলল, ভগ্নি নিচে নেমে এসো আমরা নামায আদায় করি। মুরগী, যার যার মত আদায় করে নাও বলে নিচে নামতে অস্বীকৃতি জানায়। শিয়াল বলে নামায সংঘবদ্ধভাবে জামাত ছাড়া আদায় হয়না। মুরগী বলে আযান ছাড়াতো জামাত হয়না, তাহলে প্রথমে তুমি আযান দিয়ে দাও। মুরগীর লোভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য শিয়াল হুক্কাহুয়া ডাক দিতেই মনিবের মুরগী রক্ষায় কুকুর ছুটে এলো। শিয়ালের মিষ্টি কথায় সাড়া দিলে কি ক্ষতি হবে মুরগী বুঝতে পারলেও কোয়ান্টামের পাপ মুক্তির ডাকে সাড়া দিলে কি ক্ষতি হবে তা আমাদের মা-বোনেরা বুঝলনা। বড়ই আফসোস হয় তাদের বুদ্ধি বিবেচনা দেখে।

পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে ঘরকে শান্তির নীড় বানাতে পর্দার বিধান দিয়েছে ইসলাম। হারাম করেছে মাহরাম

পুরুষ ছাড়া দেশ ভ্রমণ। পর্দা ছাড়া পরিবার সুশোভিত হয় না আর পরিবার ছাড়া জীবন সুখময় হয় না। প্রশান্তির খোঁজে বেপর্দা-বেশরা কোয়ান্টামে গমন আর পাহাড় ঝর্নায় রোমান্টিক ধ্যান যাত্রায় অংশ গ্রহণ করলে পারিবারিক অশান্তি আরো বৃদ্ধি পাবে।

হাদীসে পাকে বলা হয়েছে মাহরাম ছাড়া কোন নারী যেন দুর-দুরান্ত গমন না করে। (বুখারী ও মুসলিম)

عن ابن عباسؓ قال قال النبی ﷺ لاتسافر المرأة الا مع ذی محرم ولا یدخل علیها رجل الا ومعها محرم (الصحیح للبخاری رقم الحدیث ١٨٦٢)

عن ابن عمرؓ ان رسول الله ﷺ لاتسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم (الصحیح لمسلم رقم الحدیث ١٣٣٩)

এভাবে নারীদের ভ্রমন ইসলামে মহা পাপ। অথচ কোয়ান্টামের মতে এগুলো কোন পাপই নয়। বরং পাপ মুক্তি একটি উচ্চমানের সাধনা হচ্ছে লামার কোয়ান্টায়ন। তাদের এই সাধনায় পাপমুক্ত হওয়া তো দূরের কথা শত শত নারীর খোলামেলা ভাবে পাহাড়ী ঝর্ণায় গোসলের দৃশ্য গোটা পরিবেশকে কলুষিত করে তোলে।

ভাস্কর্য নির্মাণ:

পাপ কমানোর ডাক শুনে যারা বান্দরবানের লামায় অবস্থিত কোয়ান্টামের দুদিনের ধ্যানযাত্রায় গমন করেন তখন সর্বপ্রথম নাফরমানীর যে দৃশ্যটি চোখে পড়ে তা হচ্ছে হাতির ভাস্কর্য। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য– "এবড়োখেবড়ো পথ পাড়ি দিয়ে ঘন্টাদেড়েক পরে কোয়ান্টামের প্রবশেদ্বারে সালাম তোরণের সামনে যখন চাঁদের গাড়ি থামে, তখন আর কারো চোখে ঘুম নেই। ঢুকেই অবাক হওয়ার পালা। একি! এই দিনের বেলায় হাতির পাল এলো কোত্থেকে! ধাওয়া করবে নাকি? আরে এতো দেখি ভাস্কর্য। কিন্তু এ তো বাস্তবের মতো" (কো. উচ্ছ্বাস-১১৭)

কোয়ান্টামে ইসলাম বিরোধী কিছু নেই বলে আস্ফালন করা হয়, ভাস্কর্য নির্মাণ কি ইসলাম বিরোধী নয়? আসলে কোয়ান্টামের প্রথম চার দিনের কোর্সে যাদুর যে সাইকিক বর্ম দিয়ে মানুষকে আচ্ছাদন করে ফেলা হয় এরপর আর তাতে ইসলাম বিরোধী কিছু নজরে আসেনা। যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির মত তাদের সব অপকর্ম দেখে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায় সকলে। তবে কেহ সত্য সন্ধানী হলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তার সঙ্গ দেয়। যাদুর বলয় থেকে সে বেড়িয়ে আসতে সক্ষম হয়।

ইসলামে ভাস্কর্য নির্মাণ মহাপাপ। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি কোন ভাস্কর্য নির্মাণ করবে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিবসে সেই ভাস্কর্যে প্রাণ দেয়া পর্যন্ত তাকে আযাব দিতে থাকবেন, আর সে কিছুতেই তাতে প্রাণ সঞ্চালন করতে সক্ষম হবে না।" (বুখারী শরীফ হা.২২২৫)

"নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ভাস্কর্য নির্মাতাদের আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেবেন।"(বুখারী শরীফ হা.৫৯৫০)

"নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাস্কর্য নির্মাতাদের অভিসম্পাত করেন"। (বুখারী-৫৯৬২)

আসুন এবার মিলিয়ে দেখি কোয়ান্টামের দাবি আর কুরআন-সুন্নাহর বাণীর মাঝে তফাত কয় সমুদ্রের। একদিকে ওরা পাপ কমানোর আহ্বান করে সাধুর ভান করছে, অপরদিকে কুফর-শিরক থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় সব রকমের পাপের বৈধতা দিচ্ছে ও সমর্থন যোগাচ্ছে। আবার জ্ঞান পাপীর পরিচয় দিতে এ সকল পাপ ও গর্হিত কর্মকাণ্ডকে ইসলাম সম্মত বলে মিথ্যা দাবী করছে। কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সব হারামকে হালাল বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

কোয়ান্টামের ভালো দিক:

মদ ও জুয়ার মাঝে (হারাম হওয়ার পূর্বে) যে ভালো দিক রয়েছে তা খোদ পবিত্র কুরআনের মাঝেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে এগুলোকে হালাল করা হয়নি। ইরশাদ হচ্ছে-"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।" (সুরা আল বাকারা-২১৯)

কোয়ান্টামের অবস্থাও তাই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হতেও পারে, কিন্তু এর ছদ্মাবরণে কুফুর-শিরকের মত ভয়াবহ কর্মকাণ্ডে এদেশের মুসলমানদের লিপ্ত করা হচ্ছে। সংগোপনে ধ্বংস করা হচ্ছে মানুষের ঈমান। আলোকিত জীবনের হাজার সুত্রের মাঝে অথবা হাজারো প্রশ্নের জবাবে ভালো ভালো উপদেশের ফাঁকে একটি কুফুরী মতবাদ থাকলেই তো সবশেষ। স্ত্রীর সাথে নিরানব্বইটি মিষ্টি কথার সাথে মাত্র একবার ঘৃণিতও নিকৃষ্ট শব্দ'তালাক' উচ্চারণ করলে যেভাবে সব তেতো হয়ে যায়। এক ড্রাম দুধে এক ফোঁটা বিষ একই ভুমিকা রাখে। কোয়ান্টামের ভালো দিকগুলোর কথা অনেকে বলতে চায় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনাও শোনাতে চায়। কিন্তু সুস্থ বিবেক দিয়ে চিন্তা করলে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, তাদের ভালো দিকগুলো মূলত ঈমান শিকারের একটি ফাঁদ মাত্র।

একদিকে পাপ কমানোর আহ্বান অপরদিকে এতসব পাপের মহোৎসব কোয়ান্টামের ভণ্ডামীর উজ্জল চেহারা ফুটিয়ে তোলে। তাদের ঈমান বিধ্বংসী চক্রান্ত থেকে আল্লাহ তা'আলা সকলকে রক্ষা করুন।

কোয়ান্টাম মেথড-১২

বিভ্রান্তির দাবানল

মুফতী শরীফুল আ'জম

মানব জাতিকে বিভ্রান্ত করার প্রধান ফটক হচ্ছে, তথ্য বিকৃতি। সত্য ও সঠিক বিষয়কে ঘষামাজা করে বিকৃতরূপে প্রকাশ করা একটি শয়তানি চাল। মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই কূটকৌশল প্রয়োগ করা হয় হযরত আদম (আ.)-এর বিরুদ্ধে। মহান রাব্বুল আলামীনের একটি নির্দেশকে বিকৃত করে তাঁর সামনে উপস্থাপন করে ইবলীস শয়তান। শুধু তা-ই নয়, ইবলীস নিজের প্রতারণাকে তাদের কাছ থেকে লুকানোর জন্য কসম খেয়ে বলল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।(সূরা আল আ'রাফ-২০-২১) প্রতারকদের এটি একটি কৌশল যে, তারা নিজেকে মানব সেবক বা হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে উপস্থাপন করে নির্বিঘ্নে সকল অপকর্ম সম্পাদন করে যায় ।

কোয়ান্টাম মেথডও একই কৌশল অবলম্বন করে নিজেদের মিশন এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কুরআন-সুন্নাহকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের মাঝে বিকৃতি সাধন করছে। আর এ সকল ঈমানবিধ্বংসী অপকর্মকে লুকাতে সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়ে নিজেকে মানবতার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে জাহির করছে। ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ জাতির অন্তর্ভুক্ত করার চটকদার মনছবি দেখাচ্ছে।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র সীরাত বিকৃতি তাদের মনছবির ভয়াবহতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাওহীদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ত্যাগ-তিতীক্ষার যে দুর্লভ ইতিহাস রচনা করেছিলেন, সেই ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে কোয়ান্টাম কুফর-শিরকের বৈধতা প্রমাণের দুঃসাহস প্রদর্শন করেছে।

এক সাগর রক্ত পেরিয়ে নবম হিজরীতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরবের পূণ্যভূমিতে যখন ইসলামের পতাকা নিঃসঙ্কোচে উড়াতে সক্ষম হলেন। তাওহীদ-রেসালাতের আলো দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিতে পত্র মারফত বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পাঠাতে লাগলেন। এ ধরনের একটি পত্র নাজরানের খ্রিস্টানদের কাছে এসে পৌঁছলে, তাদের প্রতিনিধিদল মদীনা শরীফে এসে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কর আদায়ের শর্তে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে ফিরে যায়। ফলে চিরদিনের জন্য লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়।

এই যে তারা মদীনা শরীফে এলো, মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল আর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করল কোয়ান্টামের মতে এ থেকেই নাকি ইহুদী-খ্রিষ্টধর্মের বৈধতা প্রমাণিত হয়! নাজরানের লোকেরা কিসের আহ্বানে সাড়া দিতে এলো। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন প্রয়োজনে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। কী বিষয়ে আলোচনা হলো আর এর ফলাফল কী হলো। এ সকল ইতিহাস কি কোয়ান্টামের জানা নেই? নাকি সত্যকে গোপন করে কোনো স্বার্থ সিদ্ধির ফন্দি করা হয়েছে?

এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গুরুজি সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নাজরান প্রতিনিধিদলের ঘটনা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করেন। হুবহু ওই প্রশ্ন-উত্তর তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : আমার পরিবারের একজন সদস্য মেডিটেশন করে যথেষ্ট উপকার পেয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি বলেন, আল্লাহকে ডাকো। কোয়ান্টামে যেতে হবে না। ওখানে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধরা আসে।

উত্তর : নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওখানে পৌত্তলিক আসত, খ্রিস্টান আসত, ইহুদি আসত। নবীজি তো কাউকে আসতে মানা করেননি কখনো। নবীজির ওখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিনিধিরা আসতেন। এমনকি যখন নাজরান থেকে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল মসজিদে নববীতে এলেন, আলাপ-আলোচনা শেষে যখন তারা বললেন যে, আমাদের তো এখন প্রার্থনার সময় হয়েছে, আমরা বাইরে গিয়ে প্রার্থনা করে আসি। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন, কেন তোমরা কি এই জায়গাটাকে তোমাদের প্রার্থনা করার মতো পবিত্র মনে করো না? মসজিদে নববীতে খ্রিস্টানরা প্রার্থনা করল। .... (মহাজাতক, হাজারো প্রশ্নের জবাব- ১/৫১)

এ কথার কোনো উদ্বৃতি কোয়ান্টামের উক্ত বইয়ে দেয়া হয়নি। নাজরান দলের প্রকৃত ঘটনার সাথে এর মিল পাওয়া যায় না। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা কেন আসত আর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কী শিক্ষা দিতেন এ বিষয়টিও এখানে গোপন করা হয়েছে। আসল ঘটনাটি জানা থাকলে কোয়ান্টামের ধোঁকাবাজী বুঝতে অসুবিধা হবে না।

আসল ইতিহাস :

নাজরান মক্কা শরীফ হতে ইয়ামনের দিকে সাত মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। তৎকালীন এটা আরব খ্রিস্টানদের আবাসভূমি ছিল। সেখানে তাদের একটি প্রকাণ্ড গির্জা ছিল; যা খ্রিস্টান কা'বা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এর অধীনে তিয়াত্তরটি ইউনিয়ন ছিল। যেখানে লক্ষাধিক খ্রিস্টান বসবাস করত।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাজরানের খ্রিস্টানদের সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে এ মর্মে একখানা পত্র লেখেন-

بسـم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب من مـحـمـدالـنبـى رسـول اللـه إلى اسقف نـجـران واهـل نجران: ان اسلمتم فانى احـمـد اليـكـم الله اله ابراهيم واسحاق ويـعـقـوب،امـا بـعد! فانى ادعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وادعوكم إلى ولاية الـلـه مـن ولاية الـعباد، فان ابيتم فـالـجـزية فان ابيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام ـ (دلائل النبوة ٥/٣٨٥)

"ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কুবের মা'বুদের নামে শুরু করছি। আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে নাজরানের ধর্মযাজকগণ ও জনসাধারণের প্রতি! তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নাও তবে তোমাদের কাছে ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কুবের মা'বুদের গুণকীর্তন করব। আমি তোমাদিগকে বান্দার উপাসনা ছেড়ে মহান আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি। বান্দার অভিভাবকত্ব পরিহার করে আল্লাহর তা'আলার অভিভাবকত্ব গ্রহণের আহ্বান করছি। যদি অস্বীকার করো তবে কর আদায়ে সম্মত হতে হবে। যদি তাতে রাজি না হও তাহলে তোমাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। ওয়াসসালাম। (দালায়েলুন নবুওয়াহ ৫/৩৮৫)

গির্জার প্রধান পাদ্রী (Lord Bishop) পত্রটি পাঠ করে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। জরুরি পরামর্শের জন্য তৎক্ষণাৎ শুরাহবীল হামদানীকে ডেকে পাঠালেন। কারণ তার পরামর্শ ছাড়া পাদ্রীগণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন না। শুরাহবীল পত্র পাঠ করে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। বিশপের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন জনাব, আপনি ভালোরূপেই অবগত আছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে হযরত ইসমাঈলের বংশে নবী প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সম্ভবত ইনি সেই নবী। নবী সম্বন্ধে যুক্তিতর্ক চলে না। কাজেই এ সম্পর্কে আমি কোন মত প্রকাশ করতে পারব না। এরপর একে একে আব্দুল্লাহ ইবনে শুরাহবীল ও জব্বার ইবনে ফয়যকে ডেকে পাঠালেন। যাদের বুদ্ধিমত্তার ওপর বিশপের পূর্ণ আস্থা ছিল। কিন্তু উভয়ে এ বিষয়ে মত প্রকাশে অপারগতা প্রকাশ করল। অতঃপর নিরুপায় হয়ে গির্জার ঘণ্টা বাজিয়ে সর্বসাধারণকে ডাকার বিশেষ সংকেত দেয়া হলো। ঘণ্টার ধ্বনি শুনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটছে বুঝতে পেরে নাজরানের সকল খ্রিস্টান সমবেত হলে বিশপ তাদেরকে পত্রটি পাঠ করে শুনালেন। এরপর সকলের পরামর্শক্রমে একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

নাজরান প্রতিনিধি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ এবং সীরাত গ্রন্থের বর্ণনাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, তাদের প্রতিনিধিদল দুবার নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেদমতে হাজির হয়েছিল। প্রথমবার তিন সদস্যের ছোট একটি দল এবং দ্বিতীয়বার ষাট সদস্যের বিশাল কাফেলা আগমন করে।

প্রথম দল :

প্রথম দলটি মদীনায় পৌঁছে নিজেদের সাধারণ পোশাক পরিবর্তন করে জাকজমকপূর্ণ মূল্যবান পোশাক ও স্বর্ণের আংটি পরিধান করে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেদমতে হাজির হলো এবং ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক নবীজিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম করল। কিন্তু তিনি সালামের উত্তরও দিলেন না এবং তাদের সাথে কোনো কথাও বললেন না।

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই নারাজির কারণ বুঝতে না পেরে তারা পরিচিত সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা এসব পোশাক পাল্টে সাধারণ পোশাক পরিধান করো এবং স্বর্ণের আংটি খুলে ফেল। অতঃপর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করো। তারা তাই করল। এবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালামের উত্তর দিলেন এবং কথাবার্তাও বললেন। (দালায়েলুন নবুওয়াহ ৫/৩৮৬)

ইসলাম গ্রহণের আহ্বান :

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিনিধিদল প্রশ্ন করলো- হুজুর, হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে আপনার মত কী? নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা কিছুদিন এখানে অবস্থান করো। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে উত্তর আসবে তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা। খ্রিস্টানদের মতে হযরত ঈসা (আ.) তিনের এক খোদা বা খোদার পুত্র ছিলেন। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করতে একদিন পরেই এ আয়াত অবতীর্ণ হলো- ان مثل عيسى الاية "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। আপনার প্রভুর পক্ষ হতে ইহাই সঠিক কথা। কাজেই আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" (সুরা আলে ইমরান-৫৯-৬০)

খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত আক্বিদা-বিশ্বাস ত্যাগ করে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে নাজরান প্রতিনিধিদল মদীনায় থাকাকালীন পবিত্র কুরআনের আলে ইমরানে ৮০/৯০ খানা আয়াত অবতীর্ণ হয়। যাতে অত্যন্ত আবেদনময়ী আদুরে ও কোমল ভাষায় তাওহীদ, রেসালাত এবং আখেরাতের কথা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা হয়। এবং ঈসা (আ.)-এর অনুসারী এই কাফেলার প্রতি লক্ষ্য করে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনবৃত্তান্তের ও আলোচনা পেশ করা হয়। কিন্তু কিছুতেই তাদের মন গলে না। সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে তারা ঈসা (আ.) কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্য বাদানুবাদ ও যুক্তিতর্ক পেশ করতে থাকে। ঈসা (আ.) বান্দা নন, তিনি খোদা বা খোদার পুত্র এ মিথ্যা দাবিতে তারা অটল থাকে।

নাজরানের খ্রিস্টানদের এত বোঝানোর পরও যেহেতু তারা সত্যকে মেনে নিচ্ছে না, তাই পরিশেষে তাদের সাথে মুবাহালার নির্দেশ অবতীর্ণ হলো- "অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এ সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল, এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমরা স্বয়ং এবং তোমরা স্বয়ং সমবেত হই। তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং যে পক্ষ মিথ্যবাদী তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি।" (সুরা আলে ইমরান-৬১)

মুবাহালা :

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নাজরান খ্রিস্টানদলের সাথে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালা হচ্ছে- যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়। তবে উভয় পক্ষ মিলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। তবে একত্রিত করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

আয়াতের নির্দেশ পেয়ে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহবান জানান, এবং নিজেও হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত হাসান-হুসাইন (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আত্মবিশ্বাস ও আহলে বাইতের পূত-পবিত্র নূরানী চেহারা দেখে শুরাহবীল ভীত হয়ে যায়। সাথীদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে সে বলে তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির অন্য কোনো পথ খোঁজ। সঙ্গীদ্বয় বলল, তোমার মতে মুক্তির উপায় কী? সে বলল, আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধিদল সম্মত হয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দিষ্ট হারে বাৎসরিক খাজনা আদায়ের শর্তে তাদেরকে একটি চুক্তিপত্র লিখে দিলেন। (মা'আরিফুল কুরআন)

দ্বিতীয় দল :

প্রথম দলটি সন্ধি করে ফিরে যাওয়ার পর নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ শুনতে পেয়ে নাজরানের অনেক খ্রিস্টান পাদ্রী ও সাধারণ লোকজন মদীনায় ছুটে এসে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এর কিছুদিন পর নাজরানের খ্রিস্টান কা'বার প্রধান যাজক আবু হারিসা বড় বড় পাদ্রী, লিডার, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ লোকজনসহ মোট ষাট জনের একটি দল নিয়ে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আবু হারেসা আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র বনূ বকর বিন ওয়াইলের লোক ছিলেন। পরবর্তীতে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তাদের বই-পুস্তক পড়ে বিশাল বুৎপত্তি অর্জন করে। রোম সম্রাট তার ধর্মীয় গভীর জ্ঞান, অনুরাগ ও বংশ মর্যাদা দেখে বিশেষ সম্মান প্রদান করে। মোটা অংকে আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করেন। তার জন্য একটি গির্জা নির্মাণ করে দেন এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় পদবিতে ভূষিত করেন।

ষাট জনের কাফেলা মদীনার দিকে অগ্রসর হয়ে চলছে। দলপতি আবু হারেসা একটি খচ্চরে আরোহীত। পাশে তার ভাই কুরজ বিন আলকামাও রয়েছে। হঠাৎ আবু হারেসার খচ্চর হোঁচট খেল। এতে তার ভাই কুরজ বলে উঠল, মুহাম্মদের ধ্বংস হোক। (নাউযুবিল্লাহ) আবু হারেসা গর্জে উঠে বলল, তুই ধ্বংস হয়ে যা। অন্য বর্ণনায়- তোর মা ধ্বংস হোক। বিস্মিত হয়ে কুরজ জিজ্ঞেস করল, ভাই! আপনি এ

কথা কেন বলছেন? আবু হারেসা বলল, আল্লাহর কসম তিনি তো সেই নবী। আমরা যার প্রতীক্ষায় রয়েছি। কুরজ বলল, এ কথা জানা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করছেন না কেন? আবু হারেসা বলল, রোম সম্রাট আমাকে যে সম্মানে ভূষিত করেছে, অর্থ-কড়ি দিচ্ছে এগুলো হাত ছাড়া হওয়ার ভয়ে আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। ভাইয়ের এই কথা কুরজের মনে রেখাপাত করে এবং পরবর্তীতে তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়। (সীরাতে ইবনে হিশাম ২/২০৪, তারিখে ইবনে কাসীর ৫/৫৬, দালায়েলুন নবুওয়াহ ৫/৩৮৩)

ষাট জনের খ্রিস্টান কাফেলা লর্ড বিশপের নেতৃত্বে আসরের নামাযের পর মসজিদে নববীতে এসে পৌঁছল। দিনটি সম্ভবত রবিবার ছিল তাই খ্রিস্টানদের ইবাদতের সময় হলো। তারা মসজিদের ভেতর ইবাদত করতে লাগলে সাহাবায়ে কেরাম তাদের বাধা দিতে চাইলেন। তখন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাদের ছেড়ে দাও বাধা দিওনা। অতঃপর পূর্বদিকে মুখ করে তারা নিজেদের নিয়মানুসারে ইবাদত করল।

ইতিহাসের বর্ণনাতে ঠিক এমনিই ব্যক্ত হয়েছে। দালায়েলুন নবুওয়াহ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে-

لما قدم وفد نجران على رسول الله ﷺ دخلوا عليه مسجده بعدا لعصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون فى مسجده فاراد الناس منعهم فقال رسول الله ﷺ دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلواصلاتهم-(دلائل النبوة ٣٨٢/٥،طبقات ابن سعد ٢٤١/١، تاريخ ابن كثير ٥١/٥)

সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহের বক্তব্য এখানে অভিন্ন। খ্রিস্টান দল মসজিদে নববীতে তাদের ধর্মের ইবাদত আদায় করতে চাইলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বাধা দিতে যান। এমতাবস্থায় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাধা দিতে বারণ করেন। ঘটনা এতটুকুই। কিন্তু কোয়ান্টাম কোনো রেফারেন্স ছাড়া ঘটনাটি যেভাবে পেশ করেছে বাস্তবতার সাথে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল আলাপ-আলোচনা শেষে যখন তারা বললেন যে, আমাদের তো এখন প্রার্থনার সময় হয়েছে আমরা বাইরে গিয়ে প্রার্থনা করে আসি। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন, কেন তোমরা কি এই জায়গাটাকে তোমাদের প্রার্থনা করার মতো পবিত্র মনে করো না। (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৫১) এটা সম্পূর্ণ বিকৃত ও বানোয়াট বক্তব্য। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক খ্রিস্টানদের মসজিদে নববীতে প্রার্থনা করার আহ্বান একটি অসত্য কথা। তাছাড়া আলাপ-আলোচনা শেষে প্রার্থনার ঘটনা সঠিক নয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে আলোচনার আগেই প্রার্থনার ঘটনাটি ঘটে ছিল। মসজিদে পৌঁছে প্রথমেই তারা প্রার্থনা করে এরপর আলোচনায় বসেছিল। (নাজরান দলের বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য দেখুন : দালায়েলুন নবুওয়াহ ৫/৩৮৩, সীরাতে ইবনে হিশাম ২/১৭৫, ত্ববাকাতে ইবনে সা'আদ ১/৩৫৭, ফুতুহুল বুলদান ৭০, আল বেদায়া ৫/৫২, শরহুল মাওয়াহেব ৪/৪১)

কোয়ান্টামের ভ্রান্ত মতবাদ অনুসারে যেহেতু সব ধর্মই হক্ব। তাই ইহুদী-খ্রিস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ সকলের স্বার্থে তারা কাজ করে যাচ্ছে। নিজ নিজ ধর্মের সাচ্চা-পাক্কা অনুসারী হতে সকলকে উৎসাহিত করছে। আর এই কুফরী মতবাদের বৈধতা প্রমাণ করতেই সীরাতে নববীর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নাজরান খ্রিস্টানদের ইতিহাস বিকৃতরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম খ্রিস্টানদের বাধা দিতে চাইলেন কেন? যদি ইহুদী খ্রিস্টানদের সাথে কোয়ান্টামের মতো সম্পর্ক রাখা বৈধ হতো তবে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে গড়া ছাত্ররা মসজিদের ভেতর তাদের প্রার্থনায় বাধা দেয়ার কোনো কারণ ছিল না। তবে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেকোনো মাসলাহাতে বা কল্যাণের আশায় তাদেরকে একটু সুযোগ দিয়েছিলেন, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু তারা এই ভদ্রতার কোনো প্রতিদান দেয়নি বরং ইসলামের দাওয়াত উপেক্ষা করে জিযিয়া কর আদায়ের লাঞ্ছনা বরণ করে নিয়েছিল।

খ্রিস্টানদের প্রার্থনা মসজিদে নববীতে হতে পেরেছে বলে খ্রিস্টধর্ম বৈধ হয়ে যায়নি। তাহলে তো মসজিদে মলমূত্র ত্যাগ করাও বৈধ বলতে হবে। কারণ একবার মসজিদে নববীতে এক গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। সাহাবায়ে কেরাম দৌড়ে গিয়ে তাকে বাধা দিতে চাইলে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বারণ করেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) এর মানে মসজিদে পেশাব করার বৈধতা দেয়া নয়। বরং এখানে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো বিষয় ছিল। এখন যদি কোয়ান্টামের ফর্মুলা অনুসরণ করা হয় তবে এ ঘটনা থেকে মসজিদ অপবিত্র করার বৈধতা দিতে হবে।

উপেক্ষিত কুরআনের বাণী :

নাজরান খ্রিস্টানদের প্রতিনিধিদলের মদীনায় অবস্থান কালে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের প্রথম দিকের ৮০/৯০ খানা আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোয়ান্টামের কাছে এ সকল আয়াতের মর্মবাণী কোনো গুরুত্ব পায়নি। এ সকল

আয়াতের দাবি কী আর কোয়ান্টাম বলছেটা কী? কুরআনের শিক্ষার সাথে কোয়ান্টামের শিক্ষা কোনো মিল আছে কি না? সাধারণ নজরেই তা বোঝা সম্ভব। নাজরান প্রতিনিধিদলের ঘটনা কোয়ান্টাম যেভাবে উপস্থাপন করেছে তাতে কুরআনের এ সকল আয়াত উপেক্ষিত হয়েছে।

মূলত ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাজরানের প্রাদ্রীগণ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হলে পবিত্র কুরআনের এ সকল আয়াতের মাধ্যমে তার সমাধান পেশ করে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ :

১.তাওহীদ : খ্রিস্টানদল ঈসা (আ.) কে খোদা বা খোদার পুত্র দাবি করে বিভিন্ন মনগড়া দলিল পেশ করে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। এর জবাব সূরা আলে ইমরানের ১ম থেকে ৯ম আয়াতে দেয়া হয়। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও যৌক্তিকভাবে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন করে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়। বলা হয়, খোদা তো একমাত্র এমন সত্তাই হতে পারেন যিনি (الحي) চিরঞ্জীব হন। আর ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু অবধারিত তাই তিনি খোদা হতে পারেন না। তাছাড়া পূর্ববর্তী কোনো আসমানি কিতাবে এ ধরনের পিতা-পুত্রের শিরকী মতবাদের উল্লেখও নেই। আল্লাহ তো এমন সত্তা যিনি (العزيز الحكيم) মহাপরাক্রমশালী; মহাপ্রজ্ঞাবান। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.) এমন ক্ষমতাবান ছিলেন না। কঠিন বিপদের সময় জালেম ইহুদীদের হাত থেকে নিজেকেই রক্ষা করতে পারেননি। তাই তিনি খোদা হতে পারেন না। এছাড়া ৫৯-৬০ নং আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) কে হযরত আদম (আ.)-এর মতো মাটির তৈরি ঘোষণা করা হয়েছে। তাই ঈসা (আ.) খোদার পুত্র নন বরং শুধু মা থেকে মাতৃগর্ভে সৃষ্ট খোদার মাখলূক।

২. রিসালাত : নাজরানের খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহর মুহাব্বতের কারণেই ভক্তি ও উপাসনা করে বলে দাবি করেছিল। তাদের এই বক্তব্যের জবাব ৩১ নং আয়াতে রেসালাতের দাওয়াত পেশ করার মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর মুহাব্বত শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুহাব্বতে এবং কদমে কদমে তাঁর অনুসরণের মাঝে নিহিত রয়েছে। তাঁর অনুসরণ ছাড়া আল্লাহর ভালবাসার দাবি নিছক প্রতারণা মাত্র।

৩. সত্যধর্ম : নাজরান খ্রিস্টানদের এ কথা অবগতির জন্য- ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ যোগ্য নয়- ১৯ নং আয়াত অবতীর্ন হয়- "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।"

৪. মালদৌলত : রোম সম্রাটের দেয়া অর্থ-কড়ি আর মান-সম্মান হাত ছাড়া হওয়ার ভয়ে নাজরানের লর্ড বিশপ আবু হারেসা ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিল না। যেমনটি তার ভাই কুরজের কাছে মদীনায় আসার পথে প্রকাশ করেছিল। অস্থায়ী এই মাল-দৌলত ও মান-সম্মান আল্লাহর আযাব থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে না মর্মে ঘোষণা আসে ১০-১৭ নং আয়াতে। ঘোষণা করা হয় যে, সার্বভৌম শক্তির অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন বা ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন বা অপমানে পতিত করেন।

৫. মুবাহালা : তাওহীদ-রেসালাতের এই হৃদয়গ্রাহী দাওয়াতকে উপেক্ষা করে নাজরান খ্রিস্টানদল তাদের ত্রিত্ববাদ ও পুত্রত্ববাদের ভ্রান্ত ধর্মের দাবিতে অটল থাকলে মুবাহালার আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু নিশ্চিত ধ্বংস বুঝতে পেরে তারা মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হলো না। যার বিবরণ ৬১ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে।

৬. ফেতনাবাজ :
গোঁড়ামীর পরিচয় দিয়ে খ্রিস্টানদল তাওহীদ-রেসালাতের দলিলও মান্য করল না। আবার মুবাহালার সৎসাহসও দেখাল না। চাতুর্যতার মাধ্যমে প্রাণ বাঁচানোর জন্য কর আদায়ের শর্তে সন্ধি করল। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ফেতনাবাজ উপাধিতে ভূষিত করা হলো। ইরশাদ হচ্ছে, "নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ভাষণ। আর এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আর আল্লাহ; তিনিই হলেন পরাক্রমশালী মহাপ্রাজ্ঞ। তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে। তাহলে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ জানেন।" (আয়াত নং-৬২-৬৩)

৭. অভিসম্পাত : খ্রিস্টানদের কাছে সত্য প্রকাশের পরও তা কবুল না করার পরিণাম ৮৬-৮৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, "কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের হয়েছে। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব হালকাও হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না।"

ঐতিহাসিক পরিণতি :
পবিত্র কুরআনের ৮০/৯০ খানা আয়াত যাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলো, খুশিতে

আত্মহারা হয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণ করে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু না উল্টা ফেতনা সৃষ্টিকারী খেতাব আর অভিসম্পাত সাথে নিয়ে ফিরে এসে নাজরান খ্রিস্টানগণ ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্ত আরম্ভ করে। তাদের অনিষ্ট আর ফেতনা থেকে ইসলামের প্রাণকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাজিরায়ে আরব তথা আরব উপদ্বীপ থেকে এদের বসতি অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার ফরমান জারি করেন।

عن ابى عبيدة بن الجراحؓ قال: كان فى آخر ما تكلم به نبى الله ﷺ قال: اخرجوا يهود اهل الحجاز واهل نجران من جزيرة العرب- اسناده صحيح- (مسند احمد-١٦٩٩،الموسوعة الحديثية ٢٢٧/٣)

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবন সায়াহ্নে যে সকল নির্দেশনা দিয়ে গেছেন তার অন্যতম হচ্ছে- তোমরা আরব অঞ্চলের ইহুদী ও নাজরানবাসীদের আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করে দাও।" (মুসনাদে আহমদ হা. ১৬৯৯,৬৬৪)

প্রথম খলীফার যুগে :

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফাতুল মুসলিমীন নিযুক্ত হন। তাঁর খেলাফত আমলের সিংহ ভাগ সময় ব্যয় হয় বিভিন্ন বিদ্রোহী গোত্রের দমন ও মুসলমানদের সুসংহত করার পেছনে। এ সময় নাজরানবাসীদের কাছ থেকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা উসুল করে তাদের নিরাপত্তা দেয়া হয়। খাজনার পরিমাণ ছিল প্রতিটি চল্লিশ দেরহাম মূল্যের দুই হাজার জোড়া পোশাক। অর্থাৎ ২০০০×৪০= ৮০,০০০ (আশি হাজার) দেরহাম মূল্যের পোশাক, যা বর্তমান হিসেবে প্রায় বিশ হাজার ভরি রুপা সমমূল্য হয়।

দ্বিতীয় খলীফার যুগে :

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফত আমলে নাজরান খ্রিস্টানগণ খলীফার কাছে নিজেদের ঝগড়া-বিবাদের নালিশ নিয়ে এলে তিনি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ বাস্তবায়নের মোক্ষম সুযোগ পেয়ে নাজরান খ্রিস্টানদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী আরব উপদ্বীপ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনস্ত শামের উর্বর কিছু অঞ্চল তাদের আবাসনের জন্য নির্ধারণ করে দিলেন। মুসলমানদের কাছে নিজেদের বাস্তুভিটা বিক্রি করে নাজরান ছেড়ে খ্রিস্টানদের অনেকে শামে, অনেকে ইরাকের কূফা নগরীতে চলে গেল। আর পূর্বনির্ধারিত সেই কর আদায় করে ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপদে বসবাস করতে লাগল।

তৃতীয় খলীফার যুগে :

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী (রা.)-এর যুগে খ্রিস্টানদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের অনুরোধে উসমান (রা.) খাজনা থেকে দুই শত জোড়া পোশাক কমিয়ে দেন।

চতুর্থ খলীফার যুগে :

চতুর্থ খলীফা হিসেবে হযরত আলী (রা.) দায়িত্ব গ্রহণের পর ওই খ্রিস্টানদল খাজনা হ্রাসের অনুরোধ নিয়ে হাজির হলে তিনি তা নাকচ করে দেন এবং হযরত উমর (রা.)-এর নিয়ম বহাল রাখেন।

পরবর্তী খলীফাদের যুগে :

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে খ্রিস্টানগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অনেকে মৃত্যুবরণ করে। আবার অনেকে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের এই করুণ অবস্থা বিবেচনা করে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আরো দুই শত জোড়া কমিয়ে মোট চারশত জোড়া মাফ করে দেন। এরপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমলে আরো একশত জোড়া হ্রাস করে মোট তেরশত জোড়া কর ধার্য্য করা হয়। এরপর উমর ইবনে আব্দুল আজিজের (রহ.) আমলে তাদের সংখ্যা কমে পূর্বের তুলনায় এক দশমাংশে পৌঁছে যায়। তাদের অনুরোধে তিনি জিযিয়া করের পরিমাণ কমিয়ে সর্বসাকুল্যে দুইশত জোড়া ধার্য্য করেন। (আল কামেল ফিততারীখ-২/২০০)

শেষ কথা :

আসুন এবার কোয়ান্টামের অবস্থা যাচাই করি। নাজরান খ্রিস্টানদল ইসলাম গ্রহণ না করে, তাওহীদ-রেসালাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যে অভিসম্পাতের স্বীকার হলো আর ঐতিহাসিকভাবে যে লাঞ্ছনা বরণ করল তাদের ঘটনা থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ আর খ্রিস্টধর্মের বৈধতা প্রমাণ হয় কি? অথচ কোয়ান্টাম নাজরানদলের উক্ত ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ করতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। বিধর্মীদের সাথে মাখামাখি আর সকল ধর্ম পালনে উৎসাহ প্রদানের বৈধতা প্রমাণের মিথ্যা যুক্তি পেশ করেছে কোয়ান্টাম।

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে মূলত ইসলাম গ্রহণের আহবানে সাড়া দিতেই ইহুদী-খ্রিস্টান বা পৌত্তলিকদের আগমন হতো। আর যারা আসত তাদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া হতো এবং সকল ভ্রান্ত ধর্ম, কুফর-শিরক পরিত্যাগের কথা বলা হতো। কোয়ান্টামের মতো যার যার ধর্ম পালনে পারদর্শী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হতো না ওখানে।

কোয়ান্টাম মেথড-১৩

অমুসলিমদের প্রতি উদারতা

মুফতী শরীফুল আ'জম

শূন্য কোঠার জ্ঞান নিয়ে বর্তমান সময়ে যে বিষয় নিয়ে উদ্দম আলোচনায় মত্ত হওয়া যায় তা হচ্ছে ইসলাম। ধর্মের প্রতি উদাসীনতার একটি কুফল এটি। যে যার মতো ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করে নিজেকে ধার্মিক পরিচয় দিচ্ছে। নিজস্ব ব্যাখ্যা সাপেক্ষে ধর্ম পালন মহামারী আকার ধারণ করেছে। ইসলামের উদারতার দোহাই দিয়ে কেহ ধর্মের বিধিবিধানে কাটছাঁট করে মডার্ন বানাচ্ছে। আবার কেহ ইসলামের স্বকীয়তা ক্ষুণ্ন করে সকল ধর্মের সাথে একে গুলিয়ে ফেলছে। জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত মানুষের মুখে 'ধর্মের কোনো বাড়াবাড়ি নেই', 'অন্যের দেবতাকে গালি দিওনা' বা 'ধর্ম যার যার' ইত্যাদি বুলির খৈ ফুটতে দেখা যায়। মূলত পবিত্র কুরআনের কতক আয়াতের সঠিক তাফসীর না জানাতে এই ভুলের সূত্রপাত। সমাজের এহেন হ-য-ব-র-ল অবস্থার মাঝে কোয়ান্টাম মেথড ঢিল ছুঁড়তে ভুল করেনি। ইসলামের উদারতার অপব্যাখ্যা করতে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত বিকৃতরূপে উল্লেখ করেছে কোয়ান্টাম কণিকায়। কোয়ান্টাম তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে হক্ব-বাতিলে তফাত মিটিয়ে দিয়েছে। ইসলামের উদারতার দোহাই দিয়ে সকল ধর্মকে সত্যধর্ম ইসলামের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। বস্তুত ইসলাম ভিন ধর্মের প্রতি উদার ঠিক তবে সেই উদারতার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ও সীমারেখা রয়েছে। আজকের আলোচনায় বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।

ঈমান-আমলের ব্যাপারে উদারতা নয় : উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষায় ইসলামের সাথে কোনো ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু এই উদারতা মানবিক অধিকার ও ব্যক্তিগত বিষয়ে হয়ে থাকে। ঈমান-আক্বীদা বা আল্লাহর আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোনো প্রকার উদারতার অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে হক্ব বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী, তদুপরি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চাই। প্রকৃত পক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর তাঁর রাসূলের ওপর এবং তাদের কারো প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা আন নিসা ১৫০-১৫২)

এখানে ঈমানদার ও বেঈমানের পরিণতি স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। কুফরে অটল থেকে কেহ পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না। সেথায় সফলতা আর সুখ-শান্তি একমাত্র ঈমানদারের প্রাপ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ঈমান-আমলের প্রশ্নে উদারতার কোনো স্থান নেই। বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ মা'আরিফুল কুরআনে উক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে বলা হয়েছে- কুরআন হাকীমের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা "ওইসব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ফাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্ম মত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যগ্র। যারা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফায়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদের বোঝাতে চায় যে, মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র মুক্তিসনদ নয়, বরং ইহুদী ও খ্রিস্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে-কর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রাসূলকে অথবা অন্তত; কোনো কোনো পয়গাম্বরকে অমান্য করে। ফলে তাদের কাফের ও জাহান্নামি হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও এহসান বা হিতকামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজিরবিহীন। কিন্তু উদারতা বা সহানুভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় হয়ে থাকে, যা আমরা যেকোনো ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতে পারি। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনাধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম একদিকে অমুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরম সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম

অমুসলমানদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কুপ্রথার প্রতি পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দুটি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র বজায় রাখলে চলবে না বরং সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে হবে। এ কথা কুরআন ও হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন পাক ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যেকোনো ধর্ম মতের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। হযরত রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ পরিচালনা করা এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত ও কুরআন নাযিল করা নিরর্থক হতো। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা)

পরীক্ষকের উদারতা :

অমুসলমানদের প্রতি ইসলামের উদারতাকে পরীক্ষকের উদারতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। পরীক্ষার হলে ছাত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ভুল-সঠিক যাচ্ছেতাই সে লিখতে পারে। পরীক্ষক তার ভুল বুঝতে পারলেও লিখতে বাঁধা দেন না বরং উদারতার পরিচয় দিয়ে তিন ঘণ্টা সময় তাকে স্বাধীনভাবে লিখতে দেন, তবে এই উদারতা কিন্তু ভুলের স্বীকৃতি নয় নিছক পরীক্ষা মাত্র। খাতা দেখার সময় কোনো প্রকার ছাড় দেয়া হবে না। তদ্রুপ অমুসলমানদের প্রতি ইসলাম যে উদারতার বিধান রেখেছে তা দুনিয়ার এ পরীক্ষার হলেই সীমাবদ্ধ। এখানে কুফর পালনের স্বাধীনতা দেয়া হলেও শেষ বিচারের দিন ছাড় দেয়া হবে না। ভুলের খেসারত তখন অবশ্যই দিতে হবে। তাই ইসলামের এই উদারতাকে কুফর-শিরকের স্বীকৃতি ভাবার কোনো অবকাশ নেই। অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে কুফর-শিরকের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে সতর্ক করা হয়েছে।

ধর্ম যার যার :

অনেক জ্ঞানী-গুণী শিক্ষিত ভাইদের মুখে সুরা কাফিরুনের একটি আয়াত–

لکم دینکم ولی دین

(লাকুম দ্বীনুকুম) এ ধরনের আলোচনায় জোরালোভাবে তুলে ধরতে দেখা যায়। এ আয়াত থেকে ধর্ম যার যার থিউরি প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। আয়াতের সঠিক অনুবাদ ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানা না থাকায় মূলত তাদের এ ভুলটির সূত্রপাত।

তাবারানী এর সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যের ইবাদত করবেন। (মাযহারী)

আবু সালেহ এর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কার কাফেররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোনো প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল (আ.) সূরা কাফিরুন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফেরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহ তা'আলার অকৃত্রিম ইবাদতের আদেশ আছে। (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন)

ইরশাদ হচ্ছে- "বলুন, হে কাফেরকুল। আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত করো। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা করো। তোমরা ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য। (সূরা কাফিরুন) অর্থাৎ আমি এক্ষণে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত করো না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না।

উক্ত সূরায় শেষ আয়াত–

لکم دینکم ولی دین

এর বিকৃত অনুবাদ ধর্ম যার যার মতবাদের উৎস। এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে دین (দ্বীন) শব্দটি এখানে প্রতিদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা ফাতেহায় مالك يوم الدين এর মাঝে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থ প্রতিদান দিবসের অধিপতি। এখানে دین(দ্বীন) অর্থ ধর্ম নয়। অতএব তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম অনুবাদ করা ভুল। তাফসীর বিশারদগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- لکم دینکم এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে বরং এর সারমর্ম হলো- "যেমন কর্ম তেমন ফল।" (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

বোঝা গেল যে, মক্কার কাফেরদের পক্ষ

থেকে দেয়া শান্তি চুক্তির প্রস্তাবটি ইসলামের মূল শিক্ষা তাওহীদের পরিপন্থী হওয়ায় কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইসলামের উদারতা আপন জায়গায় ঠিক আছে কিন্তু ধর্মের মূলনীতির ব্যাপারে কোনো রূপ ছাড় নেই। কাজেই সূরা কাফিরুন এ ধরনের উদারসন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন সময় কাফেরদের সাথে সন্ধি বা শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু এসকল চুক্তির কোনো ধারাতে ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কোনো বিষয় ছিল না। বরং সর্বত্র ইসলামের বড়ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে আর অন্য সকল ধর্মের অসারতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। যার যার ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কিন্তু সকল ধর্মের স্বীকৃতি বা বৈধতা দেয়া হয়নি। "ধর্ম যার যার" এ কথার শিক্ষা ইসলামে নেই, আছে "যেমন কর্ম তেমন ফল" এ কথার শিক্ষা। ঈমান-আমলের ফল জান্নাত আর কুফর-শিরকের ফল জাহান্নাম। ইরশাদ হচ্ছে- "যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সুরা আন নাযিআত-৩৭-৪১)

পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ :

অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম যে উদারতার ও ইনসাফের পরিচয় দিয়েছে অন্যান্য জাতির ইতিহাসে তা একান্তই বিরল। এ ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ সদ্ব্যবহার, সহানুভুতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির স্বরূপ নির্ণয় করে দেয়া হয়েছে। দুই ব্যক্তির অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

১. একটি স্তর হলো, আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার। এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে। অমুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েয নয়। (সূরা আলে ইমরান-২৮)

২. সমবেদনার স্তর, এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক যুদ্ধরত অমুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অমুসলমানদের সাথে স্থাপন করা জায়েয। (সুরা মুমতাহিনা-৮)

৩. সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অমুসলমানের সাথেই এটা জায়েয। সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতে–

الاان تتقوا منهم تقة

বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. লেনদেনের স্তর। অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাও সব অমুসলমানের সাথে জায়েয। তবে এতে যদি মুসলমানের ক্ষতি হয় তবে জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে অমুসলিমদের জন্য কতটুকু উদারতা ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা বর্তমান রয়েছে।

বন্ধুত্ব নিষিদ্ধের কারণ :

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কুরআন কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন এত কঠোরভাবে নিষেধ করে কেন? কোনো অবস্থাতেই এরূপ সম্পর্ক জায়েয না হওয়ার রহস্য কী? এর একটি বিশেষ কারণ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জগতের বুকে মানুষের অস্তিত্ব সাধারণ জীব-জানোয়ার অথবা জঙ্গলের বৃক্ষও লতা-পাতার মতো নয় যে, জন্ম লাভ করবে, বড় হবে, এর পরে মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং ইসলাম মনে করে যে, মানুষের জীবন একটি উদ্দেশ্যমূলক জীবন। মানুষের খাওয়া-পরা, উঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ এমনকি, জন্ম-মৃত্যু সবই একটি উদ্দেশ্যের চারপার্শ্বে অবিরত ঘুরছে। এসব কাজকর্ম যতক্ষণ সে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ততক্ষনই তা নির্ভুল ও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যের বিপরীত হয়ে গেলেই তা অশুদ্ধ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও ইবাদতই যখন মানব জীবনের লক্ষ্য, তখন জগতের কাজকারবার, রাজ্যশাসন, রাজনীতি ও পারিবারিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীন। অতএব যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী সে মানবতার প্রধান শত্রু।

বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এ বিষয় বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

من احب لله وابغض لله فقداستكمل الإيمان-

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুত্ব ও শত্রুতাকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে দেয়, সে স্বীয় ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।" এতে বোঝা গেল যে, স্বীয় ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা ও বিদ্বেষকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে দিলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অতএব মুমিনের আন্তরিক বন্ধুত্ব এমন ব্যক্তির

সাথেই হতে পারে, যে এ উদ্দেশ্য হাসিলে তার সঙ্গী এবং আল্লাহর অনুগত। এ কারণে কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, ওরা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন)

কোয়ান্টামের উদারতা:

উদারতার ইসলাম নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে গেছে কোয়ান্টাম। 'যেমন কর্ম তেমন ফলে'র কথা প্রচারের পরিবর্তে 'ধর্ম যার যার' দর্শন প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এর স্বপক্ষে তারা পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াতের অংশ বিশেষ বিকৃতরুপে উপস্থাপন করেছে। কোয়ান্টাম কণিকার ২৯৯ নং পৃষ্ঠায়।

১. তোমরা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।" (নিসা-২৭১)

২. "অন্যের দেবতাকে গালি দিও না।" (আনআম-১০৮)

৩. ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। আলোর পথ এখন সুস্পষ্ট।" (বাকারা-১৫৬)

ইসলামের কোনো বিধিবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ খণ্ডন করতে অথবা যার যার ধর্ম পালনের বৈধতা প্রমাণের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম এ আয়াত তিনটির অপপ্রয়োগ করে থাকে। অথচ বাস্তব পক্ষে এ সকল আয়াত ইহুদী-খ্রিস্টান আর কুফর-শিরকের প্রতি ধিক্কার আর তিরস্কার জ্ঞাপনার্থে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াত তিনটি পূর্ণাঙ্গরূপে সঠিক প্রেক্ষাপটসহ পর্যালোচনা করলেই কোয়ান্টামের গোঁজামিল স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এক.

সুরা নিসার আয়াত খানির আংশিক বাদ দিয়ে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করেছে কোয়ান্টাম। পূর্ণ আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে, "হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রুহ তারই কাছ থেকে আগত। অতএব তোমরা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে মান্য করো। আর এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, এ কথা পরিহার করো, তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তানসন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আন নিসা-১৭১)

উক্ত আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদী খ্রিস্টানগণকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এ বাড়াবাড়ি রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে অতি ভক্তি করতে গিয়ে খোদার পুত্র সাব্যস্ত করেছে। অপর দিকে ইহুদীরা তাঁকে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। উক্ত আয়াতে তাদের এই কুফর শিরকের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। এবং ত্রিত্ববাদের অসারতা তুলে ধরে একত্ববাদের আওয়াজ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আফসোস! কোয়ান্টাম এ আয়াত থেকেই উল্টা ইহুদী খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধর্মের বৈধতা দিতে চায়। কুফর-শিরকের প্রতি নীরব সমর্থন ও উদারতা প্রকাশ করতে চায়। মনে রাখতে হবে, যে কাজের যে সীমারেখা শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে তা অতিক্রম করাই হচ্ছে বাড়াবাড়ি। সুন্নাহ সম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই ধর্মে বাড়াবাড়ি হিসেবে গণ্য হবে। অতএব অমুসলিমদের প্রতি উদারতার সীমারেখা লঙ্ঘন করে কোয়ান্টাম নিজেই বাড়াবাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে।

দুই.

কোয়ান্টাম কণিকায় বিকৃতরূপে উল্লেখিত সূরা আল আনআমের আয়াতটির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক অনুবাদ হচ্ছে, "তোমরা তাদের মন্দ বলো না, যাদের তারা অরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা দৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদের বলে দেবেন যা কিছু তারা করত। (সুরা আল আনআম-১০৮)

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট : ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযুল এই, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতৃব্য আবু তালেব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শত্রুতায়, নির্যাতনে এবং হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিক সর্দাররা আবু তালেবকে বলল, আপনি আমাদের মান্যবর এবং সর্দার আপনি জানেন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা উপাস্য করবেন। আমরা কিছুই বলব না।

আবু তালেব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কাছে ডেকে বললেন, এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে

এসেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিনিধি দলকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা কী চান? তারা বলল, আমাদের বাসনা, আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আচ্ছা যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নিই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের অধিপতি হয়ে যাবেন। এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে।

আবু জাহল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কী? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" এ কথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবু তালেবও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন, ভ্রাতাপুত্র এ কালেমা ছাড়া অন্য কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কালেমা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : চাচাজান, আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কোনো কালেমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কুরাইশ সর্দারদেরকে নিরাশ করে দিলেন। এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল, হয় আপনি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকেও গালি দিব এবং ওই সত্তাকেও আপনি নিজেকে যার রাসূল বলে দাবি করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়,

ولاتسبواالذين يدعون من دون الله فيسبواالله عدوا بغير علم۔

অর্থাৎ, আপনি ওই প্রতিমাদের মন্দ বলবেন না, যাদেরকে তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহকে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোনো মানুষকে বরং কোনো জন্তুকে কখনো গালি দেননি। সম্ভবত কোনো সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোনো কঠোর শব্দ বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

দেব-দেবীর স্বরূপ :

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কুরআনের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এসব আয়াত রহিত নয়। অদ্যাবধি এগুলো তেলাওয়াত করা হয়।

উত্তর এই যে, কুরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসেবে কোনো সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তা বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারো মনে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষার বিশেষ বাক পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনো কোনো বিষয়ের তথ্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা হয়; যেমন সাধারণত আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকিমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না।

তেমনি কুরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছে যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতা ফুটে ওঠে। বলা হয়েছে- ضعف الطالب والمطلوب অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে- انكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم অর্থাৎ, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা সবাই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয় পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কু-পরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন)

অতএব বোঝা গেল, উক্ত আয়াতে অন্যের দেবতাকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু এতে দেব-দেবীর স্বীকৃতি দেয়া হয়নি বা তাদের পূজা অর্চনাকে বৈধ করা হয়নি। বরং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাদের অসারতার কথা তুলে ধরে প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাহলে কোয়ান্টাম কেন? ইসলামের উদারতার

দোহাই দিয়ে সকল ধর্ম পালনের বৈধতা দিচ্ছে? দেব-দেবীর অসারতার কথা কুরআনে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কোয়ান্টাম কেন সেটা তুলে ধরছে না? এ ধরনের গোঁজামিল উদারতা নয় বরং ধোঁকা প্রতারণার শামিল।

তিন.

কোয়ান্টাম সূরা বাকারার আয়াতটিও আংশিক উল্লেখ করেছে। পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছে- "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহকে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙার নয়। আর আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন। (সূরা আল বাকারা-২৫৬)

হযরত ওমর (রা.) একজন বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করব? হযরত ওমর (রা.) এ কথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন- لا اكراه فى الدين অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়।" তাই স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়েই ইসলাম গ্রহণ করতে হয়। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

উক্ত আয়াতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য বল প্রয়োগ করতে নিষেধ করা হয়েছে ঠিক কিন্তু এতে অন্য সব ধর্মের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। বরং ইসলামের রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মাঝেই মুক্তি নিহিত থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তা বিবেক বুদ্ধি খাঁটিয়ে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হবে। জোর করে গ্রহণ করানো যাবে না। আর স্বেচ্ছায় কেহ যদি ইসলামকে গ্রহণ না করে পরকালে শেষ বিচারে তার পরিণতি কী হবে তার ঘোষণা পরের আয়াতেই দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী। চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।" (সূরা আল বাকারাহ-২৫৭)

বোঝা গেল, ঈমান গ্রহণ না করার ফলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। এটাই মহান রাব্বুল আলামীনের ফয়সালা। পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম। কোয়ান্টাম ইসলামকে যেভাবে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করেছে সেটা নিছক তাদের চাতুর্যতা ও মিথ্যাচার মাত্র। মুসলমানের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস আর অমুসলিমদের চিরস্থায়ী দোযখের বন্দোবস্ত করতেই তারা ইসলামের উদারতাকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের চক্রান্ত থেকে আল্লাহ পাক মুসলিম-অমুসলিম সকলকে হেফাজত করুন। আমীন!!

কোয়ান্টাম মেথড-১৪

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান...

মুফতী শরীফুল আ'জম

"দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে"– কোয়ান্টামের একটি প্রসিদ্ধ স্লোগান। তাদের বিভিন্ন বই-পুস্তক বা স্টিকার আকারে দোকানপাট ও যানবাহনে শ্রুতিমধুর আহবানটি সকলের নজর কাড়ে। কিন্তু এ বাক্যটির মর্ম কী? কিসের বদলে কী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে এখানে? যে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর আহবান করা হচ্ছে তা আদৌ বদলযোগ্য কি না? আর নতুন যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে তা গ্রহণযোগ্য ও নিখাদ কি না? চৌদ্দশত বছর যাবৎ ইসলামের যে সকল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে লালিত হয়ে আসছে তা বদলে ফেললে ঈমান ধ্বংসের মুখে পতিত হবে কি না? প্রথমে এ সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে। এরপর কোয়ান্টামের ওই আহ্বানে সাড়া দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকদের হাতে সোপর্দ করে দেননি যে, তারা জীবনযাপনের জন্য সফলতা আর প্রশান্তির সূত্র আবিষ্কার করবে আর মানবজাতি তাদের গবেষণার উপর নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেবে। সুখ-শান্তি আর সফলতার খুঁজে ছুটবে তাদের গবেষণাগারে। বরং যেভাবে তিনি মানবজাতির স্রষ্টা, তদ্রুপ তাদের বিধাতাও বটে। মানুষের উভয় জাহানের সফলতা আর চিরস্থায়ী অনাবিল প্রশান্তির সঠিক, সফল ও কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি বা নজরীয়া তিনি প্রবর্তন করেছেন। যাকে দ্বীন বা শরীয়ত বলা হয়। শুধু তাই নয়, এ সকল বিধিবিধানের শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে ১০০% গ্যারান্টিও প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনের একেবারে শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে-

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"এ সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। পথপ্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য।" (সূরা আল বাকারা-২)

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (সূরা আল বাকারা-২৩)

কারো কথায় বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দুই কারণে হতে পারে। এক. উক্ত কথা বা বক্তব্যের মাঝে কোনো ভুল-ভ্রান্তির কারণে। দুই. শ্রোতার বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতা বা হঠকারিতার দরুন। উল্লেখিত প্রথম আয়াতে প্রথম প্রকারের সন্দেহ বিদূরিত করা হয়েছে। তাই এটা সর্বপ্রকার ভুল ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে শতভাগ বিশুদ্ধ একটি দ্বীন বা শরীয়ত। এর সকল দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক পূর্ণাঙ্গ ও সফল। আর একমাত্র অনুসরণীয় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত এ সকল দৃষ্টিভঙ্গি। এ ছাড়া মানব রচিত বা বিজ্ঞানপ্রসূত যত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার সবই ভ্রান্ত ও নিশ্চিত ব্যর্থ। ইসলামের জীবন বিধান ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না। কোনো মুমিন মুসলমান যদি সত্যিকার অর্থে মুমিন হয়ে থাকে তবে সে ইসলাম প্রণীত দৃষ্টিভঙ্গির বদলে কোয়ান্টামের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে পারে না।

সন্দেহের অপর প্রকারটি মানুষের নির্বুদ্ধিতা বা হঠকারিতাজনিত। তৎকালীন আরবের কাফের-মুশরিকগণ জেনে-বুঝেও কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি। হঠকারিতা ও বক্রতার কারণে সর্বদা সংশয় আর সন্দেহ প্রকাশ করত। তাদের এ সন্দেহ যে অমূলক ও ভিত্তিহীন এ কথাটি স্পষ্ট করে দিতে দ্বিতীয় আয়াতে সহজ একটি ফর্মুলা দেয়া হয়েছে। "যদি এ কালাম মানব রচিতই হয়ে থাকে তবে তোমরাও তো মানুষ। পারলে এমন ছোট্ট একটি সূরা রচনা করে দেখাও।" সেই থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারেনি, আগামীতেও পারবে না। অতএব বুদ্ধির স্বল্পতা বা হঠকারিতাহেতু ইসলামের বিধিবিধান বা এর সফল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কারো মনে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে এ নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি প্রদান করেছে।

তাই কোয়ান্টামের গুরুজি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বদলে নামকরা বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের রেফারেন্স দিয়ে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বাহার প্রদর্শনের যতই চেষ্টা

করুক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে ওই সকল মানব রচিত সূত্র অনুসরণের কোনো অবকাশ নেই। ইসলামের ব্যাপারে মানুষের মনে, লোক সমাজে যতই সন্দেহ সৃষ্টি করা হোক আর অনিশ্চয়তা জন্ম দেয়া হোক এ কথা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতে হবে যে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিই একমাত্র সঠিক, বাকি সব ভ্রান্ত।

কথা-কাজের মিল কাম্য :

নামাযের প্রতি রাকা'আতেই আমরা মহান আল্লাহর দরবারে একটি দু'আ করে, থাকি–

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

'আমাদেরকে সরল পথ দেখাও"। (সুরা আল ফাতিহা-৫)

এই প্রার্থনারই প্রত্যুত্তর হচ্ছে সমগ্র কুরআন শরীফ। এটি সিরাতে মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। যেন মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে ইরশাদ করেছেন- আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল সূর্যসদৃশ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে। বান্দার প্রার্থনার উত্তরে মাওলার পক্ষ থেকে এমন সাড়া আসার পর মুখ ফিরিয়ে নেয়া কি কোন মুমিনের পক্ষে সম্ভব? তাহলে কুরআন-সুন্নাহর নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে কোয়ান্টামের মনগড়া জীবনদৃষ্টি গ্রহণের অবকাশ কোথায়? নামাযে দাঁড়িয়ে সিরাতে মুস্তাকীমের প্রার্থনা আর নামাযের বাইরে কোয়ান্টামের সাধক আর দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি :

কোয়ান্টাম যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কথা বলছে তার পেছনে কুরআন-সুন্নাহর কোনো রেফারেন্স নেই। আছে শুধু মানব সন্তানের মেধা আর অভিজ্ঞতার ফসল। আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র 'কোয়ান্টাম কণিকা' গ্রন্থের শুরুতে বলা হয়েছে। "সাধকদের জ্ঞানের নির্যাস আর আধুনিক বিজ্ঞানের সুবিন্যাসায়নের ফলাফল এই হাজার সূত্র"। (কোয়ান্টাম কণিকা পৃ: ৩) এ থেকে বোঝা যায় এ সকল সূত্র আর দৃষ্টিভঙ্গির উৎসমূল আসলে কী? ঈমানের মতো দৌলত হাতছাড়া হওয়ার কারণে যে সাধকগণ জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে, তাদের ফর্মুলা মেনে সফল হওয়ার দাবি হাস্যকর। যে বিজ্ঞান যুগে যুগে পরিবর্তন হয়ে পূর্বের থিউরিকে ভুল প্রমাণ করছে তার উপর আস্থা রেখে জীবন পরিচালনা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

কোয়ান্টাম কণিকার সঠিক জীবনদৃষ্টি নামক অধ্যায়ে ছোট ছোট বাক্যে ২৭৭টি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা হয়েছে। এতগুলো দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা হলেও ঈমান-আমলের কোনো কথা ওখানে স্থান পায়নি। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের কোনো আলোচনা সেখানে নেই। আছে শুধু বস্তুবাদ আর নাস্তিক্যবাদের শিক্ষা। আর এ সকল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কথাই কোয়ান্টাম ঘটা করে প্রচার করে যাচ্ছে। ঈমান-আমল ছাড়াই তারা মানুষের মুক্তি আর সফলতার পথ দেখাচ্ছে। পরকালের কোনো ধারণাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নেই।

নিজেদের এ সকল মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গিকেই আবার সঠিক বলে জোর গলায় দাবি করে কোয়ান্টাম। উল্লেখিত বইয়ের ভূমিকায় বলা হয়েছে, "সঠিক জীবনদৃষ্টি সব সময় আপনাকে রক্ষা করবে চলার পথে হোঁচট খাওয়া থেকে। আর এই সঠিক জীবনদৃষ্টি গড়তে সাহায্য করবে প্রশান্তি অধ্যায়।" (কোয়ান্টাম কণিকা-৬)

সাধকদের জ্ঞান আর বিজ্ঞানীদের দর্শন যে জীবনদৃষ্টির মূল উৎস তার অসারতা অনুধাবণের জন্য পবিত্র কুরআনে সামান্য দৃষ্টি বুলালেই চলে। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى

"এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ কোনো দলিল নাযিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে।" (সূরা আন নাজম-২৩)

বোঝা গেল, প্রবৃত্তির অনুসরণে রচিত সাধকদের মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যার পেছনে কুরআন-সুন্নাহর কোনো দলিল থাকবে না, তা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গণ্য হবে।

কুরআনের নিন্দাবাদ :

ইহুদী-খ্রিস্টানরা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূলের আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলেম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছিল। এরই প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে আয়াত অবতীর্ণ হয়-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট

ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তারা তাঁর যে শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র।" (সূরা আত তাওবাহ-৩১) ইহুদী-খ্রিস্টানরা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলত; তা আল্লাহ রাসূলের যতই বরখেলাফ হোক না কেন? পুরোহিতগণের আল্লাহ রাসূলবিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর। আর এটি হলো প্রকাশ্য কুফরী। (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন)

কোয়ান্টামের অবস্থাও তাই। সাধক আর পণ্ডিতদের উক্তি আর বাণীকে তারা অনুস্মরণীয় মনে করছে। গুরুজি মহাজাতকের উদ্ভাবিত দৃষ্টিভঙ্গিকে জীবনযাপনের সফল মাইলফলক হিসেবে গ্রহণ করা হচেছ। কুরআন-সুন্নাহর সাথে তা যতই সাংঘর্ষিক হোক না কেন? গুরুজিকে নতুন পরিত্রাণ দাতা ভাবা হচ্ছে। আর এটা প্রকাশ্য কুফরী ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম প্রদত্ত জীবন বিধান আর দৃষ্টিভঙ্গির বদলে কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহবান মূলত ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগের আহ্বান।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষতি :

কোয়ান্টাম জীবন বদলে দেয়ার জন্য যে সকল দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আহ্বান করছে তা গ্রহণ করা হলে ভয়াবহ সংকটে পড়বে ঈমান। ঈমানবিনাসী ওই সব দৃষ্টিভঙ্গির উপর ধার্মিকতার লেবেল এঁটে গোপন রাখা হয়েছে এর বিষক্রিয়া। নিজের অজান্তে ঈমান হারিয়ে সাধক সেজে বসার এক চমৎকার মেথড এই কোয়ান্টাম। মুসলমানদের সর্বসম্মত পথ মত ছেড়ে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী হলে এর ফল কী হবে, এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব, যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" (সূরা আন নিসা-১১৫)

অর্থাৎ, কারো কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও যদি সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশের বিরোধিতা করে আর সকল মুসলমানের পথ ছেড়ে নিজস্ব ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

উলামায়ে কেরাম এ আয়াত থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, উম্মতের ইজমা মেনে নেয়া ফরয। এর বিরোধিতাকারী বা অস্বীকারকারী জাহান্নামী। (তাফসীর শাব্বির আহমদ উসমানী)

এখন এ আয়াতের আলোকে কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি পরখ করে দেখলে ফলাফল কী দাঁড়াবে? কুরআন-সুন্নাহ আর সকল উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলে কোয়ান্টামের মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব গবেষণাপ্রসূত সফলতার সূত্র অবলম্বন জাহান্নামের ঠিকানা নিশ্চিত করবে।

একটি হাদীসে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে-

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ ان الله لا يجمع امتى او قال امة محمد على ضلالة، ويد الله على الجماعة ومن شذشذ فى النار-(ترمذی-٢١٦٧)

"হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে কোনো গুমরাহীর উপর একমত করবেন না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দলবদ্ধতার সাথে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সে জাহান্নামে নিপতিত হয়।" (তিরমিযী-২১৬৭)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন-

قوله من شذشذ فى النار أى إنفرد عن الجماعة باعتقاد او قول او فعل لم يكونوا عليه

"বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হলো, উম্মতের সর্বসম্মত আক্বীদা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করা।" (মেরকাত১/৩৮২)

অতএব কোয়ান্টাম উম্মতে মুহাম্মদীর ঐক্যমত ভিন্ন নতুন যে পথে মানুষকে নিতে চাচ্ছে, নতুন যে দৃষ্টিভঙ্গি শেখাতে চাচ্ছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা নিশ্চিত জাহান্নামে গমনের পথ।

কোয়ান্টামের চতুরতা :

কোয়ান্টাম নিজেদের সকল অপকীর্তি ঢাকার জন্য উক্ত হাদীসে বর্ণিত (يدالله) (على الجماعة) জামা'আত বলতে তাদের নিজেদের সঙ্ঘকে বুঝিয়েছে। তাদের মতে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাদের সঙ্ঘের সাথে রয়েছে। উক্ত হাদীসের বিকৃত অনুবাদ কোয়ান্টামের হাদীস কণিকায় এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ থাকো। সঙ্ঘের সাথে আল্লাহর রহমত থাকে। যে বিচ্ছিন্ন হয় সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়। তিরমিযী (কোয়ান্টাম কণিকা পৃ: ৩২১) -এর সাথে পর পর আরো দুটি হাদীসের

বিকৃত অনুবাদ পেশ করা হয়েছে।

এক. "যে ব্যক্তি বায়াতের বন্ধন (সঙ্ঘ ও নেতার প্রতি আনুগত্যের শপথ) ছাড়া মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।" -মুসলিম

দুই. নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে একজন যুগসংস্কারক পাঠাবেন, যিনি শাশ্বত ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।- আবু দাউদ (কোয়ান্টাম কণিকা ৩২১)

কোয়ান্টাম সূত্র অনুযায়ী এই তিনটি হাদীসের যোগফল হচ্ছে তাদের সঙ্ঘ ও নেতা গুরুজির আনুগত্যের অপরিহার্যতা এবং তাকে নতুন শতাব্দীর মুজাদ্দিদ প্রমাণ করা।

সাধারণ মানুষকে নিজেদের সঙ্ঘে সঙ্ঘবদ্ধ করতে এই চতুরতার আশ্রয় নিয়েছে কোয়ান্টাম। অথচ উক্ত হাদীসে উল্লেখিত (جماعة) জামা'আত বলতে কারা উদ্দেশ্য তা ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে-

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ اتبعواالسوادالاعظم، فانه من شذشذ فى النار۔

قوله: اتبعواالسواد الاعظم يدل على ان أعاظم الناس العلماء وان قل عددهم ولم يقل الا كثر لان العوام والجهال اكثر عددا (مرقاة المفاتيح١/٣٨٣)

"তোমরা বড় দলের অনুসরণ কর, তথা আলেম-উলামাদের অনুসরণ কর। কেননা সমাজে তারাই হচ্ছেন বড়, যদিও তাদের সংখ্যা কম হয়। হাদীসে اكثر তথা সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণের কথা বলা হয়নি, কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় সমাজের সাধারণ ও অজ্ঞ লোকেরা।" (মেরকাত ১/৩৮৩)

অতএব বোঝা গেল উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উত্তরসূরি হক্কানী উলামাদের জামা'আত। কোয়ান্টামের মতো সকল ধর্ম সকল মানুষের কোনো সঙ্ঘ উদ্দেশ্য নয়। সমস্যার সমাধান পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহক উলামাদের কাছে আসতে হবে। কোয়ান্টামের গুরু আলেমও নন, মুফতীও নন। কোন ধর্মের অনুসারী, তাও অস্পষ্ট। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত বায়োডাটা তাদের বহু পুরাতন গ্র্যাজুয়েট ও সাইকিদের কাছেও অজানা। এ সকল তথ্য গোপন রাখার কারণ কী? মা-বাবার রাখা আসল নাম গোপন করে শহীদ আল বুখারী মহাজাতক নাম ধারণের রহস্য কী? সঠিক তথ্য জানতে পারলে সকলের উপকার হতো এবং সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হতো।

কোয়ান্টাম মেথড-১৫

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

মুফতী শরীফুল আ'জম

কয়েকটি উদাহরণ :

কোয়ান্টাম যে সকল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান করছে তা কিভাবে ঈমান-আমল ধ্বংস করে মানুষকে মুরতাদ বানিয়ে দেয় এর কয়েকটি বাস্তব উপমা তাদের বই-পুস্তক থেকে তুলে ধরা হচ্ছে-

দৃষ্টিভঙ্গি :

"আপনি কসমিক ট্রাভেলার মহাজাগতিক মুসাফির। আপনার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। ....." (কোয়ান্টাম কণিকা-১৫)

পর্যালোচনা :

এটা প্রশান্তি সঠিক জীবনদৃষ্টি অধ্যায়ের ৪৭তম জীবনদৃষ্টি। এখানে "জন্ম নেই" কথাটির মাঝে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। জন্ম ছাড়া এমনিতেই মানুষ পৃথিবীতে চলে এসেছে। কোনো জন্মদাতা, সৃষ্টিকর্তা বা খালিক বলতে এ ধরাতে কেহ নেই। (নাউযুবিল্লাহ) আর এ মতটি গ্রহণ করা হয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে। তাদের মতে এ মহাজগতটি একটি প্রাকৃতিক প্রবাহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। এখানে কেহ কারো স্রষ্টা নন। এ কুফরী মতবাদের খণ্ডনে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

"তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?" (সূরা আত তুর-৩৫)

এ ছাড়া অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মানবজাতি এবং হায়াত ও মউত সৃষ্টির বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

"তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (সূরা নাহল-৪)

কোয়ান্টাম জন্ম-মৃত্যু নেই বলে এমন অসংখ্য আয়াতকে অস্বীকার করেছে, যেখানে জন্ম-মৃত্যু তথা হায়াত-মউতের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাময়।" (সূরা মুলক-২) অতএব এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা মানে স্রষ্টাকে অস্বীকার করা। এটা প্রকাশ্য কুফরী।

দৃষ্টিভঙ্গি :

উক্ত গ্রন্থের ১০৭ নং দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয়েছে "প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি হয়।" (কোয়ান্টাম কণিকা-২১)

পর্যালোচনা :

এখানেও স্রষ্টাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর প্রকৃতিকে এগুলো সৃষ্টির পেছনে কার্যকারণ বলা হয়েছে। এটাও বৌদ্ধ ধর্মের একটি বিশ্বাস। 'ইসলামী আক্বীদাও ভ্রান্ত মতবাদ", গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। অথচ আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন-

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ

"নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি।" (সূরা হিজর-১৬)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

"কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্যও দ্বীপ্তিময় চন্দ্র।" (সূরা আল ফুরকান-৬১)

এ সকল আয়াতের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সব কিছুর স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আর কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি মতে এগুলো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়ে আছে, এর কোনো স্রষ্টা নেই। (নাউযুবিল্লাহ) এমন দৃষ্টি গ্রহণ করলে ঈমান চলে যাবে।

দৃষ্টিভঙ্গি :

"দেহের সীমাবদ্ধতা আছে; আত্মার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।" (কোয়ান্টাম কণিকা-১৪) "আমি এক অনন্য মানুষ। আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম।" (কোয়ান্টাম কণিকা-১৫)

পর্যালোচনা :

কোয়ান্টাম একদিকে জন্ম-মৃত্যু এবং গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির কথা অস্বীকার করে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা খাটো করেছে। অপর দিকে মানুষকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্ত করেছে। অথচ অসীম একমাত্র আল্লাহ তা'আলা আর মানুষসহ কূল মাখলুকাত হচ্ছে সসীম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না। অবশ্যই তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।" (সূরা আল আনআম-১০৩)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

"তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।" (সূরা

বাকারাহ-২৫৫)

এ সকল আয়াতের সার কথা হচ্ছে, অসীম শক্তি আর ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাফসীর গ্রন্থে যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এর বিপরীত কোয়ান্টাম মানুষকে অসীম ক্ষমতাধর বলে যে দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দিচ্ছে, তা স্পষ্ট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

দৃষ্টিভঙ্গি :

"মানুষ যখন অবৈজ্ঞানিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ জীবন যাপন করেছে তখনই তার দুঃখ ও দুর্ভোগ এসেছে।" (কোয়ান্টাম কণিকা-২০)

পর্যালোচনা :

কোয়ান্টামের বিজ্ঞান পূজা আর প্রকৃতি পূজার নগ্ন চেহারা ফুটে উঠেছে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে। ইসলামী শরীয়তের পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপনের শিক্ষার প্রসার তাদের প্রধান টার্গেট। মানুষকে মুরতাদ বানানোর অভিনব কৌশলমালা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে কোয়ান্টাম। তাদের মতে বিজ্ঞান আর প্রকৃতির অনুসারে জীবন যাপন সুখ, শান্তি আর সফলতা বয়ে আনে। এর বিপরীত করলে দুঃখে নিপতিত হতে হয়। আর পবিত্র কুরআনের ভাষ্য মতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান হচ্ছে জীবনের সকল প্রকার সুখ-শান্তি আর সফলতার চাবিকাঠি। এর বিপরীত হলে দুঃখ, দুর্ভোগের জীবন কখনোই পিছু ছাড়বে না। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (সূরা আল আহযাব-৭১)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" (আহযাব-৩৬)

আরো স্পষ্টভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

"আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন।" (সূরা মুহাম্মদ-২)

অতএব বিগড়ে যাওয়া জীবনকে পরিবর্তন করতে, অশান্তিকে প্রশান্তিতে বদলে দিতে হলে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীয়ত মতে জীবন যাপন করতে হবে। এর বিপরীত বিজ্ঞান বা প্রকৃতির পূজা সফলতার পরিবর্তে নরকের বন্দোবস্ত করবে।

দৃষ্টিভঙ্গি :

"আজন্ম লালিত পরিবেশ সব সময় নতুন কিছু করতে বাঁধা দেয়। বুদ্ধিমানরা সব সময় আগে শুরু করে, বোকারা শুরু করে দেরিতে।" (কোয়ান্টাম কণিকা-১৭)

"ইতিহাসে তারাই কালজয়ী হয়েছেন যাঁরা পূর্বপুরুষের প্রচলিত ভ্রান্ত সংস্কার ও আচরণ-অভ্যাসের ক্ষুদ্র বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন।" (কোয়ান্টাম কণিকা-৩৯)

পর্যালোচনা :

কোয়ান্টামের মধুমিশ্রিত বিষ ভয়াবহ মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়েছে এ দৃষ্টিভঙ্গি দুটিতে। এখানে ইসলামের আক্বীদা-বিশ্বাস, রীতিনীতি তাহজীব-তামাদ্দুন পরিত্যাগের আহ্বান অতি সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছে। আজন্মলালিত পরিবেশ যদি ইসলামের বিধি-বিধান মোতাবেক হয় আর কোয়ান্টামের কথায় তা পরিত্যাগ করা হয় তবে ঈমানের কী দশা হবে? ইসলামের হুকুম-আহকামকে নতুন কিছু করার পথে বাঁধা মনে করা বা প্রগতির অন্তরায় মনে করা ধর্মদ্রোহী মুরতাদদের স্বভাব। যেমন পর্দার বিধানটি মুসলিম পরিবারে আজন্মলালিত একটি প্রথা। তাহলে কি এটা নতুন কিছু করার পথে অন্তরায়? আর সেই নতুন কিছুটা তাহলে কী? হতে পারে কোয়ান্টামের কোর্স আর লামার পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর তীর্থ যাত্রা। হ্যাঁ, পর্দাহীনভাবে মহিলা-পুরুষের যে মেলার আয়োজন কোয়ান্টাম করে রেখেছে ইসলামের চৌদ্দশত বছরের লালিত পর্দার বিধান এর সমর্থন কিছুতেই করতে পারে না। পর্দার পরিবেশ ছেড়ে মুসলিম রমনীরা গুরুজির সামনে আসতে চাইছে না। তাই প্রয়োজন হচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের। পূর্বপুরুষের আচরণ-অভ্যাস পরিবর্তনের কথা বলে কোয়ান্টাম আসলাফের রেখে যাওয়া দ্বীনের আমানত ছুড়ে ফেলতে বলছে, তবে একটু কৌশলীভাবে। তাই ভ্রান্ত বিশেষণটি যোগ করা হয়েছে। এখন ভ্রান্ত সংস্কার বা আচরণের সংজ্ঞা কে দেবে? কোয়ান্টাম যে কুফর-শিরকে লিপ্ত রয়েছে এগুলো তো আর তাদের মতে ভ্রান্ত নয়। তবে কি শুধু ইসলামের বিধিবিধানকে আক্রমণ করার জন্য বিশেষণটি রাখা হয়েছে? অতএব দৃষ্টিভঙ্গি বদলের নামে আজন্মলালিত ধর্মীয় পরিবেশ আর পূর্বপুরুষ, আকাবির-আসলাফের ইজমা পরিত্যাগ করে নতুন কোনো মেথড অবলম্বনের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। ধর্ম ত্যাগ, নাস্তিক্যবাদ বা ইরতিদাদের ফটক অবারিত করবে কোয়ান্টামের এ সকল দৃষ্টিভঙ্গি।

দৃষ্টিভঙ্গি :

"পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সৃষ্টি যে

চিন্তা ও অনুভূতি দ্বারা তার জৈবিক অবস্থা বদলাতে পারে।" (কোয়ান্টাম কণিকা-১৪)

"আপনার অভিপ্রায় বা নিয়ত হচ্ছে আপনার নিয়তি।"কোয়ান্টাম কণিকা-২৭)

"আপনার স্বপ্ন পূরণের ক্ষমতা ও সামর্থ্য নিহিত রয়েছে আপনার ভেতরেই।" (কোয়ান্টাম কণিকা-৩৭)

পর্যালোচনা :

কোয়ান্টাম মৌলিকভাবে ইসলামের যে সকল আকীদার বিরোধিতা করছে তার অন্যতম হচ্ছে 'তাক্বদীর'। তাক্বদীরের ভালো-মন্দ বিশ্বাস ঈমানের প্রধান শাখাগুলোর একটি। কিন্তু কোয়ান্টাম পূর্ব থেকে নির্ধারিত এমন কোনো নিয়তি বা তাক্বদীরে বিশ্বাস করে না। তাদের কথা হচ্ছে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়তে পারে এবং সকল অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারে। নিয়তই হচ্ছে মানুষের নিয়তি। উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের মূল কথা এটাই। বিষয়টিকে আরো খোলামেলাভাবে আলোচনা করা হয়েছে হাজারো প্রশ্নের জবাব গ্রন্থে-

প্রশ্ন : শুনেছি স্রষ্টা কিছু কিছু জিনিস মানুষের জন্য আগেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে জানতে চাই।

উত্তর : ভাগ্য কী এটাকে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারি। যেমন, আল্লাহ মানুষের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তার মাথায় কোনো দিন শিং গজাবে না। কিন্তু গরু বা গণ্ডারের মাথায় শিং গজাবে। মানুষের মাথায় শিং থাকবে না, কিন্তু গরু বা গণ্ডারের মাথায় থাকবে এটা হচ্ছে ভাগ্য। আবার আমাদের খেতে হয় মুখ দিয়ে। আমাদের হাত দুটো তিনটা বা চারটা নয়, এটা হচ্ছে ভাগ্য। এটা হচ্ছে 'ডিএনএ প্রোগ্রামিং' এটাই কিতাবে লিখে রাখা হয়েছে। বাকি সবটাই হচ্ছে কর্ম। বাকি সবকিছু করার জন্য আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন। যে বিষয়গুলোতে আমাদের জবাবদিহি করতে হয় সে পুরো জিনিসটাই হলো কর্ম। কারণ যদি আমি কী করব এটা পূর্বনির্ধারিতই হয়ে থাকে তাহলে আমার তো প্রতিদান-প্রতিফলের কিছু থাকতে পারে না।...... (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/২৭২)

এখানে গুরুজি মহাজাতক মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভাগ্য বা তাক্বদীর নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কোনো মাওলানা, মুফতী বা ইসলামী বিশেষজ্ঞ নন। এ বিষয়ে তার কোনো একাডেমিক শিক্ষা দক্ষ আলেমের তত্ত্বাবধানে গ্রহণের সুযোগ জীবনে কখনো আসেনি। তিনি একজন সাংবাদিক এরপর জ্যোতিষী সর্বশেষ কোয়ান্টামের গুরু। ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস-সংক্রান্ত তাও আবার ভাগ্যবিষয়ক স্পর্শকাতর অধ্যায়ের আলোচনা উনাকে মানায় না। বিশুদ্ধতার এক পার্সেন্ট নিশ্চয়তাও এখানে নেই। কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত ভাগ্যবিষয়ক আলোচনার সাথে চরম সাংঘর্ষিক কোয়ান্টামের এই বক্তব্য। ব্যস, একটি বৈজ্ঞানিক নাম দিয়ে দিল 'ডিএনএ প্রোগ্রামিং' আর চমক সৃষ্টি হয়ে গেল।

ভাগ্যের বিষয়টি শুধু মাথায় শিং গজানোর সিদ্ধান্তের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে- "প্রত্যেক বস্তু তাক্বদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে। এমনকি মানুষের অজ্ঞ ও বিজ্ঞ হওয়াটাও তাক্বদীরের প্রতিফলন।" (মুসলিম শরীফ-২৬৫৫) এখানে শুধু ভাগ্যসংক্রান্ত একটি হাদীস উল্লেখ করেই শেষ করা হচ্ছে। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা মাসিক আল-আবরার মার্চ-২০১২ ইং সংখ্যায় দেখা যেতে পারে। মানুষের সকল কর্ম, কর্মকারণ ও কর্মফল সবই তাক্বদীরের অংশ। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটবার রয়েছে, সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তা'আলার জানা আছে। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মতে জীবনযাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। বাকি ফলাফল আল্লাহর হাতে এবং তাক্বদীর অনুযায়ী হবে।

পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকলে প্রতিদানের কী অর্থ? এমন প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য নয়। দক্ষ শিক্ষক নিজ হাতে গড়া ছাত্রদের যোগ্যতার বিচারে ফলাফল আঁচ করতে পারেন। এটা তাঁর দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক হতে পারলে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের যোগ্যতার বিচারে তার জীবনের সকল বিষয় পূর্বেই অবগত হয়ে থাকলে সেটা তাঁর মহাপ্রজ্ঞার লক্ষণ হতে আপত্তি কোথায়?

মজার ব্যাপার হলো, কোয়ান্টামের গুরু নিজেকে একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বলে দাবি করেন। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু, রাজীব গান্ধীর মৃত্যু, মহাশূন্যযান চ্যালেঞ্জারের দুর্ঘটনা, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন, পুনর্নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভরাডুবিসহ অসংখ্য ভবিষ্যদ্বানী নির্ভুলভাবে জানতে ও জানাতে সক্ষম হন। (চেতনা অতিচেতনা পৃ: ৪)

নিজের ব্যাপারে তিনি এমন দাবি করেন অথচ আল্লাহ তা'আলা বান্দার ভবিষ্যদ্বানী তাক্বদীরে বা ভাগ্যলিপিতে লিখে রাখার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

পরিশেষে বলব, কোয়ান্টামের প্রচারিত দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের ঈমান-আমল ও আক্বীদা-বিশ্বাস ধ্বংস করার একটি সূক্ষ্ম ফাঁদ। "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে" স্লোগানটি মূলত ধর্ম ত্যাগ বা ইরতিদাদের আহ্বান। তাদের ভয়াবহ চক্রান্ত থেকে আল্লাহ তা'আলা আধুনিক মানুষের ঈমানকে রক্ষা করুন। আমীন!!!

কোয়ান্টাম মেথড-১৬

বদলে গেছে লাখো জীবন!!

মুফতী শরীফুল আ'জম

কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে নাকি "বদলে গেছে লাখো জীবন!" এটা তাদের জোড়ালো দাবি। কিন্তু কিভাবে বদলে গেল? কী পেয়ে বদলে গেল? বদলে গিয়ে কী হলো? আর যা হলো তা আসলেই কাম্য কি না? জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিচ্যুত মানুষেরা যদি ওই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের দরুন পথের দিশা পেয়ে থাকে তবে তো এই দাবি বাস্তব ও সার্থক। আর যদি তা না হয়ে উল্টো ঈমান-আমল ধ্বংস হয়ে বসে, তবে দাবিটি নিছক ধোঁকা বলে সাব্যস্ত হবে। যাদের জীবন বদলে গেছে বলে দাবি করা হচ্ছে এমন লোকদের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোয়ান্টামের বিভিন্ন স্মারক, বুলেটিন ও বই-পুস্তকে অনেকের সাফল্যগাথা মন্তব্য-বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোকে সংকলন করে "কোয়ান্টাম ভাবনা সাফল্যগাথা" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে সকলে একই সুরে গেয়ে গেছে নিজেদের প্রাপ্তির অনুভূতির কথা। মোট পাঁচ ধরনের প্রাপ্তির কথা ঘুরেফিরে সকলের কথার মাঝে ফুটে উঠেছে। সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সুখী পরিবার। একজন মানুষের সফল জীবনের জন্য এই পাঁচ বস্তুর অপরিহার্যতা কতটুকু, আর এগুলো না থাকলে ব্যার্থতার মাত্রা কতটুকু বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া চাই। জীবনের সাফল্য বা ব্যার্থতা নির্ণয়ের জন্য জীবনের উদ্দেশ্য জানা থাকতে হবে। যদি বলা হয় মানবজীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করে মাওলার গোলাম হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করা। তবে এমন জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা ঈমান-আমলের ভিত্তিতে নির্ণিত হবে। আর যদি পার্থিব যশ-খ্যাতি আর আনন্দ-ফুর্তিকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে করা হয়, তবে ওই পাঁচ বস্তুই হবে সাফল্যের প্রতীক। এগুলো পেলেই জীবন সফল ও সার্থক মনে হবে। জীবন বদলে গেছে বলে দাবি করা সহজ হবে। এমন সাফল্যের জন্য সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানেরও প্রয়োজন হবে না। যার যার ধর্ম পালন করেও এমন সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে। কিন্তু চোখ বন্ধ হলেই মরীচিকার মতো সকল সাফল্য সকল প্রাপ্তি শূন্যে মিলিয়ে যাবে। জীবন বদলে যাওয়ার দাবি মিছে প্রমাণিত হবে। কোয়ান্টামের ধোঁকা-প্রতারণা ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু তখন আফসোস করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। ফিরে এসে জীবনটাকে বদলে ফেলার লাখো আকুতি শোনা হবে না।

কোয়ান্টাম মানবজাতিকে এই সর্বনাশা পথে ঠেলে দিতেই পার্থিব খ্যাতি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জীবনের লক্ষ্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে–

প্রশ্ন: জীবনের লক্ষ্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: জীবনের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে আমার আগমনকে অর্থবহ করা। আর তার উপায় হলো নিজেকে জিজ্ঞেস করা যে, কেন এসেছি আমি, কী করতে চাই। একটাই তো জীবন। জীবনটাকে কিভাবে উপভোগ করতে চাই। সময়টাকে কিভাবে ব্যয় করতে চাই।

চারপাশের মানুষের কাছ থেকে আমি কী চাই? তাদেরকে কী দিতে চাই? এ প্রশ্নগুলোর উত্তরই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। এর আরো সহজ উপায় হচ্ছে মিডিয়ায় নিজের মৃত্যু সংবাদ কিভাবে দেখতে চাই, শুনতে চাই সেটাকে অবলোকন করা। কারণ একজন কীর্তিমান মানুষের মৃত্যু সংবাদেই থাকে তার জীবনের সব অবদানের কথা। (হাজারো প্রশ্নের জবাব, মহাজাতক ১/২৬২)

কোয়ান্টামের মতে জীবনের উদ্দেশ্য মিডিয়াতে মৃত্যু সংবাদ ফলাও করে প্রচার পাওয়ার মতো খ্যাতি বা কৃতিত্ব অর্জন করা। কোনো মু'মিন মুসলমানের বক্তব্য এমন হতে পারে না। এমন কথা সেই বলতে পারে যার আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান নেই। 'একটাই তো জীবন' কথাটির অর্থই হচ্ছে পরকালের জীবন অস্বীকার করা। মুমিন-মুসলমানের বক্তব্য হচ্ছে পার্থিব এ জীবনের পরে চিরস্থায়ী আরেকটি জীবন রয়েছে। পরকালীন সেই জীবনের সুখ-শান্তির পুঁজি আহরণ হচ্ছে ইহকালের এ জীবনের লক্ষ্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয যারিয়াত-৫৬)

তাই জীবনের লক্ষ্য পার্থিব খ্যাতি অর্জন নয় বরং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীই হচেছ মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাহলে ওই পাঁচ বস্তু পেয়ে জীবন বদলে যাওয়ার দাবিটি একটি ধোঁকা সাব্যস্ত হলো। ঈমান-আমল ছাড়া এ সকল অর্জন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ধোপে টিকবে না এ কথা নিশ্চিত। পবিত্র কুরআন থেকে পাঁচটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

সুস্বাস্থ্য :

কোয়ান্টামের ফর্মুলা মেনে চলায় অনেকে দীর্ঘ দিনের রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভ করেছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় জীবন বদলে গেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। দৈহিক সুস্থতাকে জীবনের চরম প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য করছে। সুস্থতা একটি অমূল্য নেয়ামত এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঈমান-আমল বাদ দিয়ে শারীরিক সুস্থতাকে সাফল্যের ভিত্তি মনে করার অবকাশ নেই। দেহ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হলো কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনিত ধর্ম মেনে দেহ পরিচালিত হলো না তবে এই সুস্থ দেহ জাহান্নামের লাকড়িতে পরিণত হবে। কওমে আদ যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পবিত্র কুরআনে তাদের ইতিহাস ও পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আদ প্রকৃতপক্ষে নূহ (আ.)-এর পুত্র সামের বংশধরের এক ব্যক্তির নাম। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপুসম্পন্ন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَلَـمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِـى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ(٨)

" আপনি লক্ষ্য করেননি। আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কী আচরণ করেছিলেন। যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোনো লোক সৃজিত হয়নি।"(সূরা আল ফজর ৬-৮)

নিজেদের সুস্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তিমত্তা নিয়ে আদ সম্প্রদায় সদা গর্ববোধ করত। পবিত্র কুরআনে তাদের এই মনোভাব এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

فَـأَمَّـا عَـادٌ فَـاسْتَـكْبَرُوا فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

"যারা ছিল আদ তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে?" (সূরা হা-মীম সিজদাহ-১৫)

সুস্বাস্থ্যের এই নিয়ামত তাদের জন্য সফলতা বয়ে আনার পরিবর্তে কাল হয়ে দাঁড়াল। যে বিশ্ব প্রতিপালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল। তারা তাকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহর নবী হযরত হুদ (আ.) আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর কঠোর আযাব নাযিল হয়। প্রথমত তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ থাকে। ফলে তাদের শস্যক্ষেত শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব সওয়ার হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালানকোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে সুঠাম দেহের অধিকারী আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

তাদের এই শোচনীয় পরিণতির কথা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে-

وَتِـلْكَ عَـادٌ جَـحَـدُوا بِـآيَـاتِ رَبِّهِمْ وَعَـصَـوْا رُسُـلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَـنِيدٍ (٥٩) وَأُتْبِـعُـوا فِـى هَـذِهِ الدُّنْيَا لَـعْـنَةً وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (٦٠)

"এ ছিল আদ জাতি যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে, আর তদীয় রাসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে। এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা'নত রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও; জেনে রাখ, আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, হুদের জাতি আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ।" (সূরা হুদ-৫৯-৬০)

বোঝা গেল, সুস্বাস্থ্য তাদের জীবন বদলে দিতে পারেনি। নবীর আদেশ অমান্য করার ফলে তারা চিরদিনের জন্য অভিসম্পাত কামাই করেছে। কোয়ান্টাম চর্চা কথিত সুস্বাস্থ্য দিতে পারলেও জীবন বদলে দিতে পারবে না। শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ অমান্য করে যার যার ধর্ম পালন করতে থাকলে সুস্থ দেহের অধিকারী হয়েও চরমভাবে ব্যর্থ হতে হবে। ‘সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন’ এই স্লোগান কোনো কাজে আসবে না।

প্রাচুর্য :

অনেকে কোয়ান্টাম চর্চার ফলে প্রাচুর্যের মালিক হয়েছেন বলে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। প্রাচুর্যের কারণে তাদের জীবন বদলে গেছে, সফল হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, সফলতা একমাত্র আল্লাহর হুকুম আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ অনুসরণের মাঝে নিহিত রয়েছে। প্রাচুর্যের মাঝে কোনো সফলতা নেই। যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ধনবীর কারুন। প্রাচুর্যের মাঝে ডুবে থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর হুকুম নবীর আদর্শ না মানায় সফল হতে পারেনি। পবিত্র কুরআনে তার ধন-ভাণ্ডারের বিবরণ ও শেষ পরিণতির কথা উল্লেখ হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

“কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টুমি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালোবাসেন না।” (সূরা আল কাসাস-৭৬)

কারুন এই প্রাচুর্যকে নিজস্ব অর্জন বলে মনে করত এবং বলত- قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي “আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি।” (সূরা আল কাসাস-৭৮)

অর্থাৎ আমি যা কিছু পেয়েছি তাতে আল্লাহ তা’আলার অনুগ্রহের কোনো দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্ম তৎপরতার দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারুন এ কথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য এগুলোও তো আল্লাহ তা’আলারই দান ছিল, তার নিজস্ব গুণ গরিমা ছিল না।

কোয়ান্টামের দাবিও অনেকটা এমনই। মেধার বলেই তাদের প্রাচুর্য লাভ হয় বলে ধারণা দেয়া হচ্ছে। “আমরা মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করছি, বিনিময়ে প্রাচুর্য আসছে।” (হাজারো প্রশ্নের উত্তর মহাজাতক ২/৪১৮)

এ ছাড়া বলা হয়েছে- “প্রাচুর্য প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার।” (কোয়ান্টাম কণিকা-২৫) প্রাচুর্য আল্লাহর দান এমন শিক্ষা কোয়ান্টামে নেই। আর আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ এটাই। নিজের অর্জন আর নিজের অধিকারের কথা ভেবে ধনকুবের কারুন আল্লাহর হুকুম আর ওই যুগের নবী হযরত মূসা (আ.)-এর আদর্শ অনুসরণে বেকে বসল। ব্যস, আল্লাহর আযাব তার জন্য অবধারিত হয়ে গেল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

“অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না।” (সূরা আল কাসাস-৮১)

কারুনের প্রাচুর্য কোনো সফলতা বয়ে আনতে পারল না। অর্থ-বিত্তের সাথে সাফল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সফলতা আর ব্যর্থতা ঈমান-আমলের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যার যার ধর্ম পালনের শিক্ষার মাধ্যমে যা আদৌ অর্জন করা সম্ভব নয়। এটা সম্পূর্ণ কুফরী মতবাদ। প্রাচুর্যের প্রলোভন দেখিয়ে কোয়ান্টাম এমন সব কুফরী মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মাঝে প্রচারের সুযোগ নিচ্ছে।

মাল দৌলত আল্লাহর নিয়ামত ও হতে পারে আবার ফেতনার কারণও হতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে–

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

“সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণ বিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়।” (সূরা আত-তাওবা-৫৫)

অতএব প্রাচুর্যের চাকচিক্য দেখে ধোঁকা খাওয়া ঠিক হবে না। আল্লাহ তা’আলা চাইলে নাফরমান খোদাদ্রোহী চিরস্থায়ী জাহান্নামী কেউ সোনা-রুপার অট্টালিকার মালিক বানাতে পারেন। এই প্রাচুর্য সফলতার লক্ষণ নয়। অর্থ-বিত্ত পেয়ে জীবন বদলে গেছে মনে করা একটি ধোঁকা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ

سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (٣٤) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ(٣٥)

"যদি সব মানুষ এক মতাবলম্বী (কাফের) হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি। যার উপর তারা চড়ত। এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা দিতাম, এবং পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। এবং স্বর্ণ নির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যই যারা ভয় করে।" (সূরা আয যুখরুফ ৩৩-৩৫)

অতএব কোয়ান্টামে কুফরী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ধন-দৌলতে স্নাত হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না। প্রাচুর্যের খাতিরে কুফরী মেথড অবলম্বন নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কোয়ান্টামের ভাইয়েরা নিজেদের অবস্থা ভেবে দেখুন, সত্য ধর্ম ইসলাম বাদ দিয়ে যার যার ধর্মে থেকে প্রাচুর্যবান হওয়ার শেষ ফল কী হতে পারে?

খ্যাতি:

কোয়ান্টাম চর্চা করে অনেকে খ্যাতিমান হয়েছেন বলে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পেরেছেন। বিভিন্ন সেলিব্রেটিগণ সফল ক্যারিয়ার গড়তে সক্ষম হয়েছেন। নাচ-গান, অভিনয় ও খেলাধুলা সহ নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এসকল সাফল্যই তাদের মতে জীবন বদলে যাওয়ার মূল উপকরণ। কিন্তু এসকল খ্যাতি অর্জন করতে গিয়ে ঈমান-আমালের মতো অমূল্য সম্পদ বিসর্জন দিতে হচ্ছে কি না, একটু ভেবে দেখা দরকার। পার্থিব এ জীবনে খ্যাতিমান হওয়া বা অখ্যাত হওয়ার সাথে সফলতা বা ব্যর্থতার কোনো সম্পর্ক নেই। মানবজাতির সফলতা আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুসারে জীবন-যাপনের মাঝে নিহিত রাখা হয়েছে। সামুদ সম্প্রদায় ওই যুগের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মালিক ছিল। নরম মাটিতে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ আর পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রকৌশলে তারা ছিল বিখ্যাত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"তোমরা স্মরণ করো, যখন তোমাদের আদ জাতির পরে সর্দার করেছেন, তোমাদের পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ করো এবং পর্বত গর্ত খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করো। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।" (সূরা আল আরাফ-৭৪)

কিন্তু তাদের এই খ্যাতি তাদের জন্য কোনো সাফল্য বয়ে আনতে পারেনি। জীবনটাকে বদলে দিতে পারেনি। আল্লাহর নাফরমানীর কারণে গোটা সম্প্রদায় সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহর নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী প্রথম দিন তাদের সকলের চেহারা হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। এটাই ছিল তাদের জীবনের শেষ দিন। ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ভূশায়ী হলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٧٨) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ(٧٩)

"অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। সালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল; হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি কিন্তু তোমরা মঙ্গলকাঙ্ক্ষীদেরকে ভালোবাস না।" (সূরা আলা আ'রাফ ৭৮-৭৯)

প্রতিপত্তি :

কোয়ান্টাম চর্চার ফলে অনেকে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা যায়। কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি জীবনের সাফল্য নয়, আসল সাফল্য হচ্ছে আল্লাহর হুকুম মতে জীবন পরিচালনা করে জাহান্নাম থেকে পরিত্রান পাওয়া ফিরআউনের ঘটনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে ছিল বিশাল রাজ্যের মালিক। প্রভাব-প্রতিপত্তির কোনো ঘাটতি ছিল না।

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ

"ফিরআউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল।" (সূরা ইউনুস-৮৩)

ফলে সে নিজেকেই খোদা বলে দাবি

করে বসে। হায়াত-মউতের মালিকও নিজেকে মনে করতে থাকে।

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

"এবং বলল আমি তোমাদের সেরা পালনকর্তা।" (সূরা আন নাযিআত- ২৪)

হযরত মূসা (আ.) তাকে সংযত হতে আহ্বান করেন এবং একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু এ দাওয়াতকে উপেক্ষা করে সে খোদাদ্রোহীতার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়ে হযরত মুসা (আ.)কে গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে বলে–

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

"ফেরআউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।" (সূরা আশ শুআরা- ২৯)

অবশেষে আল্লাহর আযাব তাকে পাকড়াও করে। দলবল, সৈন্য-সামন্তসহ তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়। তার সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি সেদিন অসার প্রমাণিত হয়। জীবনকে বদলে দেয়ার পরিবর্তে ধ্বংস করে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে–

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

"অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম। তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ জালেমদের পরিণাম কী হয়েছে।" (সূরা আল কাসাস- ৪০)

সুখী পরিবার :

কোয়ান্টাম চর্চার ফলে সুখী পরিবার নসীব হয়েছে বলে অনেকে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। কোয়ান্টাম জীবন যাপনের যে বিজ্ঞান চর্চার আহ্বান জানাচ্ছে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সুখী পরিবার। "কোয়ান্টাম চেতনার সাফল্য হচ্ছে পরিবারকে সুখী পরিবারে রূপান্তরিত করা। অন্য কোনো চেতনায় আমাদের দেশে এভাবে পারিবারিক রূপ পায়নি।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস ১৪৩)

কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে সুখী পরিবার গড়ে জীবন বদলের গান যারা গাইছেন তাদের ভেবে দেখতে হবে, এই সুখ একসময় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে কি না? কারণ, কোয়ান্টামের যার যার ধর্ম পালনের দৃষ্টিভঙ্গি এক দিকে অমুসলিম পরিবারকে কুফর শিরকে নিমজ্জিত থাকতে উৎসাহ জোগায়। অপরদিকে তাদের বিভিন্ন কুফরী দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদেরকে সপরিবারে ঈমানহারা করার পথ সুগম করে। ঈমান আমল ছাড়া পার্থিব বিবেচনায় সুখী পরিবারের শেষ পরিণতি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (١٣)

"এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ দিক থেকে দেওয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহবান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে তার পরিবার পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল।" (সূরা আল ইনশিকাক ১০-১৩)

বোঝা গেল পারিবারিক সুখশান্তি আর আনন্দ-ফূর্তি জীবন বদলের মাপকাঠি নয়। ঈমান আমলহীন সুখী পরিবারের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। বদলে গেছে লাখো জীবন কথাটি প্রকৃত পক্ষে এমন পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যারা কুফর শিরক পরিহার করে ঈমান গ্রহণ করেছে এবং সকল প্রকার গোনাহ মুক্ত থেকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শে পরিবার গড়ে তুলেছে। এমন পরিবারই শেষ বিচারে সুখী বলে সাব্যস্ত হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে –

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨)

"তারা বলবে আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম তিনি সৌজন্যশীল পরম দয়ালু।" (সূরা আত-তূর ২৬-২৮)

আল্লাহর ভয় নিয়ে যারা জীবন যাপন করে এই হচ্ছে তাদের প্রতিদান। আল্লাহ তাদেরকে সপরিবারে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে একত্রে স্থান করে দেবেন। আর এটিই হচ্ছে আসল সফলতা। জান্নাতীদের পরস্পর সাফল্যগাথা ইতিবৃত্তের আলোচনা এই আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। এরাই প্রকৃত সুখী পরিবার। পক্ষান্তরে কোয়ান্টাম যে সুখী পরিবারের দীক্ষা দিচ্ছে তা ঈমানবিনাশী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চূড়ান্ত সুখ বয়ে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কোয়ান্টামের আদর্শে গড়ে ওঠা সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং সুখী পরিবারের মাঝে বাহ্যিকভাবে সফলতা দৃষ্টিগোচর হলেও প্রকৃত পক্ষে এগুলো হচ্ছে ঈমানবিধ্বংসী ফাঁদ। আর 'বদলে গেছে লাখো জীবন' স্লোগানটি হচ্ছে একটি ধোঁকা।

কোয়ান্টাম মেথড-১৭

মাটির ব্যাংক

মুফতী শরীফুল আ'জম

কোয়ান্টামের চাই শুধু টাকা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। মন ভুলিয়ে তুলে নিচ্ছে ওরা টাকা। ছলচাতুরি করে হাতিয়ে নিচ্ছে টাকা। সরলমনা মানুষের কষ্টার্জিত টাকা লুটে নিতে বিভিন্ন ফন্দি এঁটেছে। জাল বিছিয়েছে তারা হরেক রঙের হরেক নামের। কোর্স ফি থেকে শুরু হয় এই মহড়া। আর মাটির ব্যাংক নামে স্থায়ী করা হয় এর ধারা। এ ছাড়া রয়েছে প্রতি সপ্তাহে হিলিংয়ের নামে টাকা সংগ্রহের বন্দোবস্ত। মানুষকে সবক দিচ্ছে "পেতে হলে দিতে হবে।" আর নিজেরা শুধু নিয়েই যাচ্ছে!! কিছু লোকের প্রাপ্তির কথা ঘটা করে প্রচার করে মানুষকে দানে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে। আর পাওয়ার লোভে অপপ্রচারের শিকার হয়ে সরল মানুষেরা বিলিয়ে যাচ্ছে। পেতে হলে দিতে হবে। তাই লাখ টাকা পেতে লাখ টাকা দিচ্ছে আর কোটি টাকা পেতে কোটি। হুজুগে বাঙালি বলে কথা। আমাদের দেশের মাটি ও মানুষের এই সরলতার সুযোগেই যত সব ধোঁকা-প্রতারণা সূচিত হয়। তাই দরকার একটু সচেতনতা। কৈয়ের তেলে কৈ ভাজার দর্শন কাজে লাগিয়ে ইসলামের দুশমনেরা মুসলমানের টাকায় তাদেরই সর্বনাশ করে যাচ্ছে। আরব দেশের টাকায় নির্মিত মারণাস্ত্র দিয়েই ইসলামী রাষ্ট্রগুলো একের পর এক দখল করা হচ্ছে। কোয়ান্টাম ও সেই কৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদের কাছ থেকে সংগ্রহ করছে কোটি কোটি টাকা। মুসলমানের টাকায় ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে ভদ্রভাবে। একবার কোয়ান্টামে যোগ দিলে চক্ষু লজ্জায় হলেও দিতে থাকতে হয়। প্রথমে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পরিশোধ করতে হয় মোটা অংকের কোর্স ফি। এরপর ধরিয়ে দেয়া হয় মাটির ব্যাংক। শুধু টাকা নিয়েই ওরা ক্ষান্ত হয় না, শরীরের রক্ত দিয়ে ওদের ডোনার হতে হয়। দানের রক্ত বেঁচে আয় করে কোটি কোটি টাকা। কোয়ান্টামের চাই শুধু টাকা আর টাকা।

কোর্স ফি :

কোয়ান্টাম জোর গলায় দাবি করে যে তারা মানুষকে আলোকিত জীবনের সন্ধান দিতে নবী-রাসূলদের পথ অনুসরণ করে কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হচ্ছে- "আসলে ফাউন্ডেশন ইসলামের মূল শিক্ষাকেই প্রচার করছে। নবী-রাসূলরা যে কথাগুলো বলেছেন, ফাউন্ডেশনও একই কথা বলছে।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৫০)

একই গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে- "কোয়ান্টামের শিক্ষা এ ক্ষেত্রে নবী-রাসূলদের যে শিক্ষা, অলি-বুজুর্গদের যে শিক্ষা, মুনি-ঋষিদের যে শিক্ষা, তা থেকে আলাদা কিছু নয়।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৩০১) কোয়ান্টামের এ দাবি যদি সত্যই হয় তবে কোর্স ফি কেন? নবী-রাসূলগণ তো মানুষকে আলোকিত পথ দেখাতে কোনো রূপ ফি বা বিনিময় নেননি। তাদের সকলের বক্তব্য ছিল-

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء١٠٩)

"আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব পালনকর্তাই দেবেন।" (সূরা আশ শু'আরা-১০৯)

তাহলে নবী-রাসূলদের শিক্ষার সাথে কোয়ান্টামের মিল হলো কোথায়? হ্যাঁ ওদের মিল খুঁজে পাওয়া যায় নবী-রাসূলের দুশমন ফেরাউনের জাদুকরদের সাথে। হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে মোকাবিলার জন্য জাদুকরদের ডেকে আনা হলে তারা ফেরাউনের কাছে ফি দাবি করেছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (الاعراف١١٣)

"বস্তুত জাদুকররা এসে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হলো। তারা বলল, আমাদের জন্য কি কোনো পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি? (সূরা আল আ'রাফ-১১৩)

দানবাক্স :

ঢাকার রাজপথে চলতে লাইটপোস্ট, স্টেশন, বাজার, মসজিদ বা মার্কেটের সামনে বিভিন্ন দরবার শরীফের দানবাক্স ঝুলে থাকতে দেখা যায়। কোয়ান্টাম ও সেই পথে পা বাড়িয়েছে, তবে ওরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে নিজেদের দানবাক্স মাটির ব্যাংক। পথ চলতে এখন দোকানপাটে নজর পড়ে নীল রঙের মাটির ব্যাংক। সাথে রাখা হয় দানের উপকারিতা সম্বলিত একটি লিফলেট,

ব্রোশিডর বা বুলেটিন। মাটির ব্যাংকে দানের উপকারিতা বোঝাতে গিয়ে কোয়ান্টাম নির্লজ্জভাবে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বিকৃত অনুবাদ ও তাফসীর পেশ করেছে। টাকা জোগাড়ের জন্য মানুষ এত নিচে নামতে পারে তা ভাবতে অবাক লাগে। ওদের মতে বর্তমানে দানের একমাত্র উপযুক্ত খাত এই মাটির ব্যাংক। ধর্মীয় কাজে বা মাদরাসা-মসজিদে দানের পরিবর্তে মাটির ব্যাংকে দানই শ্রেয়, এ কথাটি তারা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রচার করছে।

হক্কুল ইবাদ :

মাটির ব্যাংকের গায়ে লেখা থাকে "হক্কুল ইবাদ"। টাকা জোগাড় করতে হক্কুল ইবাদের দোহাই দিচ্ছে কোয়ান্টাম। এর স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত "সঙ্ঘবদ্ধ দান আনে অফুরন্ত কল্যাণ" শিরোনামের এক লিফলেটে লেখা হয়েছে- "সূরা আয যারিয়াত-এর ১৯ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- "নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদে নিঃস্ব ও অসহায়দের অধিকার রয়েছে।" অর্থাৎ আমরা যা দান করি, কুরআনের দৃষ্টিতে তা দয়া নয়, তা অসহায়দের অধিকার বা হক্কুল ইবাদ।" (লিফলেট ২০০৮)

অথচ আয়াতটির সঠিক অনুবাদ ও মর্মার্থ হচ্ছে-

وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم (الذريت ١٩)

"এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক্ব ছিল।" (আয যারিয়াত-১৯)

কোয়ান্টামের অনুবাদে নিঃস্ব ও অসহায় দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অথচ এই আয়াতে এমন কোনো কথা নেই। তদ্রূপ 'অধিকার রয়েছে' অনুবাদ ভুল। এখানে এমন কোনো বিধান জারি করা হয়নি, বরং মুমিন-মুত্তাকীদের গুণ, অভ্যাস ও মনোভাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি কয়েক আয়াত পূর্ব থেকে পড়ে আসলে স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

(১৫)"খোদাভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবনে থাকবে। (১৬) এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। (১৭) তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রা যেত। (১৮) রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (১৯) এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক্ব ছিল।" (সূরা আয যারিয়াত ১৫-১৯)

এখানে নিঃস্ব অসহায়দের কোনো প্রাপ্য হক্কের কথা বলা হয়নি। মুমিনদের আর্থিক ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঐচ্ছিক দান-খয়রাতের বেলায় তারা নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না, বরং নিজেদের ধন-সম্পদে মিসকীনদের ও হক্ব আছে বলে মনে করে। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

স্বেচ্ছায় নিজের ওপর বাধ্য করে নেয়া আর শরীয়ত কর্তৃকও বাধ্য করা এক বিষয় নয়। যেমন–যাকাত শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারণ আর নফল দান-খয়রাতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তবে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কোয়ান্টাম উক্ত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে নফল দানকে হক্ব হিসেবে উপস্থাপন করেছে। পবিত্র কুরআনের ভুল আর সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে কোয়ান্টামের কোন মাথাব্যথা নেই। কোয়ান্টামের চাই শুধু টাকা।

দান ঈমানের শর্ত :

২০০৮ সালে প্রকাশিত উক্ত লিফলেটে দানকে ঈমানের শর্ত বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা সূরা বাকারার ২-৩ নং আয়াতের ভুল অনুবাদ ও ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে লিখেছে-

"বিশ্বাসী বা ঈমানদার হওয়ার এবং কুরআন থেকে হেদায়েত লাভের অন্যতম শর্ত হচ্ছে দান।"নিঃসন্দেহে কুরআন বিশ্বাসীদের পথপ্রদর্শক। বিশ্বাসী তারাই যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে। সালাত কায়েম করে এবং প্রদত্ত রিজিক বা উপার্জন থেকে দান করে।" (সূরা বাকারা ২-৩) অর্থাৎ ঈমানদার হওয়া বা হেদায়েত লাভের জন্য দান করা পূর্বশর্ত।" (লিফলেট-২০০৮)

অথচ উক্ত আয়াতদ্বয়ের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে-

ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) (البقرة)

"এ সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। যারা অদেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি

তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।” (সূরা আল বাকারা ২-৩)

কোয়ান্টাম পরহেযগার শব্দের স্থলে বিশ্বাসী বলে অনুবাদ করেছে, যা স্পষ্ট ভুল। এখানে ওদের একটা মতলবও আছে। ওদের মতে হিন্দু, বৌদ্ধ আর খ্রিস্টান হয়েও বিশ্বাসী হওয়া যায়। তাই সকল ধর্মের লোককে খুশি করার জন্য এই অনুবাদ! সূরা বাকারার শুরুর কয়েকটি আয়াতে মূলত পরহেযগার বান্দাদের গুণাবলির বর্ণনার মধ্যে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তৎসঙ্গে সৎকর্মের মূলনীতি স্থান পেয়েছে। প্রথমে অদৃশ্যে বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঈমানের পর আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর যত রকমের আমল রয়েছে তার সবই মানুষের দেহ অথবা ধন-দৌলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দৈহিক ইবাদতের মধ্যে নামায এবং আর্থিক ইবাদতের মধ্যে . انفاق তথা ব্যয়ের কথা উল্লেখ করে প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় ইবাদতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তারাই পরহেযগার-মুত্তাকী যাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ এবং আমলও পূর্ণাঙ্গ। ঈমান এবং আমল এ দুয়ের সমন্বয়েই হচেছ ইসলাম। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

বোঝা গেল, কোয়ান্টাম এ আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উভয়ের মাঝে বিকৃতি সাধন করেছে। দানকে এখানে ঈমানের শর্ত করা হয়নি। যেমনটি কোয়ান্টাম বলছে যে দান ঈমানের পূর্বশর্ত। বরং মুত্তাকী-পরহেযগার বান্দাগণের গুণ হিসেবে দানকে উল্লেখ করা হয়েছে। শর্ত আর গুণ এক কথা নয়। নেক আমলের একটি অংশ বিশেষ হচ্ছে দান। এর সাথে কোয়ান্টামের কী সম্পর্ক? ঈমান-আমলের কোনো গুরুত্ব যদি তাদের কাছে থাকত তবে কি আর হিন্দু, খ্রিস্টান-বৌদ্ধ ধর্মের মতো কুফর-শিরক আর নাস্তিক্যবাদের সাফাই গাইতে পারত? এখন টাকা-পয়সা জোগাড় করতে গিয়ে ঈমানের দোহাই দিচ্ছে। দান-খায়রাত করা ছাড়া নাকি ঈমানদার হওয়া যাবে না! তাও আবার ওদের মাটির ব্যাংকে!! অথচ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনিত ধর্ম ইসলাম গ্রহণ ছাড়া বিশ্বাসী হওয়া যাবে না মুক্তি পাওয়া যাবে না এবং কোনোরূপ দান-খয়রাতও কবুল হবে না। এ মহা সত্যকথাটি কোয়ান্টাম একবারও বলে না।

মুসলমানদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য দানকে ঈমানের পূর্ব শর্ত বলছে, আবার অমুসলিমদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা উঠানোর জন্য কুফরী ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করছে। কোয়ান্টামের মতে ঈমান কুফর আর মুমিন কাফিরের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। ওদের তো চাই শুধু টাকা আর টাকা।

'সৎ দান' :

মুসলিম-অমুসলিম সকল ধর্মের লোকদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করার জন্য কোয়ান্টাম 'সৎ দান' পরিভাষাটি আবিষ্কার করেছে। নতুন নতুন পরিভাষা উদ্ভাবনে কোয়ান্টামের জুড়ি নেই। পবিত্র কুরআনে যেভাবে দান-খয়রাতের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে তদ্রূপ দানের খাতও উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল বাকারার ২৬১ নং আয়াতে ব্যয়ের খাত উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّه كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة- ٢٦١)

“যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত............”

কোয়ান্টাম এখানে আল্লাহর রাস্তা শব্দটির পরিবর্তে 'সৎ দান' পরিভাষা চালু করেছে। কোয়ান্টামের মাটির ব্যাংক বুলেটিনের হালখাতা সংখ্যা ২০১২ তে সূরা আল বাকারার উক্ত আয়াতের বিকৃত অনুবাদ লক্ষ্য করুন- “সৎ দান এমন একটি শস্যবীজ, যাতে উৎপন্ন হয় ৭টি শিষ আর প্রতিটি শিষে থাকে শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে চান তাকে বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন। (সূরা বাকারা-২৬১) অথচ উক্ত আয়াতের মূল পাঠে এমন কোনো শব্দ নেই যার অনুবাদ 'সৎ দান' হতে পারে। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের কথা বললে যারা আল্লাহর পরিবর্তে দেব-দেবীতে বিশ্বাসী বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তাদের পকেট খালি করা সম্ভব হতো না তাই 'সৎ দানে'র কথা বলা হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ কোয়ান্টামের মন মতলবী অনুবাদ। পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ওদের কাছে একটি ছেলে খেলার মতো বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

দান কবুলের শর্ত :

আল্লাহ তা'আলার কাছে দান কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। দানকে শস্যবীজের সাথে তুলনা করে

ওই শর্তগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেভাবে বীজ থেকে ভালো ফলন পেতে চাইলে ভালো বীজ, ভালো কৃষক এবং ভালো জমি প্রয়োজন। অনুরূপ দান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য (১) দানের বস্তু হালাল হতে হবে। (২) দাতা মুসলমান ও মুখলেছ হতে হবে। (৩) দানের খাত আল্লাহর সন্তুষ্টি মতে হতে হবে। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন দ্রষ্টব্য, সূরা বাকারা-২৬১-২৬৪)

কোয়ান্টাম যেভাবে নিজে বেপরোয়াভাবে কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে যাচ্ছে তাদের কাছে হালাল-হারামের গুরুত্ব আর কী থাকতে পারে? ঈমান আর কুফর যেখানে একাকার, সেখানে দাতা মুসলমান হওয়ার শর্ত ওদের কাছে হাস্যকরই। আর ব্যয় খাতের কথা না হয় নাই বললাম। কারণ সমাজ সেবার আড়ালেই চালাচ্ছে ওরা ঈমানবিধ্বংসী সকল কর্মকাণ্ড।

অমুসলিমের দানের দৃষ্টান্ত :

সূরা আল-বাকারার ২৬১ নং আয়াত থেকে লাগাতার দুই রুকূ পর্যন্ত দান-খয়রাতসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কাফেরদের দানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে-

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِيـنَ آمَـنُـوا لَا تُبْـطِـلُـوا صَـدَقَـاتِـكُـمْ بِـالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُـنْـفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الْـآخِـرِ فَـمَثَـلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَـلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَـقْـدِرُونَ عَـلَـى شَـيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَالـلَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين (البقرة-٢٦٤)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মতো, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মতো, যার ওপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর ওপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ওই বস্তুর কোনো সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে, আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা আল বাকারা-২৬৪)

বোঝা গেল, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় বা ঈমান ছাড়া দান কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। যেকানো আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমান পূর্ব শর্ত। কোয়ান্টামের দর্শন অনুযায়ী, যার যার ধর্ম পালন করে মাটির ব্যাংকে দান-খয়রাত করা ধন-সম্পদ জলাঞ্জলি দেয়ারই নামান্তর। পরকালে এর কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না।

মূল্যহীন সৎ দান :

ঈমান সবার আগে। তাই ঈমান-আক্বিদা দুরস্ত করা ছাড়া সৎকর্ম বা সৎ দান আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। এগুলোর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা দয়া করে পার্থিব জীবনে কিছু দিয়ে দেন। আর আখেরাতে করেন চিরবঞ্চিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَيَـوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُـمْ طَيِّبَـاتِـكُـمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَـمْتَـعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُـونِ بِـمَـا كُـنْتُـمْ تَسْتَكْبِـرُونَ فِـي الْأَرْضِ بِـغَـيْـرِ الْـحَـقِّ وَبِـمَـا كُـنْتُـمْ تَفْسُقُون (الاحقاف-٢٠)

"যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে। তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেয়া হবে; কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে।" (সূরা আল আহক্বাফ-২০)

অর্থাৎ কাফেরদের বলা হবে তোমরা কিছু ভালো কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের আকারে দেয়া হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোনো প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের যেসব সৎকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়; পরকালে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন। কাজেই কাফেররা দুনিয়াতে যেসব বিষয়-বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিফল হয়ে থাকে। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

অতএব, ঈমান-আক্বীদা দুরস্ত করা ছাড়া যার যার ধর্ম পালন করে যারা মাটির ব্যাংকে টাকা দিয়ে উপকার পাচ্ছেন বলে কোয়ান্টামের বিভিন্ন বুলেটিন বা স্মারকে প্রচার করা হচ্ছে, তাদের সফলতা ও প্রবৃদ্ধি পার্থিব পুরস্কার কি না ভেবে দেখতে হবে। পরকালে চির বঞ্চিত হতে হয় কি না এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। পরকাল নিয়ে কোয়ান্টামের কোনো

ভাবনা নেই, ওদের চাই শুধু টাকা।

দানে পাপ মোচন :

মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পাপ করে ফেলে, কেউ নিজেকে পাপমুক্ত দাবি করতে পারে না। মানুষের এই দুর্বলতাকে কোয়ান্টাম লুফে নিয়েছে। টাকা-পয়সা উঠানোর জন্য পাপ মোচনের আশ্বাস দিচ্ছে। অথচ কুফর-শিরক আর নাস্তিক্যবাদের মতো মহাপাপ কর্মকে কোয়ান্টাম সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেল, পাপ মোচন একটি বাহানা মাত্র, অন্যথায় ওদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে টাকা।

এক প্রশ্নের জবাবে কোয়ান্টামের গুরু বলছেন-

প্রশ্ন : মেডিটেশন করলে পাপ ক্ষয় হয়। দান করলেও পাপ মোচন হয়। কিভাবে পাপ ক্ষয় হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : খুব সহজ। পাপ তো আসলে হয়ে যায়। এটাকে ক্ষয় করার কোনো উপায় নেই, পুণ্যটাকে বাড়াতে হবে। ওই পুণ্য দিয়ে পাপ ক্ষয় হবে। অতএব যখনই আপনি মেডিটেশন করছেন, যখনই আপনি দান করছেন সৎকর্ম হচ্ছে...।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব-২/৪৪৬)

এটা হচ্ছে গুরুজির মনগড়া উত্তর যার পক্ষে কোনো রেফারেন্স লাগে না। উত্তরের সার কথা হলো, যে যত পাপই করুক না কেন মেডিটেশন চর্চা আর মাটির ব্যাংকে দান করলে পাপ মোচন হয়ে যাবে। এছাড়া পাপ ক্ষয়ের বিকল্প কোনো পথ নেই। নিজেদের মতলব উদ্ধারে এর চেয়ে উত্তম জবাব আর কী হতে পারে?

অথচ তওবা হচ্ছে পাপ ক্ষয়ের উপায়। উপায় নেই বলাটা ঠিক হয়নি। হাদীস শরীফে এসেছে-

التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔

"গুনাহ থেকে তওবাকারী ওই ব্যক্তির মতো যার কোনো গুনাহই নেই। (মিশকাত-পৃ: ২০৬)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে-

يــاابـن ادم لـو بـلـغت ذنوبك عنـان السـمـاء ثـم استـغـفرتنى غفرت لك ولاابالى۔

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান। তোমার গুনাহসমূহ যদি আকাশের মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে যায় অতঃপর আমার কাছে মাফ চাও আমি তোমাকে মাফ করে দেব কোনো পরওয়া করব না।" (মিশকাত-পৃ: ২০৪)

অতএব তওবা করে সকল ধর্ম ছেড়ে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ ছাড়া মাটির ব্যাংকে দান পুণ্যও বাড়াতে পারবে না আর পাপও ক্ষয় হবে না। ঈমান-আক্বীদা দুরস্ত করা ছাড়া দানে পাপমোচন হবে না।

রাত্রিবেলা দান :

মাটির ব্যাংকের প্রচার করতে গিয়ে কোয়ান্টাম যে সকল আয়াতের মন মতলবী ব্যাখ্যা করেছে তার অন্যতম হচ্ছে সূরা আল বাকারার ২৭৪ নং আয়াত। ইরশাদ হচ্ছে-

الَّـذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِـرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَـــوْفٌ عَـــلَيْهِـــمْ وَلَا هُـــمْ يَحْزَنُونَ(البقرة ٢٧٤)

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের সাওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোনো আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" কোয়ান্টামের মাওলানা সাঈদুল হক এই আয়াতটি উল্লেখ করে বলেন- "অর্থাৎ এখানে মাটির ব্যাংকের সরাসরি প্রসঙ্গ না থাকলেও যখন বলা হচ্ছে দিনে রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান এবং এর মাধ্যমে ভয় ও পেরেশানি মুক্তি তখনই আমরা এর বাস্তব দিকগুলো দেখতে পাই। গভীর রাতে স্বামী বা সন্তান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা আপাতদৃষ্টিতে সমাধানের কোনো সহজ পথ নেই এমন সংকটে পতিত হলে, যে ভয় উদ্বেগ বা অস্থিরতা আমাদেরকে গ্রাস করে তা থেকে মুক্তি লাভের প্রার্থনা করে পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে দানের সুযোগ আমরা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতে পারি এই মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে।" (মাটির ব্যাংক বুলেটিন হালখাতা সংখ্যা ২০১২) এখানে বর্ণিত আয়াতের বাস্তব উদাহরণ মাটির ব্যাংক কে বলা হয়েছে। রাতেরবেলা দান করার প্রয়োজন মিটানো যায় মাটির ব্যাংকে দানের মাধ্যমে। তাহলে প্রশ্ন জাগে, মাটির ব্যাংক চালু হওয়ার আগে কি উক্ত আয়াতের বাস্তব কোনো উদাহরণ ছিল না? দেড় হাজার বছর ওই আয়াতের উপর কি আমল করা সম্ভব ছিল না? যদি থেকে থাকে তবে এখন সেই পদ্ধতি বাদ দিয়ে মাটির ব্যাংকের কথা বলা হচ্ছে কেন? গভীর রাতে দান করতে চাইলে মাটির ব্যাংক ছাড়া কি সম্ভব নয়? কিছু টাকা যদি গরিব প্রতিবেশিকে দানের নিয়তে আলাদা করে রাখে আর সকালে তাকে দিয়ে দেয় তবে কোয়ান্টামের মাওলানা এটাকে কিভাবে দেখবেন? উনি শুধু মাটির ব্যাংককে বাস্তব উদাহরণ ভাবছেন কেন? এটা কি পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যা নয়? বাদশাহ আকবরের দরবারী আলেম আবুল ফজল কর্তৃক ইসলামের পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যার

পরিণতি স্মরণ রাখা উচিত।

দানের টাকার খ্রিস্টান পল্লী :

মাটির ব্যাংকে দান করে যারা নিজেকে ধন্য মনে করছেন তাদেরকে একটু ভেবে দেখতে হবে এই টাকায় ইসলাম ও দেশ দুশমনের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে কি না? এ বিষয়ে অবগতির জন্য কোয়ান্টামের বুলেটিন থেকে একটি প্রশ্নোত্তর তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রশ্ন: কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের অর্থ বান্দরবানে লামার শিশুকাননে ব্যয় হয়। যেখানে বেশির ভাগ শিশুই অমুসলিম। এই ব্যয় কি ইসলামসম্মত?

উত্তর : (পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত উল্লেখ করার পর লিখা হয়েছে) অর্থাৎ কুরআনে গ্রহীতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত এ দুটি আয়াতের কোথাও গ্রহীতা হওয়ার জন্য মুসলিম হওয়ার কোনো শর্তের কথা বলা হয়নি। বরং শেষের আয়াতে ভূলুণ্ঠিত অপরিচিত অভাবগ্রস্তের কথা বলা হয়েছে। আর আমাদের দেশে বান্দরবান লামার চেয়ে দুর্গম ও অভাবগ্রস্ত এলাকা কমই আছে। (মাটির ব্যাংক বুলেটিন হালখাতা সংখ্যা ২০১২)

এখানে বিষয়টি শুধু স্বীকার করেই নেয়া হয়নি বরং এর বৈধতা প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা ও করা হয়েছে। মাটির ব্যাংকের টাকায় লামায় গড়ে উঠেছে খ্রিস্টান পল্লী। তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে দেশ ও ইসলামবিরোধী যে চক্রান্ত চলছে সচেতন মহলের কাছে তা স্পষ্ট। ইতিমধ্যে চক্রান্তকারীরা অনেক দূর এগিয়েও গেছে। পার্বত্য জেলার ভূমিসংক্রান্ত সদ্য পাস হওয়া আইন তাদের সর্বশেষ সফলতা। পাহাড়ি জনগণকে ছলেবলে, অর্থলোভে খ্রিস্টান বানানো হচ্ছে। দুস্থদের সাহায্যের নামে দেশেও ইসলামবিরোধী শিক্ষিত জনবল তৈরি করা হচ্ছে। নফল দান-খয়রাত অমুসলিমদের করা বৈধ হলেও দানের টাকায় ইসলাম ও দেশবিরোধী চক্রকে প্রতিষ্ঠিত করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة٢)

"সৎকর্মে ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।" (সূরা আল-মায়েদাহ-২)

অতএব দানের টাকায় খ্রিস্টান পল্লী গড়া এবং অমুসলিমদের হাত শক্তিশালী করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

দানের টাকায় সৎকার :

হিন্দুরা মারা গেলে চিতায় নিয়ে নির্দয়ভাবে আগুনে জালিয়ে সৎকার করা হয়। কোনো মুসলমানের পক্ষে এমন কর্মকাণ্ড সমর্থন দেয়া বা এতে সহায়তা করা অকল্পনীয়। শরীয়তে এর কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু কোয়ান্টাম দরিদ্রদের সাহায্যের নামে মুসলমানদের টাকায় এ ধরনের কর্মসূচিই পরিচালনা করে যাচ্ছে। মাটির ব্যাংক বুলেটিনে লিখা হয়েছে- "বেওয়ারিশ অথবা দাফনে অক্ষম দরিদ্রের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন বা সৎকারের জন্য ২০০৪ সালে রাজশাহীতে শুরু হয় দাফন কার্যক্রম। প্রথম বছর মোট ৫৩টি লাশ দাফন ও সৎকার করা হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয় দেশের অন্যান্য স্থানেও। ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ২৬১টি লাশ দাফন ও সৎকার করা হয়েছে।" (মাটির ব্যাংক বুলেটিন হালখাতা সংখ্যা ২০১২)

অতএব যারা মাটির ব্যাংকে দান করছেন আপনাদের দানের একটি অংশ ব্যয় হচ্ছে শশ্মানের লাশ দাহনে, এটা নিশ্চিত। মুসলমান হিসেবে আপনার জন্য এ কাজটি বৈধ হচ্ছে কি না? দানে পাপ মোচনের পরিবর্তে পাপ কামাই হচ্ছে কি না, একটু ভেবে দেখুন।

দানের টাকায় ব্যান্ডবাদন :

মাটির ব্যাংকের টাকা লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ছাত্রদের নাচ-গান, ব্যান্ডবাদন প্রশিক্ষণের পেছনে ব্যয় করা হচ্ছে। (মাটির ব্যাংক বুলেটিন ২০১২) এটাও কি তবে সৎদান!? গান-বাদ্যের পেছনে অর্থ ব্যয় করে পুণ্যের আশা করা ঈমানের জন্য চরম হুমকি হিসেবে গণ্য হবে।

দানের রক্ত বিক্রি :

ডোনারদের শরীর থেকে কোয়ান্টাম বিনা মূল্যে সংগ্রহ করে নেয় বিপুল পরিমাণ রক্ত। এরপর ওই দানের রক্ত বেচে আয় করে কোটি কোটি টাকা। মানুষের দেয়া দানের রক্ত বেচার কি অধিকার আছে কোয়ান্টামের? রিলিফের চাল বিক্রি করা যদি চুরি হিসেবে গণ্য হয় তবে দানের রক্ত বিক্রি মানবসেবা হয় কী করে? মানবসেবা হোক বা না হোক, টাকা জোগাড় হলেই হলো। কোয়ান্টামের চাই শুধু টাকা। জেনে রাখা দরকার, ইসলামের দৃষ্টিতে মূমুর্ষ রোগীকে রক্তদান বৈধ হলেও রক্ত বিক্রয় কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। এধরনের গুনাহের কাজ থেকে আল্লাহ তা'আলা সকলকে বেচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

কোয়ান্টাম মেথড-১৮

কোয়ান্টাম হিলিং

মুফতী শরীফুল আ'জম

একজন মুসলমান হিসেবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কোয়ান্টামকে যাচাই করতে হলে প্রথমে ঈমানের স্থান ঠিক করতে হবে। সকল ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমান ছাড়া কোনো ধরনের ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। আর ঈমান হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র রব, ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা ও কাজে-কর্মে ফুটিয়ে তোলার নাম। ঠিক এর বিপরীত বস্তু অস্বীকার করাও ঈমানের জন্য জরুরি। তাই দেবদেবী আর পিতা-পুত্রের কল্পকাহিনী মিথ্যা, ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম ভ্রান্ত আর শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের পর সকল নবী-রাসূলের অনুসরণ ভ্রষ্টতা বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলাকেও বিশ্বাস করব আবার দেবদেবীকেও অস্বীকার করব না তাহলে ঈমানদার হওয়া যাবে না। ইসলামের সাথে সাথে অন্য সব ধর্ম পালনকে বৈধ মনে করলে মুসলমান হওয়া যাবে না। হাদীস শরীফের ভাষায়–

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ :ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا (مسلم ٣٤، ٥٦)

দু'আ কখন ইবাদত হয় :

অন্য সকল ইবাদতের ন্যায় দু'আও শুধু তখনই ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে যখন তা ঈমানের সাথে হবে। বেঈমানের দু'আ হিলিং বা প্রার্থনা হতে পারে, ইবাদত নয়। তবে কবুলের বিষয়টি ভিন্ন ব্যাপার। এ জগতে কাফের, মুশরিক আর খোদাদ্রোহীদের দু'আও কবুল হতে পারে। এটা তাদের পুণ্যবান হওয়ার প্রমাণ নয়। তাদের কুফর-শিরকের চূড়ান্ত শাস্তির জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে কোনো ছাড় দেয়া হবে না। যেমন– জেলখানায় আসামিদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বা ডিভিশন দেয়া হয় কিন্তু সাজার ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয় না। পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন করো। (সূরা সিজদাহ-২০)

হিলিং কী ও কেন?

এবার আসা যাক কোয়ান্টাম হিলিং প্রসঙ্গের দিকে। হিলিং হচ্ছে বিশেষ প্রার্থনা, যার মাধ্যমে কারো সুস্থতা, বিয়ে বা চাকুরি ইত্যাদি কামনা করা হয়। বাড়তি আকর্ষণের জন্য প্রার্থনার নাম রাখা হয়েছে হিলিং। অভিনব যত পরিভাষা স্থান পেয়েছে কোয়ান্টামে! ধ্যানরত অবস্থায় নিজের বা অন্যের মঙ্গল কামনায় করা হয়ে থাকে এই হিলিং। একাকী ও সম্মিলিত উভয় পদ্ধতিতে করা হয়। স্বেচ্ছায় বা কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে হিলিং করা হয়। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে সম্মিলিত হিলিংয়ের আয়োজন থাকে। দু'আর জন্য নাম-ঠিকানা লিখে আবেদন করতে পারে যে কেউ। সর্বনিম্ন ফি ৪০ টাকা। হিলিংকে ইবাদত বলে আখ্যা দেয়া হয়। কোয়ান্টামের অন্যতম চমক এই হিলিং।

হিলিং ফি :

কোয়ান্টাম এক দিকে দাবি করে তাদের শিক্ষা নাকি নবী-রাসূলদের শিক্ষার অনুরূপ। অপরদিকে প্রতিবার হিলিং বাবদ দু'আ প্রার্থীর কাছ থেকে সদকার নামে টাকা আদায় করা হয়। চল্লিশ টাকা গুনে ভাঙতি করে কে নিয়ে যায়? ব্যস, এক বাহানায় কিছু টাকা জোগাড় হয়ে যায়। অথচ নবী-রাসূলগণ দু'আ প্রার্থীর কাছ থেকে কোনো ফি গ্রহণ করতেন না। হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর হুকুমে অনেক রোগীর নিরাময় করতেন, কোনো ফি বা সদকা নিতেন না। পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে-

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّٰهِ

"আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে।" (সূরা আলে ইমরান-৪৯)

যৌথ হিলিং :

কোয়ান্টামের বিভিন্ন সেল ও শাখায় মঙ্গলবার আয়োজন করা হয় যৌথ হিলিং। একদল সাইকি লেভেলের ধ্যানি ধ্যানমগ্ন হয়ে প্রার্থনা করে। সদস্যদের মধ্যে সকল ধর্মের লোকই থাকে। দু'আ প্রার্থীদের কাগজগুলো ভাগ করে তাদের হাতে হাতে দিয়ে

দেয়া হয়। চোখ মেলে এক নজর কাগজটি পড়ে শুরু হয় চোখ বন্ধ করে প্রার্থনার পালা। মুখে শব্দ করে প্রার্থনা নয়, শুধু মৌনভাবে দু'আ চলতে থাকে। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস মতে স্রষ্টার কাছে চাইতে থাকে। মুসলমান আল্লাহর কাছে, হিন্দু দেবদেবীর কাছে, খ্রিস্টান ঈশ্বরের কাছে আর বৌদ্ধ ধ্যানি চায় প্রকৃতির কাছে। কোয়ান্টামের মতে এই যৌথ হিলিং হচ্ছে নিরাময়ের এক কার্যকর প্রক্রিয়া। কালেকটিভ কনশাসনেস বা সম্মিলিত চেতনা বলয়ের প্রভাবে যৌথ হিলিংয়ে সঞ্চারিত হয় এক নতুন শক্তি। পদার্থবিদ ড. জন পলিনহর্ন যৌথ হিলিংকে তুলনা করেছেন লেজার রশ্মির সাথে, যা শক্তিশালী হয় তরঙ্গ প্রবাহের ঐকতানের ফলে। ঠিক তেমনি একই ধরনের প্রার্থনার প্রতিধ্বনি মিলিত হয়ে একটি শক্তিশালী বলয় বা বেষ্টনীতে পরিণত হয়, যা প্রার্থনা কার্যকর হতে সহায়তা করে। কোয়ান্টামের পরিভাষায় এই শক্তিকে বলা হয়–

Quantum Compassionate Resonance Field

'কোয়ান্টাম সমমর্মী অনুরণন বলয়'।

যৌথ হিলিংয়ের শক্তি :

কোয়ান্টাম প্রচার করে যে ড. ওয়াল্টার ওয়েস্টেনের মতে যৌথ হিলিংয়ের শক্তি বাড়ে সমগুণ হারে। অর্থাৎ ২ জন একসাথে হিলিং করলে তা হয় ৪ জনের সমান। ১০ জনে ১০০ জন অনুরূপ ১০০ জনে হয় ১০০০০ জনের সমান শক্তি। আর কোয়ান্টাম সমমর্মী অনুরণন বলয় এ শক্তিকে করে আরো ১০ গুণ। অর্থাৎ যখন ১০০ জন কোয়ান্টাম হিলিংয়ে সমবেত হন তখন এ শক্তি দাঁড়ায় ১ লক্ষ মানুষের একক প্রার্থনার সমান।

ব্যস, ড. জন আর ড. ওয়াল্টারের নাম দেখে শুরু হয় আধুনিক মানুষের জোয়ার। আধুনিকতার বিষাক্ত ছোবল খেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অস্থির চিত্তের মানুষেরা প্রশান্তির আশায় নাম দেয় হিলিং সেশনে। তাদের এই হিলিং ঈমানের জন্য ক্ষতিকর কি না তা ভাবার ফুরসত থাকে না। ধর্মের ব্যাপারে আধুনিক মানুষের এই উদাসীনতাকে কাজে লাগাচ্ছে কোয়ান্টাম। আইওয়াশ স্বরূপ দু'আ ও দানের ফযিলত সম্বলিত কিছু আয়াত ও হাদীস বিকৃতভাবে প্রচার করে ঈমান ধ্বংসের বিষয়টি মানুষকে বুঝতে দেয় না।

কুফরি হিলিং :

মুসলমানদের চিন্তাচেতনা ও কৃষ্টি-কালচার থেকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ বিলুপ্ত করে ধর্মনিরপেক্ষতার বীচ বপনের নানা অপকৌশল বর্তমান সময়ে উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোয়ান্টামের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সকল ধর্মের লোক নিয়ে যৌথভাবে পরিচালিত হয় ওদের যাবতীয় অনুষ্ঠান। ইসলাম আর কুফরের ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিতে চাইছে কোয়ান্টাম। যৌথ হিলিং সেশনে আল্লাহ, গড, ভগবান, ঈশ্বর বা প্রকৃতি সকলের কাছেই প্রার্থনা করা হচ্ছে। কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাস মতে এদের যে কেউ দাতা হতে পারে। এটা স্পষ্ট কুফরি মতবাদ। বস্তুত একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই দেবার মালিক। তার সাথে অন্য দেবদেবীকে ডাকা শিরক। এ ধরনের কুফরি হিলিংয়ের আয়োজন বা তাতে নাম লিখিয়ে নিরাময় প্রার্থনা যে কত বড় ভ্রষ্টতা তা সাধারণ বিবেকমান মানুষও অনুমান করতে পারে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

"অতএব আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন।" (শু'আরা-২১৩)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হবে। বিধান তারই এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা কাসাস-৮৮)

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١٤)

"ইনি আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা, সম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটির ও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।" (সূরায়ে ফাতির ১৪-১৫)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না। তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর।" (সূরা আহকাফ ৫)

এ সকল আয়াতে গাইরুল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইতে বা তাদের উপাসনা-পূজা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব যৌথ

হিলিং বা নিরাময়ের নামে গড, ভগবান, দেবদেবী বা প্রকৃতির কাছে যে প্রার্থনা করা হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামের সাথে এ সকল শরিকদের নামের সংমিশ্রণের ফলে কী ধরনের রশ্মি সৃষ্টি হতে পারে একটু ভেবে দেখতে হবে। এর ফলে সৃষ্ট সমমর্মী অনুরণন বলয়' যে একটি ঈমান ধ্বংসের ফাঁদে পরিণত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে একজন মুসলমান নিরাময় প্রার্থীর নাম যখন কোনো বিধর্মী সাইকির হাতে যায় আর সে গাইরুল্লাহর কাছে তার জন্য প্রার্থনা করে তখন পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়? গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে ঈমান কোন স্তরে নেমে আসে? এ সকল বিষয় কি কখনো ভেবে দেখা হয়েছে?

ভগবান কিন্তু আল্লাহ নয় :

আল্লাহ, ভগবান, গড বা ঈশ্বর একই সত্তার ভিন্ন ভিন্ন নাম বৈ কিছু নয়- এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে যৌথ হিলিংসহ কোয়ান্টামের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে। যেমন কোয়ান্টাম শিক্ষা হচ্ছে- "দিনে বারবার বলব শোকর আলহামদুলিল্লাহ/থ্যাংকস গড/ হরিওম/প্রভুকে ধন্যবাদ! বেশ ভালো আছি।" (কোয়ান্টাম কণিকা-২৩৯)

অর্থাৎ আল্লাহ, গড বা দেবদেবী যে কারো নামেই শোকর আদায় করা যায়, এখানে কোনো ভেদাভেদ নেই।

অন্যত্র বলা হয়েছে "বেদ, ধম্মপদ, বাইবেল এবং কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণীর মূল সুরের ঐক্য আপনাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবে। ধর্মাচারে ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও আপনি অনুভব করবেন স্রষ্টার একত্বের সাথে সাথে মানবজাতির একত্বে।" (কোয়ান্টাম কণিকা-৮)

অর্থাৎ মুসলমান ভিন্ন কোনো জাতি নয় সকল ধর্মের মানুষ মিলে একই জাতি। বিভিন্ন ধর্মে স্রষ্টার যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাও একই সত্তাকে ঘিরে। অথচ আল্লাহর পরিচয় সূরা ইখলাছে এভাবে দেয়া হয়েছে। যিনি এক, অমুখাপেক্ষী, কারো জনকও নন, জাতকও নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। খ্রিস্টানদের মনগড়া ধর্ম মতে 'গড' হচ্ছে পিতা+পুত্র+পবিত্রতা এই তিনের সমষ্টির নাম। আর হিন্দু ধর্ম মতে 'ওম' হচ্ছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন প্রধান ভগবানের সমষ্টি। রইল বৌদ্ধ ধর্ম, সুতরাং সেখানে স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। প্রকৃতিই সব কিছুর নিয়ন্তা, এটাই নাস্তিক্যবাদের কথা। এবার বলুন, হিলিংয়ের নামে এত বিপরীতমুখী স্রষ্টাদের কাছে প্রার্থনা করা শিরক না হয়ে যায় কোথায়? আল্লাহ, গড, ওম বা দেবদেবী কখনোই এক সত্ত্বা হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

"এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান।" (সূরা হজ্ব-৬২)

রণাঙ্গনে 'হুবাল' দেবতা :

বিষয়টি আরো স্পষ্ট বুঝে আসে পবিত্র সীরাতের একটি ঘটনা থেকে। মক্কার কুরাইশগণ বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তৃতীয় হিজরীতে সর্বশক্তি নিয়ে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে উহুদ প্রান্তরে সমবেত হয়। সাথে আনে হুবাল দেবতার বিশাল প্রতিমা। শুরু হয় তুমূল লড়াই। এক পক্ষের ভরসা হুবাল দেবতা, অপর পক্ষের মহান আল্লাহ। পরিশেষে চূড়ান্ত বিজয় মুসলমানদের অর্জিত হলো আর হুবাল দেবতাকে নিয়ে কুরাইশগণ দ্রুত পালায়ন করল। যুদ্ধ শেষে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আহত সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে পাহাড়ের নিরাপদ স্থানে উঠে পড়লেন। আহতদের সেবা শুশ্রূষা চলতে লাগল। এমন সময় শত্রু বাহিনীর দলপতি আবু সুফিয়ান সম্মুখস্থ পাহাড়ে আরোহন করে চিৎকার করে বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখানে আছেন কি? নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন কেউ উত্তর দিওনা। আবার জিজ্ঞেস করল, আবু বকর আছেন কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কেউ উত্তর দিওনা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, উমর এখানে আছেন কি? কোনো সাড়া না পেয়ে এবার সে বলতে আরম্ভ করল, বুঝতে পেরেছি এরা সকলে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। জীবিত থাকলে অবশ্য উত্তর দিত। এবার হযরত উমর (রা.) আর চুপ থাকতে পারলেন না। বললেন- তুই মিথ্যা বলছিস, তোর দর্প চূর্ণ করার জন্য এদের সকলকে আল্লাহ জীবিত রেখেছেন। এরপর আবু সুফিয়ান উলুধ্বনি আরম্ভ করল–

اعل هبل اعل هبل

"হুবাল দেবতার জয় হোক জয় হোক।"

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবার উত্তর দিতে বললেন। সাহাবারা (রা.) বললেন, আমরা এর প্রতি উত্তরে কী বলব? নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিখিয়ে দিলেন, বলো-

الله اعلى واجل

"আল্লাহ মহৎ আল্লাহ মহান।"

আবু সুফিয়ান আবার বলল-

لنا عزى ولا عزى لكم

"আমাদের উযযা দেবতা আছে তোমাদের উযযা দেবতা নেই।"

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদেরকে উত্তর দিতে বললেন। সাহাবারা বললেন, আমরা কী উত্তর দেব? নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবারও শিখিয়ে দিলেন, বলো–

الله مولانا ولامولى لكم

"আল্লাহ আমাদের প্রভু, তোমাদের কোনো প্রভু নেই।"

আবু সুফিয়ান কথায় সুবিধা করতে না পেরে আগামী বছর আবার যুদ্ধের হুমকি দিয়ে দ্রুত সটকে পড়ে। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। (বুখারী শরীফ-৪০৪৩)

বোঝা গেল, দেবতার উপাসকদের কোনো প্রভু নেই। আল্লাহ আর ভগবান, গড বা দেবদেবী কখনো এক হতে পারে না। তদ্রূপ মুসলমান আর বিধর্মীরা মিলে এক জাতি হতে পারে না।

হুবাল দেবতার উপাসকগণ আজ কোয়ান্টামে একত্রিত হয়েছে। যৌথ হিলিংয়ের নামে চলছে গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা। কোয়ান্টামের সৌজন্যে মুসলমানদের কাছে দেবদেবীর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে উদ্বেগজনক হারে।

বিপদসংকেত :

কুফর-শিরকে লিপ্ত থেকেও যারা হিলিংয়ের সুফল পাচ্ছে বলে দাবি করছে তাদের মনে রাখতে হবে যে, এতে তাদের জন্য মহাবিপদের সংকেত রয়েছে। তাই তুষ্টির ঢেঁকুর তোলার কোনো কারণ নেই। ঘুড়ি ওড়ানোর সময় মালিক যখন সুতায় ঢিল দেয় ঘুড়ি তখন খুশিতে আত্মহারা হয়ে খোলা আকাশে মুক্ত মনে ডিগবাজি খেতে থাকে। পরক্ষণেই যখন সুতায় টান পড়ে তখন মালিকের কাছে ধরাশায়ী হয়ে যায়। কুফর-শিরকে লিপ্ত থেকে যারা প্রার্থনা কবুল হয়েছে ভেবে নিজেদেরকে সত্যের অনুসারী মনে করছেন জীবনের সুতায় টান পড়লে তাদের ভুল ভেঙে যাবে। হিলিং করে পার্থিব সুবিধা পেতে পারেন কিন্তু ঈমান না থাকলে মালিকের কাছে ধরাশায়ী হতে হবে। পার্থিব সফলতা, নিরাময় বা লক্ষ্য অর্জন তাদের জন্য সদা এই বিপদসংকেত দিয়ে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦)

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছু নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হলো।" (সূরা হুদ ১৫-১৬)

শয়তানের দু'আ কবুল :

হিলিংয়ের সফলতা কোয়ান্টামের অন্যতম আকর্ষণ। এখানে এসে অনেকে ধোঁকায় পড়ে যায়। কোয়ান্টাম যদি ভ্রান্তই হয় তবে তাদের প্রার্থনায় নিরাময় হয় কী করে? নিশ্চয় এখানে কিছু আছে। মনে রাখতে হবে প্রার্থনা কবুল হওয়া অলৌকিক কিছু নয়। এর বিচারে হক-বাতিল যাচাই করা যাবে না। অভিশপ্তের দু'আও কবুল হতে পারে। সবচেয়ে বড় কাফের, অভিশপ্ত ইবলিস শয়তানের দু'আও কবুল হয়েছিল। এটা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মহানুভবতার একটি নিদর্শন মাত্র। বিষয়টি ইবলিস শয়তানের জানা ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলার চরম ক্রোধের মুহূর্তেও সে এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অবাধ্যতার কারণে যখন ইবলিসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছিল তখন সে দু'আ করল-

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨)

"সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো, সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (সূরা হিজর ৩৬-৩৮)

ইবলিস শয়তানের দু'আ কবুল করা হয়েছে বলে তার সাজা মওকুফ করা হয়নি। তার জন্য অপেক্ষা করছে শোচনীয় পরিণতি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

"তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (সূরা ছোয়াদ-৮৫)

অতএব ঈমান-আমলের তোয়াক্কা না করে যৌথ হিলিং করে যারা কিছু অর্জন করে ফেলেছেন বলে ভাবছেন তাদের জন্যও সেই একই পরিণতি অপেক্ষা করছে।

আল্লাহ যখন দিতে ডাকেন :

কোনো দাতা যখন নিজ থেকে দেয়ার জন্য ডাকে ওই মুহূর্তে হাত পাতলে ফিরিয়ে দেয়া অকল্পনীয়। রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ তা'আলা নিজেই প্রথম আসমানে এসে বান্দাকে এই বলে ডাকতে থাকেন-

من يدعونى فاستجيب له من يسالنى فاعطيه من يستغفرنى فاغفرله

"কে আছে আমাকে ডাকবে আমি তাকে সাড়া দেব। কে আছে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব।

কে আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে মাফ করে দেব। (বুখারী শরীফ ১/১৫৩)

অতএব যৌথ হিলিংয়ে গিয়ে ঈমানকে হুমকির মুখে ফেলার কী প্রয়োজন, কষ্ট করে শেষ রাতে জেগে বিছানায় শুয়ে থেকেও দু'আ করে নিরাময় লাভ বা উদ্দেশ্য হাসিল করা যেতে পারে। আল্লাহ নিজেই যখন ডাকছেন তখন কি আর প্রার্থীকে বঞ্চিত করবেন।

দু'আর আদবসমূহ :

দু'আ হচ্ছে সকল ইবাদতের মগজ। অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় দু'আর মাঝে অনেক গুণ বেশি আকুতি ও বিনয়ের প্রকাশ ঘটে। ইবাদতের প্রাণই হচ্ছে আল্লাহর সামনে বান্দার অক্ষমতা ও হীনতার বহিঃপ্রকাশ। তাই দু'আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হচ্ছে কাকুতি-মিনতি আর অনুনয়-বিনুনয় করে দু'আ করা। হিলিংয়ের মতো চোখ বন্ধ করে কল্পনা করা নয়।

দু'আর একটি আদব হচ্ছে শুরু-শেষে দরুদ শরীফ পাঠ করা। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি পাঠানো দরুদ যেহেতু নিশ্চিত কবুল হয় তাই দরুদের মাঝখানে নিজের আবেদনকে মুড়িয়ে দিলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। পক্ষান্তরে হিলিং দরুদ শরীফ ছাড়াই হয়ে থাকে। হিলিংয়ের জন্য তো ঈমানও লাগে না। দরুদের কথা বলাই বাহুল্য।

দু'আর একটি আদব হচ্ছে দু'হাত সিনা বরাবর উত্তোলন করা এবং আকাশের দিকে হাত পেতে রাখা। যোগীদের মতো পাথর হয়ে বসে থাকা নয়।

কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা নিয়ে দু'আ করা। তবে কবুল না হলেও সন্তুষ্ট থাকার মানসিকতা থাকা দু'আর অন্যতম আদব।

দু'আ কবুলের ধাপ :

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখনই কোনো মুসলমান গুনাহ ও আত্মীয়তা ছিন্নতা ছাড়া যেকোনো বিষয়ে দু'আ করে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আর কারণে তিনটি জিনিসের একটি অবশ্যই তাকে দান করেন। ১. হয়তো তাৎক্ষণিক হুবহু তার কাম্য বস্তু তাকে দান করেন। ২. অথবা পরকালের জন্য তার প্রাপ্য জমা করে রাখেন। ৩. অথবা ওই দু'আর বদলে কোনো অসুভ পরিণয় থেকে তাকে বাঁচিয়ে দেন। (মুসনাদে আহমদ ১১১৩৩)

তাই দু'আর পর প্রত্যাশিত বস্তু না পেলে হতাশার কোনো কারণ নেই। আমার অজান্তেই হয়তো কোনো বালা-মুসিবত কেটে গছে অথবা এর প্রতিদান পরকালের জন্য সঞ্চিত হয়ে গেছে। অবুঝ শিশু অনেক সময় এমন জিনিসের আবদার করে, যা তার জন্য ক্ষতিকর। মা-বাবা তখন তার জন্য উপযোগী অন্য কোনো বস্তু দানের মাধ্যমে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। মোটকথা, মুমিনের দু'আ কখনই বিফলে যায় না। হ্যাঁ! কবুলের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

বিপদের প্রতিদান :

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের কারণে অনেক গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। (তিরমিযী ৯০৬৬)

অন্য বর্ণনায় আছে– কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে কোন বিশেষ মর্যাদায় উন্নিত করতে চান, যা সে স্বীয় নেক আমলের দ্বারা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে কোনো বিপদ বা অসুস্থতা দান করেন, যার ফলে তার ওই মর্যাদা লাভ হয়। (ইবনে হিব্বান ২৯০৮)

অন্য আরেক হাদীসে আছে– কিয়ামতের দিন বিপদগ্রস্তদের অনেক সাওয়াব লাভ হবে। যা দেখে নিয়ামত প্রাপ্তরা আক্ষেপের সুরে বলবে, হায় দুনিয়াতে আমাদের শরীর যদি কাঁচি দিয়ে কেটে ক্ষত-বিক্ষত করা হতো তাহলে আমরাও আজ এই মর্যাদা লাভ করতাম। (তিরমিযী ২৪০২)

অতএব বিপদাপদে বিচলিত না হয়ে ধৈর্যধারণ করলে মুসিবত নেয়ামতে রূপান্তরিত হতে পারে।

বিপদ মুক্তির আমল :

মানুষের যেকোনো বিপদাপদ তার জানা-অজানা গুনাহের কারণে হয়ে থাকে তা থেকে উত্তরণের পন্থা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাতলে দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-

عـن عبـد اللــه بـن عباس رضي اللـه عنهما قَال :قَـالَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :مَـنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰـهُ لَهُ مِـنْ كُـلِّ هَـمٍّ فَرَجًا ومِن كُلِّ ضِيـقٍ مَـخْرَجًا ، ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিগফার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার সকল দুঃশ্চিন্তা দূর করে দেবেন এবং সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে দেবেন এবং তাকে অকল্পনীয় মাধ্যম থেকে রিযিক দান করবেন। (আবু দাউদ ১৫১৮)

অতএব, বিপদ মুক্তি বা নিরাময়ের আশায় কোয়ান্টামের সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে পরকাল ধ্বংস করার পরিবর্তে বেশি বেশি তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে নিজের জীবনকে শুধরিয়ে নেওয়া হবে বুদ্ধিমানের পরিচয়। এতে ঈমানও রক্ষা পাবে দু'আও কবুল হবে।

কোয়ান্টাম মেথড-১৯

ধ্যান মুরাকাবা মেডিটেশন

মুফতী শরীফুল আ'জম

ইসলামে ধ্যান মুরাকাবা :
মুরাকাবা আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লক্ষ্যে পৌছার মাধ্যম হিসেবে যার চর্চা করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই বান্দার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় জাগতিক মোহ। ফলে বান্দার মন মাওলার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়। মন সদা ছুটে বেড়ায় ভোগ-বিলাস আর কাম-রিপুর পেছনে। মনের এই ঝোঁক পরিবর্তনের মহৌষধ হচ্ছে মুরাকাবা। চোখ বন্ধ করে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক মনে আল্লাহর সত্তা বা গুণাবলির কল্পনা করা এবং মনের মাঝে তার মহব্বত গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করা হয় মুরাকাবার মাধ্যমে। ধ্যানের বিষয়বস্তু সাধারণত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মর্মবাণী হয়ে থাকে। যেমন–

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

"সেকি জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা দেখছেন" (সূরা আল-আ'লাক- ১৪)

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

"তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাকো।" (সূরা আল-হাদীদ-৪)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

"আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।"(সূরা ক্বাফ-১৬)

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

"তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান।" (সূরা আল-বাকারা-১১৫)

ইত্যাদি আয়াতের মাঝে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা এবং লাগাতার এই কল্পনার মাঝে বিভোর হয়ে যাওয়া। (কুল্লিয়াতে এমদাদিয়া-৩৫) এক নাগারে দীর্ঘক্ষণ এই চর্চা নিয়মিত করার ফলে দুনিয়ার মহব্বত হ্রাস পেয়ে বান্দা হয়ে ওঠে আখেরাতমুখী। দুনিয়ার মহব্বতই হচ্ছে ইহকাল ও পরকাল ধ্বংসের মূল কারণ। মুরাকাবার দরুন এই ব্যাধি দূর হয়ে যায় এবং শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম পালনের যোগ্যতা অর্জিত হয়। বিস্তারিত জানতে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাও. শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) রচিত 'বাওয়াদেরুন নাওয়াদের' এবং 'শরীয়ত ও তরীকত' নামক কিতাব দুটি দেখা যেতে পারে।

অন্য ধর্মে ধ্যান :
ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের সাধকদের মাঝেও মৌন সাধনার প্রচলন আছে। তারা নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস মতে বিভিন্ন প্রকারের ধ্যান করে থাকে। যেমন তুরীয় ধ্যান, বিপাসনা, কুণ্ডলিনী, যোগনিদ্রা, জেন ধ্যান, ওসো, তিব্বতীয়, আনন্দমার্গ ইত্যাদি। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে ভারতে যোগ বা যোগার উন্মেষ ঘটে। এই যোগের অঙ্গ হচ্ছে, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, অঙ্গভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ। (ডা. বিমল ছাজেড়, সাওল গাইড বুক-১০৩-১০৫) দ্রাবিড় সভ্যতায় রয়েছে যোগধ্যান। মহামতি বুদ্ধ শিখিয়ে গেছেন বিপাসন ধ্যান পদ্ধতি। এই ধ্যান চীনে চেন নামে এবং জাপানে জেন নামে প্রচলিত হলো, যা আসলে বাংলা ধ্যান শব্দেরই ভাষাগত রূপান্তর। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-১৩৬)

এ সকল ধ্যানের মাধ্যমে সাধু সন্নাসীরা পার্থিব বিভিন্ন উপকার লাভ করে থাকে। কুফর-শিরকে লিপ্ত থেকেও মৌন সাধনার মাধ্যমে ইহকালের সাময়িক কোনো কিছু অর্জন অসম্ভ কিছু নয়। তবে ঈমান-আক্বীদা দুরস্ত করে যে মুরাকাবা করা হয় তার মাধ্যমে ভিন্ন নূর অর্জন হয় এবং উভয় জাহানে উপকৃত হওয়া যায়।

নিষ্ফল ধ্যান :
ঈমান ছাড়া মৌন সাধনায় যতই উন্নতি সাধন করা হোক না কেন আখেরাতে তা ফলপ্রসূ হবে না। আখেরাতের সুযোগ-সুবিধা শুধু ঈমানদারের জন্যই সংরক্ষিত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١) (النّٰزعات)

"তখন যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়ালখুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" (সুরা আন নাযি'আত-৩৭-৪১)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩)

"যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না। কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।" (সূরা আশ শো'আরা ৮৮, ৮৯)

আর সুস্থ অন্তর হচ্ছে, যাতে শিরিক কুফর থাকে না। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্য হয়ে যত প্রকার ধ্যান সাধনাই করা হোক আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

উপকারী ধ্যান :

আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) উপকারী ধ্যানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-

فکر آں باشد کہ بکشاید رہے
راہ آں باشد کہ پیش آید شہے

"উপকারী ধ্যান হচ্ছে ওই ধ্যান, যা পথ দেখায় আর উপকারী পথ হচ্ছে ওই পথ, যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। (মা'আরেফে মাসনবী-৪৩৭)

অর্থাৎ যে ধ্যান বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য করে তার মা'রেফত ও মহব্বত দান করে সেটাই প্রকৃত পক্ষে উপকারী ধ্যান। এর বিপরীত যে ধ্যান বান্দাকে মাখলুকমুখী করে তা ক্ষতিকর। এ বিষয়ে মাও. রুমী (রহ.) বলেন-

غیر تو ہر چہ خوش است وناخوش است
آدمی سوز ست وعین آتش است

"হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত যত বস্তু রয়েছে চাই তা আমাদের দৃষ্টিতে প্রিয় হোক বা অপ্রিয় এসবই মানুষকে পথভ্রষ্টকারী এবং আগুনতুল্য। (মা'আরেফে মাসনবী-৬১৩)

অতএব ধ্যান আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই করতে হবে, দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। অন্যথায় এই ধ্যান ধ্বংস ডেকে আনবে।

বুদ্ধিমান ধ্যানী :

বুদ্ধিমানের ধ্যানসাধনা তাকে আল্লাহ তা'আলার মারেফত দান করে। তাঁর মহব্বতে বিভোর করে তোলে। সন্ধান দেয় তাকে তাওহীদ, রেসালত আর আখেরাতের মতো মহা সত্যের। তাফাক্কুর বা ধ্যানের মাধ্যমে যে আল্লাহকে চিনতে না পারে সে নির্বোধ, তার ধ্যান সাধনা ও নিষ্ফল।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)

"নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।"(সুরা আলে ইমরান-১৯০-১৯১)

উক্ত আয়াতে ওই সকল লোকদের বুদ্ধিমান বলা হয়েছে যারা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর সৃষ্টিজগতের মাঝে ধ্যান বা তাফাক্কুর করে তাওহীদ ও আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে ধ্যান :

আধ্যাত্মিক সাধনার এই ধ্যান বর্তমানের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে। মূলত ধ্যানের দৈহিক সুফল পশ্চিমা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এ নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। পাশ্চাত্যের মানুষের প্রধান সমস্যা হচ্ছে টেনশন আর টেনশন থেকে ভয়াবহ মাত্রায় জন্ম নিয়েছে হৃদরোগ। বিজ্ঞানীরা টেনশনের মহৌষধ হিসেবে আবিষ্কার করে ধ্যান বা মুরাকাবাকে। তাই প্রশান্তি ও নিরাময় লাভের ক্ষেত্রে তারা ধ্যানের প্রয়োগ আরম্ভ করে। ইংরেজিতে এর নামকরণ করা হয় মেডিটেশন। টেকনিক সেই আগেরটাই শুধু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। সাথে যোগ হয় ধ্যানের বিভিন্ন উপকারীতা ও কার্যকারীতার ওপর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ১৯৬৪ সালে সাইকো কেবারনেটিক্স, ১৯৬৬ সালে সিলভা মেথড, ১৯৬৮ সালে ইএসটিসহ প্রায় অর্ধশত ধ্যান পদ্ধতি চালু হয় পশ্চিমা দেশে। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-১৩৬)

মোটকথা, টেনশন মুক্তির জন্য চালু হয় মেডিটেশন চর্চা, যা মনোদৈহিক চিকিৎসার একটি অংশ হিসেবে গণ্য হতে থাকে। ধর্মীয় কোনো বিষয় বা আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে শুধু শরীরকে শিথিল করে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা প্রত্যয়নের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করার মাধ্যমে মস্তিষ্ককে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করা হয়। ফলে হ্রাস পায় টেনশন।

এখানেই মুরাকাবার সাথে মেডিটেশনরে মৌলিক পার্থক্য। মেডিটেশনে মনোযোগকে সূচাগ্র করে মনকে শুধু শান্ত করার চেষ্টা করা হয় আর মুরাকাবার মাঝে মনকে শান্ত-স্থির করে সেখানে আল্লাহর মহব্বত ও মা'রেফত গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করা হয়।

এই আলোচনা থেকে ধ্যানের তিনটি লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া গেল।

(১) বিশুদ্ধ ঈমান আকীদার সাথে আল্লাহর মহব্বত ও মা'রেফাত লাভের ধ্যান। যা ওলী-বুযুর্গদের মাঝে প্রচলিত।

(২) ঈমান ছাড়া আত্ম উন্নয়নের ধ্যান, যা মুনি-ঋষি বা যোগীদের মাঝে প্রচলিত।

(৩) টেনশন মুক্তির জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রচলিত ধ্যান বা মেডিটেশন।

কোয়ান্টাম ধ্যান :

এখন দেখা যাক কোয়ান্টামে প্রচলিত ধ্যানের কী অবস্থা, উল্লিখিত তিন প্রকারের কোনটির চর্চা করা হচ্ছে কোয়ান্টামে? অনুসন্ধান করে দেখা যায় কোয়ান্টামের গুরুজি হতাশা-দুর্দশাগ্রস্ত এবং শোক-দুঃখে কাতর মানুষের কষ্ট

লাঘব করতে উদ্ভাবন করেন বিশেষ পদ্ধতি 'কোয়ান্টাম মেথড'। ধ্যানের উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের নির্দিষ্ট কোনো এক প্রকারের মাঝে তা সীমাবদ্ধ নয়। সকল ধর্মের ধ্যানের অভিজ্ঞতার সাথে বৈজ্ঞানিক থিওরি যোগে উদ্ভাবিত এই কোয়ান্টাম ধ্যান। ঈমান থাকা বা না থাকার মাঝে এখানে কোনো তফাত নেই। সর্বজান্তার ন্যায় তিনি এখানে বহুমুখী অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। তবে সাফল্য ও প্রশান্তির এই সূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি গোড়ায় গলদ করে বসেন। মানবজাতির দুর্দশা ও অশান্তির কারণ চিহ্নিত করতে তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দেন। অশান্তির কারণের মাঝেই মানুষকে নিমজ্জিত করে রেখে শান্তি আর সফলতার আশ্বাস দেন।

গোড়ায় গলদ :

দুনিয়ার লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা মানুষের অশান্তি আর টেনশনের মূল কারণ। এ সকল চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। আর নাফরমানী দুঃখ-দুর্দশা টেনে আনে। বান্দা দুনিয়ার মহব্বতে বিভোর হয়ে আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর আনুগত্যের কথা ভুলে বসে। এহেন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পন্থা হচ্ছে বান্দার মন থেকে দুনিয়ার মহব্বত বিদূরিত করে আল্লাহর মহব্বত জাগিয়ে তোলা।

বিষয়টিকে আরেফ বিল্লাহ আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। ঘটনাটি এমন : এক বাদশাহ শিকারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। পথিমধ্যে এক বাঁদীকে দেখে তার রূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন এবং তাকে ক্রয় করে শাহী মহলে নিয়ে এলেন। সে বাঁদী সমরকন্দের এক স্বর্ণকারের প্রেমে আসক্ত ছিল, তাই শাহী মহলে তার কিছুতেই মন বসছিল না। বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে দিন দিন হাড্ডি সার হতে লাগল। এদিকে বাদশার অস্থিরতার শেষ নেই। রাজ্যের ডাক্তার-কবিরাজ একত্র করে ফেলল, কিন্তু কোনো ঔষধই কাজ করছে না। দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাদশাহ ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নে এক বুযুর্গের সাক্ষাৎ পেল। তিনি সুচিকিৎসার আশ্বাস দিয়ে শান্ত্বনা দিলেন। ঘুম থেকে উঠে বাদশাহ প্রফুল্ল চিত্তে এমন কারো আগমনের অপেক্ষায় রইলেন। হঠাৎ ওই ব্যক্তিকে আসতে দেখে বাদশাহ দৌড়ে গিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে শাহী মহলে নিয়ে এলেন। শুরু হলো চিকিৎসা। বাদীর শিরায় হাত রেখে তিনি বিভিন্ন শহরের নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। সমরকন্দ শহরের নাম নিতেই তার পালস বেড়ে গেল। বুযুর্গ বুঝে ফেললেন ওই শহরের কারো প্রেমরোগে ভুগছে এই বাঁদী। জিজ্ঞাসা করতেই বাঁদী অকপটে সব খুলে বলল। ধরা পড়ল আসল রোগ। বাদশাহের প্রতি অমনোযোগ আর সকল রোগ-শোকের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হলো ওই স্বর্ণকারের মহব্বত। বুযুর্গ ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শিতার অধিকারী। অবৈধ মহববত বাঁদীর মন থেকে বিদূরিত করার কৌশল অবলম্বন করলেন। শাহী উপঢৌকনের প্রলোভন দেখিয়ে সমরকন্দের ওই ব্যক্তিকে শাহী মহলে এনে স্বাস্থ্যহানির ঔষধ খাওয়ানো হলো। কিছুদিন পর ভগ্ন স্বাস্থ্যে তাকে বাদীর সম্মুখে হাজির করা হলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল। অস্থায়ী রূপ লাবণ্যের পাগলদের ভালোবাসা এমনই হয়ে থাকে। আর আল্লাহর মহব্বতে যারা পাগল হয় তাদের ভালোবাসার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে বাঁদীর মন থেকে তার মহব্বত লোপ পেয়ে রোগ শোক ভালো হয়ে গেল।

আমাদের জীবনের অবস্থাও এ ঘটনার অনুরূপ। আমাদের আত্মাকে নফসের বাদশাহ বানানো হয়েছে। যাতে আত্মা নফসকে আল্লাহর সন্তুষ্টি মতো পরিচালনা করে জান্নাতের নেয়ামতরাজি লাভ করতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে নফস যে কিনা আত্মার বাঁদী সে দুনিয়ার চাকচিক্যের মহববতে বিভোর হয়ে আত্মার প্রতি অমনোযোগী হয়ে অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ করে চলছে।

এই সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন এমন একজন শায়খে কামেলের, যিনি বিচক্ষণতার সাথে নফসের সম্মুখে দুনিয়াকে কুৎসিত রূপে তুলে ধরবেন যাতে এর মহব্বত লোপ পায়। দুনিয়ার মহব্বত দূর হয়ে গেলে নফস বা প্রবৃত্তির জন্য আত্মার অনুগত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলা সহজ হবে। (মা'আরেফে মসনবী-৩২৪)

দুনিয়ার মহব্বতকে হাদীস শরীফে সকল পাপের মূল কারণ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

حب الدنيا رأس كل خطيئة۔

আর বালা-মুসিবত, রোগ-শোক আর দুঃখ-দুর্দশা পাপের কারণেই জন্ম নিয়ে থাকে। তাই দুনিয়ার মহব্বত হ্রাসের পন্থা অবলম্বনই হচ্ছে টেনশন মুক্তি আর সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।

কোয়ান্টাম যে ধ্যান চর্চার কথা বলছে, তা দুনিয়ার মহব্বত আরো বৃদ্ধি করে। এখানে তো সকল চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করার কৌশল হিসেবে মেডিটেশন, অটোসাজেশন আর মনছবীর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সাফল্য লাভের পেছনে ঝর্ণার গতিতে ছুটে চলার অটোসাজেশন দেয়া হচ্ছে। এতে করে টেনশন আর দুশ্চিন্তা আরো বৃদ্ধি পায়। এটা বৈজ্ঞানিকভাবেও সত্য বলে প্রমাণিত। মেডিটেশনের অন্যতম দিশারি হিসেবে প্রসিদ্ধ ড. ডিন অর্নিশের অভিব্যক্তি হচ্ছে, "সাফল্যের পেছনে

যতটা কম দৌড়ানো যাবে মনের ওপর চাপ ততটাই কমবে।" (সাওল গাইড বুক-১১)

নাস্তিকতা প্রসূত ধ্যান :

কোয়ান্টাম যে ধ্যানের চর্চা করাচ্ছে তার ভিত রাখা হয়েছে নাস্তিক্যবাদের ওপর। কোয়ান্টাম মেথড গ্রন্থে ধ্যানের আলোচনা শুরুর পূর্বে মন ও দেহ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "মানব দেহের বিকাশের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে মাতৃগর্ভে একটি ডিম্ব এবং একটি শুক্রকীটের মিলনের পর ডিম্বের ডিএনএ ও শুক্রকীটের ডিএনএ মিলে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ডিএনএ। এই ডিএনএ কোডেই লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে পর্যায়ক্রমে তা কিভাবে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হবে এবং ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিভাবে শরীরের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ভাবলে অবাক হতে হয়, এই ডিএনএ নিজে নিজে ভাগ হয়ে ক্রমাগত জীবকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনকি ব্রেনের মতো জটিল অঙ্গ তৈরি করছে। পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দেহ মনকে সর্বাঙ্গীনভাবে বিকশিত করে নিজে নিজেই নিজের সব কিছু পরিচালিত করছে। এক কথায় ডিএনএকে বলা যায় প্রাণের ব্লু-প্রিন্ট।" (কোয়ান্টাম মেথড-১৬)

এখানে মানুষের দেহ-মন সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। যেখানে স্রষ্টার কোনো আলোচনা নেই। আছে শুধু ডিএনএ। নতুন আর বৈজ্ঞানিক পরিভাষাই কোয়ান্টামের মূল আকর্ষণ। ডিএনএ মাতৃগর্ভে নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে অন্যসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ব্রেন তৈরি করে। পূর্ণাঙ্গ শিশুরূপে দেহ-মন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে। অর্থাৎ ডিএনএ নিজেই দেহ-মন সৃষ্টি করে, স্রষ্টা বলতে এখানে অন্য কোনো সত্ত্বা নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

কোয়ান্টাম তার এই নাস্তিক্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে একটি উদাহরণ পেশ করেছে, "ধরুন আপনি বাজার থেকে একটি গাড়ির ব্লু-প্রিন্ট কিনে এনে গ্যারেজে রেখে দিলেন। এবার কল্পনা করুন, ব্লু-প্রিন্টটি নিজে নিজে আস্তে আস্তে গাড়ির ইঞ্জিন তৈরি করল, গাড়ির বডি তৈরি করল, সিট ও সিটকভার তৈরি করল, ড্রাইভিং প্যানেল, চাকা, উইন্ডশিল্ড ইত্যাদি তৈরি করে গাড়িতে রং স্প্রে করে চকচকে ঝকঝকে করে ফেলল, তারপর পেট্রল ট্যাংক তৈরি করে পেট্রল ভরে নিজে নিজেই চলা শুরু করল। এই ধারণা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারলেই প্রাণের বিকাশে ডিএনের ভূমিকা উপলব্ধি করা সম্ভব।" (কোয়ান্টাম মেথড-১৬)

এই হচ্ছে জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টামের থিওরি। এটা কি বিজ্ঞান না পাগলের প্রলাপ? বাজার থেকে গাড়ির ব্লু-প্রিন্ট কিনেই যদি গাড়ির মালিক হওয়া যায় তবে কোটি টাকা খরচ করে গাড়ি কেনার কী প্রয়োজন? আর এত সব গাড়ি নির্মাতা কোম্পানিরই বা কী দরকার? ব্লু-প্রিন্ট থেকে নিজে নিজে গ্যারেজে গাড়ির তৈরি হওয়া যেমন অবাস্তব, মাতৃগর্ভে ডিএনএ থেকে নিজে নিজে দেহ-মনবিশিষ্ট মানব সৃষ্টি হওয়াটাও অবাস্তব। এটা কোয়ান্টামের নাস্তিকতা।

পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াতে মানব সৃষ্টির রহস্য ব্যক্ত হয়েছে ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (الدهر-٢)

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে।" (সুরা আদ দাহার-২)

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩)

"তোমরা কি ভেবে দেখছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে। তোমরা তাকে সৃষ্টি করো না আমিই সৃষ্টি করি? (সুরা ওয়াক্বিয়া-৫৮-৫৯)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

" আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।" (সুরা মুমিনুন-১২-১৪)

আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ছয়টি স্তর বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট আর সপ্তম স্তর রূহ জগত সংশ্লিষ্ট তথা দেহে রূহ স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর। মানব সৃষ্টির সকল কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। এর বিপরীত নিজে নিজে সৃষ্টি বা ডিএনএ কর্তৃক সৃষ্টির তত্ত্ব একটি কুফরী মতবাদ। এ ধরনের মতবাদ ধারণ করলে মানসিক ভারসাম্যই ঠিক থাকে না সাফল্যের পথ দেখানো তো দূরের কথা। তাই তো গাড়ির ব্লু-প্রিন্ট তৈরির কোনো কারিগর আছে কি না জিজ্ঞেস করলে বলে, হ্যাঁ। পক্ষান্তরে মানুষের ব্লু-প্রিন্ট ডিএনএ তৈরির কারিগর কোনো সত্ত্বা আছেন কি না, জিজ্ঞেস করলে বলে, না। মূর্খ বিজ্ঞানীরা সব বুঝে কিন্তু নাস্তিক্যবাদের কালো চশমা দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজে পায় না!! এর নামই মুক্তচিন্তা, মুক্তবিশ্বাস বা

জীবনযাপনের বিজ্ঞান। মনোদৈহিক নিরাময় প্রক্রিয়ার মাঝে অন্যতম উপাদান এই মুক্তবিশ্বাস। কোয়ান্টামের বই-পুস্তকে বারবার মুক্তবিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। ভারতে প্রচলিত সাওলের বক্তব্যের মাঝেও এ বিষয়টি বাদ যায়নি। সেখানে একই কথা ভিন্ন ভাষায় বলা হয়েছে,

"অনেকান্ত তত্ত্ব অর্থাৎ বহুমুখী দৃষ্টিকোণের মতবাদ গ্রহণ করুন। একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির তত্ত্ব মেনে নিন, গোঁড়ামি পরিহার করুন। মানতে হবে যে সব কিছুই আপেক্ষিক। অপরের মতবাদ বুঝতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হবে।" (সাওল গাইড বুক-৯৪) বোঝা যায় মেডিটেশন প্রবর্তকদের রসূনের গোড়া এক। ওরা তেল ছাড়া রাধতে পারে কিন্তু মুক্তচিন্তা আর ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ ছাড়া পথ চলতে পারে না। এ উপাদানটি তাদের থাকতেই হবে।

পঞ্চাশ কোটি প্রতিযোগী :

কোয়ান্টামের মৌন সাধনা বা মেডিটেশন চর্চার মূল বিষয় হচ্ছে মন। মনের শক্তির ব্যাখ্যা তারা খুব আলোচনা করে থাকে। তাদের মতে মানুষের সকল শক্তির উৎস হচ্ছে মন। এ শক্তিবলেই মানুষ ৫০ কোটি প্রতিযোগীয় মাঝে সংগ্রাম করে জয়ী হয়ে পৃথিবীতে এসেছে। কোয়ান্টাম মেথড গ্রন্থে বলা হয়েছে, "মাতৃগর্ভে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পিতার দেহ থেকে যে ৪০ থেকে ৫০ কোটি শুক্রাণু যাত্রা শুরু করেছিল, আপনি হচ্ছেন সেই শুক্রাণুর বিকশিতরূপ। যে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হতে পেরেছিল। ৪০/৫০ কোটির সাথে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন বলেই আপনি পৃথিবীতে আসতে পেরেছিলেন।" (কোয়ান্টাম মেথড-২২৩)

পূর্বে বর্ণিত ডিএনএ তত্ত্ব ছিল মাতৃগর্ভে বৃদ্ধিসংক্রান্ত আর প্রতিযোগিতা তত্ত্বটি হচ্ছে মাতৃগর্ভে পৌঁছার সংগ্রাম তত্ত্ব। কোয়ান্টিয়ার ভায়েরা কি মনে করতে পারছেন সেই সংগ্রামের ঘটনা, আর প্রতিযোগীতার দৃশ্যাবলি? যদি না পারেন তবে আপনি কেমন বিজয়ী হলেন, সংগ্রাম আর প্রতিযোগিতার কথাই মনে করতে পারছেন না!

তাছাড়া গর্ভপাতের দরুন যে সকল ভ্রুণ নষ্ট হয়ে যায় তাদের ব্যাপারে কোয়ান্টাম কী বলবে? তবে কি বিজয়মালা ছিনিয়ে নিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়?! এ সকল উদ্ভট প্রশ্ন প্রতিযোগিতার তত্ত্বের কারণে জন্ম নেয়। এটা কোয়ান্টামের মুক্তবিশ্বাসের ফসল। কোয়ান্টাম কি পারবে এই নাস্তিকতা পরিহার করতে?

নিশ্চয় সেখানে কোনো প্রতিযোগিতা হয়নি একমাত্র আল্লাহর হুকুমে ৫০ কোটি থেকে একটিকে বাছাই করা হয়েছে। নিজ ইচ্ছায় কেহ পৃথিবীতে আগমন করেনি।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (٢٣) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤)

"আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আঁধারে, এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি। আমি কত সক্ষম স্রষ্টা? সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।" (সুরা মুরসালাত-২০-২৪)

মনের বিষ :

কোয়ান্টামের মৌন সাধনায় প্রথমে মন থেকে আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম বিলুপ্ত করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যেমন বলা হচ্ছে, "আমাদের অধিকাংশের চিন্তা-জগতের শতকরা ৭০-৮০ ভাগই দখল করে রাখে রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, দুঃখ, অনুতাপ, অনুশোচনা, কুচিন্তা, দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা, হতাশা ও নেতিবাচক চিন্তারূপী আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম। এই আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম অধিকাংশ মানুষের জীবনকেই ধীরে ধীরে করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।" (কোয়ান্টাম মেথড-৬৫)

উল্লিখিত মনের বদঅভ্যাসগুলো এক ধরনের রোগ এতে কোনো সন্দেহ নেই। এগুলো দূর করার চেষ্টাও প্রশংসনীয়। ধ্যানের স্তরে গিয়ে মন থেকে এ সকল ব্যাধি দূর করার প্রশিক্ষণ কোয়ান্টাম দিয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাধি দূর করার মেহনত তো করা হয় জিবীতের শরীরে মৃতের নয়। এখানেই কোয়ান্টামের ধোঁকার রূপ প্রকাশ পেয়ে যায়। যারা কুফর-শিরকে লিপ্ত তাদের দিল তো মুর্দা। মৌন সাধনা তাদের কি উপকারে আসবে? প্রথমে ঈমান-আক্বীদা ঠিক করতে হবে অতঃপর মৌন সাধনার মাধ্যমে মনকে বিশুদ্ধ করতে হবে অন্যথায় কয়লা ধুইলে ময়লা যায়নার মতো পরিস্থিতি হবে। কোয়ান্টাম মনের বিষ দূর করার কথা বলে কিন্তু সবচেয়ে বিষাক্ত ও আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম কুফর-শিরক পরিত্যাগের আহ্বান করে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان١٣)

"নিশ্চয় শিরক মহা অন্যায়।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء ٤٨)

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।" (সুরা আননিসা-৪৮)

অতএব এটা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে কোয়ান্টাম মৌন সাধনার নামে অমুসলিমদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে আর মুসলমানদের ঈমান হরণের চেষ্টা করছে।

কোয়ান্টাম মেথড-২০

ধ্যানের অপব্যবহার

মুফতী শরীফুল আ'জম

হৃদাসনটি কার :

হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান পাওয়া কার অধিকার? আর কোয়ান্টাম ধ্যান সাধনার মাধ্যমে সেখানে ঠাঁই দিচ্ছে কি? বৈষয়িক সাফল্যের স্বপ্ন কি সেখানে ঠাঁই পাওয়ার যোগ্য? অর্থ-বিত্ত, মান-সম্মান, সুস্বাস্থ্য, সুখ্যাতি, পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরিবাকরি বা উচ্চ ডিগ্রি এর কোনোটাই মনের গহিনে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থান দিতে হবে একমাত্র ওই সত্তাকে যিনি নিজ কুদরতে সৃষ্টি করেছেন মহামূল্যবান এই হৃদাসন। তবেই যথার্থ হবে হৃদয়ের ব্যবহার আর ব্যবহারকারী পরিণত হবে ইনসানে কামেলে। এমন হৃদয়ের অধিকারীই মূলত অনন্য মানুষ হিসেবে, আহলে দিল হিসেবে গণ্য হতে পারে।

হযরত উসমান (রা.) বলেন, বৈষয়িক চিন্তা-ফিকির হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে আর পরকালের চিন্তা ফিকির হৃদয়কে করে আলোকিত। (সুকুনে কলব ৩৬)

আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার (রহ.) বলেন,

اہل دل آں کس کہ حق را دل دہد
دل دہد اورا کہ دل را می دہد

প্রকৃত হৃদয়ওয়ালা তারা যারা আপন হৃদয়খানা আল্লাহকে দিয়ে দেয়। মায়ের গর্ভাশয়ে থাকাবস্থায় আমাদের সীনায় যিনি হৃদয় স্থাপন করেছেন হৃদয়কে তাঁর জন্যই সঁপে দেয়।

বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরে মাআ'রেফুল কুরআনের গ্রন্থকার হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) বলেন, দুনিয়াকে হাতে রাখা জায়েয, পকেটেও রাখা জায়েয। কিন্তু অন্তরে রাখা জায়েয নয়। অন্তর আল্লাহর ঘর। আল্লাহর ঘরে গাইরুল্লাহকে রাখা হারাম। (তা'আললুক মা'আল্লাহ ৪৪)

সায়্যিদুত তায়েফা আরেফ বিল্লাহ হযরত শাহ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) বলেন,

دل سے دنیا اور تمام چیزوں کی محبت چھوڑ دے ورنہ ایک ہزار برس بھی عبادت کرنا فائدہ نہ دیگا۔ دل ایک آئنہ ہے اس میں غیر اللہ کو نہ دیکھے (کلیات امدادیہ ۹۱)

জগত ও জাগতিক সকল বস্তুর মুহাব্বত হৃদয়ের মণিকোঠা থেকে বের করে দাও। নচেৎ হাজার বছরের ইবাদত কোনো কাজে আসবে না। হৃদয় একটি আয়না, এতে গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু দেখো না। (কুল্লিয়াতে ইমদাদিয়া ৯১)

কোয়ান্টামের ভ্রষ্টতা এখানেই। তারা হৃদয় নামক মহামূল্যবান আয়না দিয়ে বস্তুজগতের ছবি দেখার প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। এটা হৃদয়ে অপব্যবহার এবং ধ্যানের শক্তির অপচয়। কোয়ান্টামের মতে ব্রেনওয়েভ আলফা/থিটা লেভেলে নেমে আসলে ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি হয়। ওই মুহূর্তে অবচেতন মনের গভীরের শক্তিকে কাজে লাগানো যায়। মনের গভীরে এ সময় যেকোনো মেসেজ দিলে তা বদ্ধমূল হয়ে যায়। দেহ মন সে মেসেজ বা নির্দেশনা মতে পরবর্তীতে কাজ করতে থাকে। মনের এমন একাগ্রতার মুহূর্তে কোয়ান্টাম সেখানে যা প্রবেশ করাচ্ছে তা আদৌ কাম্য ছিল না। মনের আয়না পার্থিব বস্তু দেখার জন্য দেওয়া হয়নি। পার্থিব ভোগ-বিলাসের জন্য তো পঞ্চেন্দ্রীয় দেয়া হয়েছে। আর হৃদাসনটি সংরক্ষিত রাখা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর জন্য। তাঁর সংরক্ষিত আসনে গাইরুল্লাহকে সমাসীন করা ধ্যানের অপব্যবহার বলে গণ্য হবে।

তবে এখানে ভুল বুঝলে চলবে না। সংসার ত্যাগের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। ইসলামে বৈরাগ্যের কোনো স্থান নেই। বিশ্ববাসীর কাছে ইসলাম নবীজির (সা.) বাস্তব জীবনকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। উত্তম আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁর পবিত্র জীবনীকে। যেখানে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে মানুষের সকল চাহিদা ও প্রয়োজনের মাঝে। সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতিটি সম্পর্কের। জগতের বৈধ বিষয় বা বস্তু চাই তা ধন সম্পদ হোক বা পরিবার-পরিজন অথবা অন্য কিছু এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হৃদয়ের মণিকোঠায় এগুলোকে ঠাঁই দেয়া বা এগুলো পাওয়ার জন্য ধ্যান করে মনছবি দেখে দেখে ঘুম হারাম করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অন্তরের অন্তঃস্থলে একমাত্র আল্লাহর মুহাব্বতের জন্য জায়গা রাখতে হবে। সেখানে বৈষয়িক কোনো বস্তুর স্থান নেই।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (بقرة ١٦٥)

"এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল।" (সূরা বাকারা ১৬৫)

অর্থাৎ ঈমানদার বান্দারা আম্বিয়া, আওলিয়া, ফেরেশতা, আলেম-উলামা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সন্তান-সন্ততি,

ধন-সম্পদ প্রভৃতিকে যত ভালোবাসে তার চেয়ে শতগুণ বেশি আল্লাহকে ভালোবাসে; বরং আল্লাহর ভালোবাসাই তাদের অন্যান্য ভালোবাসার মূল উৎস এবং কেন্দ্র। অন্যান্যদের প্রতি তাদের ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর নির্দেশের অধীন। তাই তারা আল্লাহর ভালোবাসা এবং অন্যান্যদের ভালোবাসাকে এক পর্যায়ে, একই সমান করতে পারে না। এটা পারে একমাত্র মুশরিকরা, এটা মুশরিকদের কাজ। (তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ)

নবীজি (সা.) স্বীয় উম্মতকে এমন দু'আই শিক্ষা দিয়েছেন।

اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد

হে আল্লাহ আপনার ভালোবাসাকে আমার হৃদয়ে আমার জান, পরিবার-পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানি অপেক্ষা প্রবল ও সর্বাধিক প্রিয় বানিয়ে দিন। (তিরমিযী ৩৪৯০)

নবীজি (সা.)-এর বাস্তব জীবনেও আল্লাহর ভালোবাসা সর্বাধিক ও সবচেয়ে প্রবল হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন নবীজি (সা.)-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। অসংখ্য হাদীসে যার সাক্ষ্য বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও নবীজি (সা.) বলেন–

ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله

আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তবে আবুবকরকেই বানাতাম। যেনে রাখো তোমাদের সাথী (আমি) আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু। (তিরমিযী ৩৬৬১)

অর্থাৎ আবুবকর আমার সর্বাধিক প্রিয়তম সাহাবী ঠিক কিন্তু হৃদাসনে তাঁরও স্থান নেই। হৃদয় শুধু আর শুধুই আল্লাহর ভালোবাসার স্থান।

নবী (সা.)-এর সর্বাধিক প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)। হাদীস ভাণ্ডার ও সীরাত গ্রন্থে যার অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। একদা নবী (সা.) গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে আল্লাহর ভালোবাসায় তন্ময় হয়েছিলেন। এমন সময় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁর নিকটবর্তী হলে নবীজি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন কে তুমি? তিনি বললেন আমি আয়েশা। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন আয়শা আবার কে? বললেন আবুবকরের তনয়া। আবার জিজ্ঞেস করলেন আবু বকর কে? বললেন আবু কুহাফার ছেলে। এরপর যখন জিজ্ঞেস করলেন আবু কুহাফা আবার কে? তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বুঝে ফেললেন যে, নবীজি (সা.) এখন তাঁর মওলার ভালোবাসায় বিভোর হয়ে আছেন। তাই সরে পড়লেন।

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে গভীর ভালোবাসার সময় পৃথিবীর সব কিছুই তিনি ভুলে যেতেন। তাঁর পবিত্র হৃদয়ের সর্বোচ্চ আসনে স্থান ছিল একমাত্র আল্লাহর। সেখানে প্রিয়তম আবুবকর (রা.)ও নেই, প্রিয়তমা আয়শা (রা.)ও নেই। নেই বৈষয়িক কোনো চাওয়া পাওয়ার স্থান। এটাই হচ্ছে তাওহীদের খালেস শিক্ষা। পার্থিব বৈধ বস্তুর ভালোবাসা থাকবে তবে হৃদাসনে ঠাঁই দেওয়া যাবে না। আলফা/থিটা লেভেলে গিয়ে এই নিয়ে ধ্যান করা যাবে না। লেভেলে গিয়ে ধ্যান করতে হবে আল্লাহর মুহাব্বত আর ভালোবাসার কল্পনা নিয়ে। সাজাতে হবে ঈমানী অটোসাজেশন।

অপব্যবহারের পরিণতি :

বৈষয়িক বস্তু অর্জন করতে গিয়ে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান ভঙ্গ হয়ে যায় তবেই ভালোবাসায় তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরা হবে। বস্তুর মুহাব্বত বেশি বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তা ঈমানের ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে। তাই কোয়ান্টামের ধ্যান সাধনা করতে গিয়ে শরীয়তের অগণিত বিধিবিধান ও আকীদা বিশ্বাসের প্রতি যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা হচ্ছে এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা প্রবল না হওয়া এবং হৃদাসনে গাইরুল্লাহকে স্থান দেওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبة ٢٤)

বলো তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নি, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো, তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো- আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (তাওবা ২৪)

কোয়ান্টিয়ার ভাইদের মনের রাজ্যজুড়ে যে সকল মনছবি ঘুর ঘুর করে সদা তাদের ঘুমকে হারাম করে চলছে, উক্ত আয়াতে ওই সকল বস্তুর আলোচনাই যেন স্থান পেয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়ে ওই সকল বস্তুর ধ্যান আর মনছবি খোদার গজবে নিপতিত করবে। বৈষয়িক সাফল্য আর চাহিদা পূরণের জন্য যারা কোয়ান্টামের কুফরী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে ধ্যান

মেডিটেশন করে যাচ্ছেন তাদের হৃদাসনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) পরিবর্তে গাইরুল্লাহ স্থান করে নিয়েছে। তাই ঈমান বাঁচাতে হলে ধ্যানের এ অপব্যবহার পরিহার করতে হবে।

অটোসাজেশন :

ধ্যানের অপব্যবহারের কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন। যে ধ্যান আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত লাভের মাধ্যম হওয়া দরকার ছিল কোয়ান্টাম তা প্রয়োগ করছে মানুষকে খোদাদ্রোহীতে পরিণত করার জন্য। ধ্যানের কিছু অটোসাজেশন তারা এভাবেই সাজিয়েছে।

যে বস্তুর ধ্যান করা হয় তথা ধ্যানের কথামালাকে 'অটোসাজেশন' নাম রাখা হয়েছে। মেডিটেশনের মাধ্যমে ধ্যানের গভীর লেভেলে গিয়ে অটোসাজেশন দেয়া হয়। বার বার লাগাতার একটি বিষয় নিয়ে কল্পনা করে মনের গভীরে তা গেঁথে দেয়া হয়। দ্বীন-দুনিয়ার যেকোনো বিষয়ে অটোসাজেশন হতে পারে। এটা নির্ভর করে ধ্যানীর আক্বীদা-বিশ্বাস ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপর। চর্চার সুবিধার্থে কোয়ান্টাম এক হাজার অটোসাজেশন বা প্রত্যয়ন পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছে। এ সকল অটোসাজেশনে কোয়ান্টামের নাস্তিকতা এবং কুফরী দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে।

কোয়ান্টামের মতে মানুষ নিজেই নিজের নিয়ন্তা। যেমনটি বলা হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড গ্রন্থে, "একজন হতাশ ব্যক্তি সব সময় নিজেকে বিড়ম্বিত, বঞ্চিত মনে করে আর একজন আশাবাদী ব্যক্তি সব সময় মনে করে আমিই আমার নিয়ন্তা।" (কোয়ান্টাম মেথড-৬৭)

এই কুফরী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে যে অটোসাজেশন দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ১৪০. আমি আমার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করব, নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করব, নিজের জীবন নিজে পরিচালিত করব। আমি সুখী হবো।" (অটোসাজেশন-২৫)

৩৭৭. "আমার চিন্তার আমিই হবো প্রভু। আমার মন শুধু আমার কথাই শুনবে।" (অটোসাজেশন-৪৮)

এখানে মানুষকে ভাগ্য বিধাতা ও নিয়ন্তা, নিজের প্রভু এবং সর্বেসর্বা হিসেবে স্রষ্টার স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। এটি সুস্পষ্ট শিরক, যা দলিল প্রমাণ দ্বারা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য থেকে মুক্ত করে মনের দাসে পরিণত করাই যে এ সকল অটোসাজেশনের লক্ষ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার মন শুধু আমার কথাই শুনবে অর্থাৎ আল্লাহ-রাসূল বা কুরআন-হাদীসের কথা আমার মন শুনবে না। এ ধরনের প্রত্যয়ন তাও আবার একাগ্র মনোযোগের সাথে ধ্যানের স্তরে গিয়ে যখন কল্পনা করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তখন ধীরে ধীরে মানুষ নিজের অজান্তেই খোদাদ্রোহী মুরতাদে পরিণত হয়। বিশ্বাস না হলে যারা নিয়মিত এ সকল মেডিটেশন করে বা কোয়ান্টামের আদর্শে নিজেকে সঁপে দিয়েছে তাদের বাস্তব জীবনের নমুনা দেখে আসুন। তারা কি ধ্যান সাধনা করে পূর্বের চেয়ে বেশি সুন্নাতের অনুসরণ করছে নাকি ধীরে ধীরে শরীয়তের হুকুম-আহকাম থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আর তাদের ঈমান আক্বীদার দশাইবা কী?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر-٧)

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" (সুরা হাশর-৭)

অতএব সফল হতে হলে মুক্তি পেতে হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা মতে দেহ-মন পরিচালনা করতে হবে কোয়ান্টামের কুফরী অটোসাজেশন মতে নয়।

গান-বাদ্যের ধ্যান :

হাদীস শরীফের ভাষায় গান-বাজনা হচ্ছে মুনাফেকীর উৎস বিধায় তা মানুষের দেহ-মনকে যে করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেবে এটি নিশ্চিত।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-

الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل-

"গান মনের মাঝে মুনাফেকী উৎপন্ন করে যেভাবে পানি উদ্ভিদ অঙ্কুরিত করে।" (বাইহাকী-২১০০৮)

অপর হাদীসে এসেছে-

الجرس مزامير الشيطان (مسلم-٢١١٤)

"বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে শয়তানের বাঁশী।" (মুসলিম শরীফ-২১১৪)

মৌন সাধনার নামে কোয়ান্টাম মুনাফেকী আর শয়তানী চর্চা করছে। গান-বাজনার প্রতি উৎসাহ জোগাতে কোয়ান্টামের অটোসাজেশনে বলা হয়েছে, "গানের বাণী ও সুর যা শিখলাম, তা আমি হুবহু মনে রাখব। গান গাওয়া বা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর সময় চমৎকারভাবে আমি আমার সৃজনশীলতা, ঐকান্তিকতা, সাবলীল দক্ষতা ও প্রকাশ ভঙ্গির নৈপুণ্য প্রদর্শন করব।" (অটোসাজেশন-৬০)

কোয়ান্টামকে নিয়ে যারা অতি উৎসাহী তারা একটু চিন্তা করে দেখুন, কী শেখাচ্ছে কোয়ান্টাম? মুনাফেকী চরিত্র

কি আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম নয়? তবে যে গান-বাদ্যের কারণে মুনাফেকী জন্মায় তাকে সমর্থন করা হচ্ছে কেন? তাও আবার ধ্যানের লেভেলে নিয়ে অটোসাজেশনের মাধ্যমে!

একটি ভুল ধারণা :

অটোসাজেশন কিভাবে কাজ করে এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে- "অটোসাজেশন হচ্ছে ইতিবাচক শব্দের সম্মিলনে গঠিত বাক্যমালা। শব্দ বা কথা এক প্রচণ্ড শক্তি। ধর্মীয় মতে সৃষ্টির শুরু হচ্ছে শব্দ। ইসলাম ধর্ম অনুসারে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করতে চাইলেন। তিনি বললেন, কুন- 'হও', হয়ে গেল।... (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৯৯)

কোয়ান্টামের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলার কালাম বা কথা মানুষের কথার মতো বর্ণমালা ও শব্দসম্বলিত নয়।

ليس من جنس الحروف والاصوات

তাঁর কথা হচ্ছে বর্ণ ও শব্দমুক্ত। এটাই বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে শরহু ফিকহিল আকবর এবং শরহুল আকায়েদ গ্রন্থে।

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও সামর্থ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছে করেন তখন তাকে কেবল বলেদেন কুন 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। অর্থাৎ সৃষ্টির জন্য শুধু তাঁর ইচ্ছা করাই যথেষ্ট, কোনো উপকরণের দ্বারস্ত হতে হয় না। মানুষ কোনো কিছু তৈরি করতে চাইলে নির্মাণ সমগ্রী এবং কারিগর জোগাড়সহ কিছু সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করতে চাইলে এত সব সাত-পাঁচের দরকার হয় না। তিনি ইচ্ছা করা মাত্রই সব হয়ে যায়। তাঁর এই কুদরাতের প্রতি ইঙ্গিত করে এই সকল আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (يس٨٢)

তাই কুন নির্দেশের মাঝে শব্দ ছিল আর শব্দই সৃষ্টি করেছে এই পৃথিবীকে-কোয়ান্টামের এমন মনগড়া ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা সম্পূর্ণ ইসলামী আকীদা পরিপন্থী।

মনছবি :

একজন মুসাফির বাস বা রেলস্টেশনে অবস্থানকালীন তার একমাত্র চাওয়া-পাওয়া থাকে নিরাপদে দ্রুত স্বসম্মানে গন্তব্যে পৌঁছা।এর অতিরিক্ত কোনো প্রত্যাশা নিয়ে কোনো বুদ্ধিমান মুসাফির মনছবি দেখে না। স্টেশনে আমার থাকার একটা ভালো ব্যবস্থা হবে, উন্নত খাবার আসবে, সকলে সম্মান করবে, বা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবো ইত্যাদি চাহিদা নিয়ে মেডিটেশনে বসে না। সেখানে একটাই লক্ষ্য থাকে মঞ্জিলে পৌঁছা। পথে সুযোগ-সুবিধা পেলে ভালো তবে এ নিয়ে কল্পনা বা ভিজুয়ালাইজ করার মতো বোকামি কেউ করে না। আর পথে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলেও সেদিকে তেমন ভ্রুক্ষেপ করে না। গন্তব্যে পৌঁছতে পারলেই হলো।

ঠিক মানুষের অবস্থাও তাই। এ জগতে মানুষ একজন মুসাফিরের মতো। গন্তব্য হচ্ছে জান্নাত। আসল বাড়িতে পৌঁছতে পারাই তো জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। চলার পথে দুনিয়ার স্টেশনে বৈষয়িক সাফল্য অর্জনের জন্য মনছবি, অটোসাজেশন বা প্রত্যয়ন নিয়ে ধ্যান মগ্ন হওয়া সুস্পষ্ট বোকামি। এখানে কোনো রকম সময় পার করে জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনই জীবনের লক্ষ্য হওয়া চাই। লক্ষ্য স্থির করতে ভুল হলে মনছবিও হবে ভুল। কোয়ান্টাম জীবনের লক্ষ্য স্থিরেই ভুল করেছে তাই তাদের মনছবিও ভুল হচ্ছে।

কোয়ান্টামের মতে জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে খ্যাতি অর্জন। "আপনি নিজের মৃত্যু সংবাদকে কিভাবে দেখতে চান, শুনতে চান সেটাকে অবলোকন করা।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ২/৬৫) তাই কোয়ান্টামের মনছবি মূলত খ্যাতি অর্জন কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। অস্থায়ী দুনিয়ার আলফা স্টেশনে বসে এ ধরনের মনছবি নিয়ে ধ্যান মগ্ন হলে হায়াতের গাড়ি কখন যে ছেড়ে যাবে টেরও পাবেন না। আসল বাড়ি জান্নাতে পৌঁছা আর হবে না, সিজ্জিনেই আটকা পড়তে হবে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (الحجر-٣)

"আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে।" (সূরা হিজর-৩)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, "পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেয়া এবং সাংসারিক বিলাস ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাব এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মুমিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ কারবারের পরিকল্পনাও তৈরি করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ : চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া (অর্থাৎ

গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা)। কঠোর প্রাণ হওয়া। দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া। (কুরতুবী) দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া। (মা'আরিফুল কুরআন)

মনছবির বাস্তবতাও তাই। দীর্ঘ আশা আর সুদুর পরিকল্পনা পূরণের আশায় মানুষ কোয়ান্টামের কুফরী মতবাদ গ্রহণ করতে দ্বিধা করছে না।

মনছবি টেনশন বাড়ায় :

মনছবি আসলে স্ট্রেস বা টেনশনকে বৃদ্ধি করে দেয়। চাওয়া-পাওয়ার কল্পনা আর মনছবি ধ্যানের লেভেলে গিয়ে মনের গভীরে গেঁথে দেয়া হলে সর্বক্ষণ তা পাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে। এভাবে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর আসক্তি সৃষ্টি হয়। আর আসক্তির ফলে টেনশন আরো বাড়ে। কোয়ান্টামের সূত্র দিয়েও বিষয়টি প্রমাণ করা যায়।

কোয়ান্টামের শেখানো একটি অটোসাজেশন হচ্ছে, "৫৩৭. চাওয়া মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তা হয় আসক্তি। আসক্তি দুঃখের প্রধান কারণ। আমি আসক্তি থেকে দূরে থাকব।" (অটোসাজেশন-৬৪)

অন্যদিকে মনছবির কার্যকারিতার অন্যতম শর্ত করা হয়েছে লক্ষ্যে একাত্মতাকে। বলা হয়েছে, "মনছবির সাথে সার্বক্ষণিক একাত্ম থাকুন। শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে দিনে-রাতে সব সময় সব কিছুর মাঝে মনছবিকে নিয়ে আসুন।" (কোয়ান্টাম কণিকা-৭৬)

আরো বলা হয়েছে, "আপাতত অসম্ভব হলেও বাস্তবসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত কল্পনা মনছবিতে রূপ নিতে পারে যখন-

১. আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ক্লান্ত করবে না, ঘুমাতে দেবে না।...

২. মনছবি থেকে আপনাকে আলাদা করা যাবে না। আপনি একাকার হয়ে যাবেন মনছবির সাথে।" (কোয়ান্টাম কণিকা-৭৯)

এবার একটু পর্যালোচনা করে দেখুন এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা যার ফলে ঘুম হারাম হয়ে যায়, একাকার হয়ে যায়, শয়নে-স্বপনে সার্বক্ষণিক বিরাজ করে এটা কি আসক্তি নয়। চাওয়ার মাত্রা এর চেয়ে বেশি হওয়ার অবকাশ কি আছে? মনছবির সাথে একাকার হয়ে একাত্মায় পরিণত হওয়ার পর মাত্রা বাড়ার আর কোনো স্তর বাকি থাকে কি? এটাই যে আসক্তি তা ভেলা দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে না। আর এই আসক্তিকেই দুঃখের প্রধান কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে কোয়ান্টাম।

তাছাড়া কোয়ান্টাম স্ট্রেসের চারটি কারণ উল্লেখ করেছে। তার একটি হচ্ছে বহন তথা বয়ে বেড়ানো। "আমরা অধিকাংশ সময় ছোটখাটো ঘটনা বা প্রতিক্রিয়াগুলোকে বয়ে বেড়াই। ফলে যে বিষয়গুলোকে সহজেই ক্ষমা করে দিতে পারতাম বা এড়িয়ে যেতে পারতাম তা করতে পারি না এবং পরিণামে স্ট্রেসড হই।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৩০৮)

এবার ভেবে দেখুন ছোটখাটো প্রতিক্রিয়া বয়ে বেড়ানোর ফলে যদি স্ট্রেসড হতে হয় তবে বড় বড় বিষয়ের মনছবি বা স্বপ্ন-শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে দিনে-রাতে সর্বদা বয়ে বেড়ালে কি স্ট্রেসড হতে হবে না? মনছবি বয়ে বেড়ানোর প্রতিক্রিয়া যেখানে ঘুমকে হারাম করে দেয় সেটাকে স্ট্রেসড না বলে কি প্রশান্তি বলা হবে? যে, আহা মনছবির প্রশান্তি লোকটার ঘুম কেড়ে নিয়েছে!

অতএব কোয়ান্টামের মৌন সাধনা ছেড়ে, মেডিটেশেন, মনছবি আর অটোসাজেশনকে ছুড়ে ফেলে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ মনেপ্রাণে ধারণ করে সুন্নাত অনুসারে জীবন যাপন করুন, ধ্যান-মোরাকাবা করুন, সব সমস্যার সমাধানের পথ পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ!!